স্বনামধন্য, পরোপকারী, মাতৃভাষানুরাগী

রায় বাহাদুর

শ্রীযুক্ত হরিবল্লভ বসুর নামে

শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ

এই পুস্তক

উৎসর্গ করা হইল।

ভূমিকা
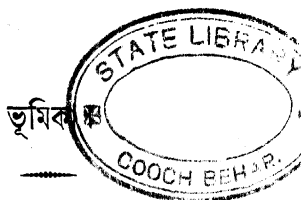
রামায়ণ মহাভারতকে যখন জগতের অন্যান্য কাব্যের সহিত তুলনা করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা হয় নাই তখন তাহাদের নাম ছিল ইতিহাস। এখন বিদেশীয় সাহিত্যভাণ্ডারে যাচাই করিয়া তাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে এপিক্। আমরা "এপিক্" শব্দের বাংলা নামকরণ করিয়াছি মহাকাব্য। এখন আমরা রামায়ণ মহাভারতকে মহাকাব্যই বলিয়া থাকি।

মহাকাব্য নামটি ভালই হইয়াছে। নামের মধ্যেই যেন তাহার সংজ্ঞাটি পাওয়া যায়। ইহাকে আমরা কোনো বিদেশী শব্দের অনুবাদ বলিয়া এখন যদি না স্বীকার করি তাহাতে ক্ষতি হয় না।

অনুবাদ বলিয়া স্বীকার করিলে পরদেশীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের "এপিক" শব্দের লক্ষণের সহিত আগাগোড়া না মিলিলেই মহাকাব্যনামধারীকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়। এরূপ জবাবদিহীর মধ্যে থাকা অনাবশ্যক বলিয়া মনে করি।

মহাকাব্য বলিতে কি বুঝি আমরা তাহার আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু এপিকের সঙ্গে তাহাকে আগাগোড়া মিলাইয়া দিব এমন পণ করিতে পারি না। কেমন করিয়াই বা করিব? প্যারাডাইস্ লষ্ট্‌কেও ত সাধারণে এপিক্ বলে, তা যদি হয় তবে

রামায়ণ মহাভারত এপিক্ নহে—উভয়ের এক পংক্তিতে স্থান হইতেই পারে না।

মোটামুটি কাব্যকে দুই ভাগ করা যাক্। কোনো কাব্য বা একলা কবির কথা, কোনো কাব্য বা বৃহৎসম্প্রদায়ের কথা।

একলা কবির কথা বলিতে এমন বুঝায় না যে তাহা আর কোনো লোকের অধিগম্য নহে, তেমন হইলে তাহাকে পাগলামি বলা যাইত। তাহার অর্থ এই যে, কবির মধ্যে সেই ক্ষমতাটি আছে, যাহাতে তাহার নিজের সুখদুঃখ, নিজের কল্পনা, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া বিশ্বমানবের চিরন্তন হৃদয়াবেগ ও জীবনের মর্ম্মকথা আপনি বাজিয়া উঠে।

এই যেমন এক শ্রেণীর কবি হইল তেমনি আর এক শ্রেণীর কবি আছে, যাহার রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ একটি সমগ্র যুগ আপনার হৃদয়কে আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিকে মহাকবি বলা যায়। সমগ্র দেশের সমগ্র জাতির সরস্বতী ইঁহাদিগকে আশ্রয় করিতে পারেন—ইঁহারা যাহা রচনা করেন তাহাকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচনা বলিয়া মনে হয় না। মনে হয় যেন তাহা বৃহৎ বনস্পতির মত দেশের ভূতল জঠর হইতে উদ্ভূত হইয়া সেই দেশকেই আশ্রয়চ্ছায়া দান করিয়াছে। কালিদাসের শকুন্তলা কুমারসম্ভবে বিশেষ ভাবে কালিদাসের নিপুণ হস্তের পরিচয় পাই—কিন্তু রামায়ণ মহাভারতকে মনে হয় যেন জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায় তাহারা ভারতেরই, ব্যাস বাল্মীকি উপলক্ষ মাত্র।

বস্তুত ব্যাস বাল্মীকি ত কাহারো নাম ছিল না। ও ত একটা উদ্দেশে নামকরণ মাত্র। এত বড় বৃহৎ দুইটি গ্রন্থ, আমাদের সমস্ত ভারতবর্ষ জোড়া দুইটি কাব্য তাহাদের নিজের রচয়িতা কবিদের নাম হারাইয়া বসিয়া আছে, কবি আপন কাব্যের এতই অন্তরালে পড়িয়া গেছে।

আমাদের দেশে যেমন রামায়ণ মহাভারত, প্রাচীন গ্রীসে ও রোমে তেমনি ইলিয়ড্ এনীড্ ছিল। তাহারা সমস্ত গ্রীস ও রোমের হৃদ্‌পদ্মসম্ভব ও হৃদ্‌পদ্মবাসী ছিল। কবি হোমর ও ভর্জ্জিল আপন আপন দেশকালের কণ্ঠে ভাষা দান করিয়াছিলেন। সেই বাক্য উৎসের মত স্ব স্ব দেশের নিগূঢ় অন্তস্তল হইতে উৎসারিত হইয়া চিরকাল ধরিয়া তাহাকে প্লাবিত করিয়াছে।

আধুনিক কোনো কাব্যের মধ্যেই এমন ব্যাপকতা দেখা যায় না। মিল্টনের প্যারাডাইস্ লষ্টের ভাষার গাম্ভীর্য্য, ছন্দের মাহাত্ম্য, রসের গভীরতা যতই থাক্ না কেন তথাপি তাহা দেশের ধন নহে,—তাহা লাইব্রেরির আদরের সামগ্রী।

অতএব এই গুটি কয়েক মাত্র প্রাচীন কাব্যকে এক কোঠায় ফেলিয়া এক নাম দিতে হইলে মহাকাব্য ছাড়া আর কি নাম দেওয়া যাইতে পারে? ইহারা প্রাচীনকালের দেবদৈত্যের ন্যায় মহাকায় ছিলেন—ইঁহাদের জাতি এখন লুপ্ত হইয়া গেছে।

প্রাচীন আর্য্য সভ্যতার এক ধারা য়ুরোপে এবং এক ধারা ভারতে প্রবাহিত হইয়াছে। য়ুরোপের ধারা দুই মহাকাব্যে এবং

ভারতের ধারা দুই মহাকাব্যে আপনার কথা ও সঙ্গীতকে রক্ষা করিয়াছে।

আমরা বিদেশী, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না গ্রীস ও রোম্ তাহার সমস্ত প্রকৃতিকে তাহার দুই কাব্যে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে কি না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে ভারতবর্ষ রামায়ণ মহাভারতে আপনাকে আর কিছুই বাকি রাখে নাই।

এইজন্যই, শতাব্দীর পর শতাব্দী যাইতেছে কিন্তু রামায়ণ মহাভারতের স্রোত ভারতবর্ষে আর লেশমাত্র শুষ্ক হইতেছে না। প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাহা পঠিত হইতেছে—মুদীর দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই তাহার সমান সমাদর। ধন্য সেই কবিযুগলকে, কালের মহাপ্রান্তরের মধ্যে যাঁহাদের নাম হারাইয়া গেছে, কিন্তু যাঁহাদের বাণী বহু কোটী নরনারীর দ্বারে দ্বারে আজিও অজস্রধারায় শক্তি ও শান্তি বহন করিতেছে, শত শত প্রাচীন শতাব্দীর পলি-মৃত্তিকা অহরহ আনয়ন করিয়া ভারতবর্ষের চিত্তভূমিকে আজিও উর্ব্বরা করিয়া রাখিতেছে।

এমন অবস্থায় রামায়ণ মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে; ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে, কারণ সেরূপ ইতিহাস সময় বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে—রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্ত্তিত হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্ত্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা

আরাধনা, যাহা সংকল্প তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।

এই কারণে, রামায়ণ মহাভারতের যে সমালোচনা তাহা অন্য কাব্য সমালোচনার আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র। রামের চরিত্র উচ্চ কি নীচ, লক্ষ্মণের চরিত্র আমার ভাল লাগে কি মন্দ লাগে এই আলোচনাই যথেষ্ট নহে। স্তব্ধ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে হইবে সমস্ত ভারতবর্ষ অনেক সহস্র বৎসর ইহাদিগকে কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। আমি যত বড় সমালোচকই হই না কেন একটি সমগ্র প্রাচীন দেশের ইতিহাস প্রবাহিত সমস্ত কালের বিচারের নিকট যদি আমার শির নত না হয় তবে সেই ঔদ্ধত্য লজ্জারই বিষয়।

রামায়ণে ভারতবর্ষ কি বলিতেছে, রামায়ণে ভারতবর্ষ কোন্ আদর্শকে মহৎ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে ইহাই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাদের সবিনয়ে বিচার করিবার বিষয়।

বীররসপ্রধান কাব্যকেই এপিক্ বলে এইরূপ সাধারণের ধারণা, তাহার কারণ যে দেশে যে কালে বীররসের গৌরব প্রাধান্য পাইয়াছে সে দেশে সে কালে স্বভাবতই এপিক্ বীররসপ্রধান হইয়া পড়িয়াছে। রামায়ণেও যুদ্ধব্যাপার যথেষ্ট আছে, রামের বাহুবলও সামান্য নহে, কিন্তু তথাপি রামায়ণে যে রস সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহা বীররস নহে। তাহাতে বাহু-বলের গৌরব ঘোষিত হয় নাই—যুদ্ধঘটনাই তাহার মুখ্য বর্ণনার বিষয় নহে।।

দেবতার অবতারলীলা লইয়াই যে এ কাব্য রচিত তাহাও নহে। কবি বাল্মীকির কাছে রাম অবতার ছিলেন না, তিনি মানুষই ছিলেন পণ্ডিতেরা ইহার প্রমাণ করিবেন। এই ভূমিকায় পাণ্ডিত্যের অবকাশ নাই ; এখানে এইটুকু সংক্ষেপে বলিতেছি যে কবি যদি রামায়ণে নরচরিত্র বর্ণনা না করিয়া দেবচরিত্র বর্ণনা করিতেন, তবে তাহাতে রামায়ণের গৌরব হ্রাস হইত—সুতরাং তাহা কাব্যাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হইত। মানুষ বলিয়াই রামচরিত্র মহিমান্বিত।

আদিকাণ্ডের প্রথম সর্গে বাল্মীকি তাঁহার কাব্যের উপযুক্ত নায়ক সন্ধান করিয়া যখন বহু গুণের উল্লেখ করিয়া নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"সমগ্রা রূপিণী লক্ষ্মীঃ কমেকং সংশ্রিতা নরং।"

কোন্ একটি মাত্র নরকে আশ্রয় করিয়া সমগ্রা লক্ষ্মীরূপ গ্রহণ করিয়াছেন ?—তখন নারদ কহিলেন—

"দেবেষ্বপি ন পশ্যামি কশ্চিদেভির্গুণৈর্যুতং।
শ্রূয়তাং তু গুণৈরেভির্যো যুক্তো নরচন্দ্রমাঃ॥"

এত গুণযুক্ত পুরুষ ত দেবতাদের মধ্যেও দেখি না, তবে যে নরচন্দ্রমার মধ্যে এই সকল গুণ আছে তাঁহার কথা শুন!

রামায়ণ সেই নরচন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নহে। রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজগুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।

মানুষেরই চরম আদর্শ স্থাপনার জন্য ভারতের কবি মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। এবং সে দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত মানুষের এই

আদর্শ চরিতবর্ণনা ভারতের পাঠকমণ্ডলী পরমাগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া আসিতেছে।

রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতাপুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, স্বামী স্ত্রীতে যে ধর্ম্মের বন্ধন, যে প্রীতি ভক্তির সম্বন্ধ রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে। দেশজয়, শত্রুবিনাশ, দুই প্রবল বিরোধী পক্ষের প্রচণ্ড আঘাত সংঘাত এই সমস্ত ব্যাপারই সাধারণত মহাকাব্যের মধ্যে আন্দোলন ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু রামায়ণের মহিমা রামরাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নাই—সে যুদ্ধ ঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য প্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষ মাত্র। পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতি পত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য কতদূর পর্য্যন্ত যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইয়াছে। এই রূপ ব্যক্তি বিশেষের প্রধানত ঘরের সম্পর্কগুলি কোনো দেশের মহাকাব্যে এমন ভাবে বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া গণ্য হয় নাই।

ইহাতে কেবল কবির পরিচয় হয় না ভারতবর্ষের পরিচয় হয়। গৃহ ও গৃহধর্ম্ম যে ভারতবর্ষের পক্ষে কতখানি ইহা হইতে তাহা বুঝা যাইবে। আমাদের দেশে গার্হস্থ্য আশ্রমের যে অত্যন্ত উচ্চস্থান ছিল এই কাব্য তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। গৃহাশ্রম আমাদের নিজের সুখের জন্য সুবিধার জন্য ছিল না—গৃহাশ্রম সমস্ত সমাজকে

ধারণ করিয়া রাখিত ও মানুষকে যথার্থভাবে মানুষ করিয়া তুলিত। গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আর্য্য সমাজের ভিত্তি। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য। এই গৃহাশ্রম-ধর্ম্মকেই রামায়ণ বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া বনবাস দুঃখের মধ্যে বিশেষ গৌরব দান করিয়াছে। কৈকেয়ী মন্থরার কুচক্রান্তের কঠিন আঘাতে অযোধ্যার রাজগৃহকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দিয়া তৎসত্ত্বেও এই গৃহধর্ম্মের দুর্ভেদ্য দৃঢ়তা রামায়ণ ঘোষণা করিয়াছে। বাহুবল নহে, জিগীষা নহে, রাষ্ট্রগৌরব নহে, শান্তরসাস্পদ গৃহধর্ম্মকেই রামায়ণ করুণার অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে সুমহৎ বীর্য্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

শ্রদ্ধাহীন পাঠকেরা বলিতে পারেন এমন অবস্থায় চরিত্রবর্ণনা অতিশয়োক্তিতে পরিণত হইয়া উঠে। যথাযথের সীমা কোন্‌খানে এবং কল্পনার কোন্ সীমা লঙ্ঘন করিলে কাব্যকলা অতিশয়ে গিয়া পৌঁছে এক কথায় তাহার মীমাংসা হইতে পারে না। বিদেশী যে সমালোচক বলিয়াছেন যে রামায়ণে চরিত্রবর্ণনা অতিপ্রাকৃত হইয়াছে তাঁহাকে এই কথা বলিব যে, প্রকৃতিভেদে একের কাছে যাহা অতিপ্রাকৃত, অন্যের কাছে তাহাই প্রাকৃত। ভারতবর্ষ রামায়ণের মধ্যে অতিপ্রাকৃতের আতিশয্য দেখে নাই।

যেখানে যে আদর্শ প্রচলিত তাহাকে অতিমাত্রায় ছাড়াইয়া গেলে সেখানকার লোকের কাছে তাহা গ্রাহ্যই হয় না। আমাদের শ্রুতিযন্ত্রে আমরা যতসংখ্যক শব্দ-তরঙ্গের আঘাত উপলব্ধি করিতে পারি তাহার সীমা আছে, সেই সীমার উপরের সপ্তকে

সুর চড়াইলে আমাদের কর্ণ তাহাকে গ্রহণই করে না। কাব্যে চরিত্র এবং ভাব উদ্ভাবনসম্বন্ধেও সে কথা খাটে।

এ যদি সত্য হয় তবে এ কথা সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রমাণ হইয়া গেছে যে রামায়ণ কথা ভারতবর্ষের কাছে কোনো অংশে অতি-মাত্র হয় নাই। এই রামায়ণ কথা হইতে ভারতবর্ষের আবাল-বৃদ্ধবনিতা আপামর সাধারণ কেবল যে শিক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে—আনন্দ পাইয়াছে, কেবল যে ইহাকে শিরোধার্য্য করিয়াছে তাহা নহে—ইহাকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়াছে, ইহা যে কেবল তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র তাহা নহে—ইহা তাহাদের কাব্য।

রাম যে একই কালে আমাদের কাছে দেবতা এবং মানুষ, রামায়ণ যে একই কালে আমাদের কাছে ভক্তি এবং প্রীতি পাইয়াছে ইহা কখনই সম্ভব হইত না যদি এই মহাগ্রন্থের কবিত্ব ভারতবর্ষের পক্ষে কেবল সুদূর কল্পলোকেরই সামগ্রী হইত, যদি তাহা আমাদের সংসার-সীমার মধ্যেও ধরা না দিত।

এমন গ্রন্থকে যদি অন্যদেশী সমালোচক তাঁহাদের কাব্য-বিচারের আদর্শ অনুসারে অপ্রাকৃত বলেন তবে তাঁহাদের দেশের সহিত তুলনায় ভারতবর্ষের একটি বিশেষত্ব আরো পরিস্ফুট হইয়া উঠে। রামায়ণে ভারতবর্ষ যাহা চায় তাহা পাইয়াছে।

রামায়ণ—এবং মহাভারতকেও আমি বিশেষত এই ভাবে দেখি। ইহার সরল অনুষ্টুপ্ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে।

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যখন তাঁহার এই

রামায়ণ চরিত্র সমালোচনার একটি ভূমিকা লিখিয়া দিতে আমাকে অনুরোধ করেন তখন আমার অস্বাস্থ্য ও অনবকাশ সত্ত্বেও তাঁহার কথা আমি অমান্য করিতে পারি নাই। কবিকথাকে ভক্তের ভাষায় আবৃত্তি করিয়া তিনি আপন ভক্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়াছেন। এইরূপ পূজার আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে প্রকৃত সমালোচনা—এই উপায়েই এক হৃদয়ের ভক্তি আর এক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। অথবা যেখানে পাঠকের হৃদয়েও ভক্তি আছে সেখানে পূজাকারকের ভক্তির হিল্লোল-তরঙ্গ জাগাইয়া তোলে। আমাদের আজকালকার সমালোচনা বাজারদর যাচাই করা—কারণ সাহিত্য এখন হাটের জিনিষ। পাছে ঠকিতে হয় বলিয়া চতুর যাচনদারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে সকলে উৎসুক। এরূপ যাচাই ব্যাপারের উপযোগিতা অবশ্য আছে কিন্তু তবু বলিব যথার্থ সমালোচনা পূজা—সমালোচক পূজারি পুরোহিত—তিনি নিজের অথবা সর্ব্বসাধারণের ভক্তি বিগলিত বিস্ময়কে ব্যক্ত করেন মাত্র।

ভক্ত দীনেশচন্দ্র সেই পূজামন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আরতি আরম্ভ করিয়াছেন। আমাকে হঠাৎ তিনি ঘণ্টা নাড়িবার ভার দিলেন। এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমি সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি অধিক আড়ম্বর করিয়া তাঁহার পূজা আচ্ছন্ন করিতে কুণ্ঠিত। আমি কেবল এই কথাটুকু মাত্র জানাইতে চাহি যে, বাল্মীকির রামচরিত কথাকে পাঠকগণ কেবল মাত্র কবির কাব্য বলিয়া দেখিবেন না, তাহাকে ভারতবর্ষের রামায়ণ বলিয়া জানিবেন। তাহা হইলে রামায়ণের দ্বারা ভারতবর্ষকে ও

ভারতবর্ষের দ্বারা রামায়ণকে যথার্থ ভাবে বুঝিতে পারিবেন। ইহা স্মরণ রাখিবেন যে, কোন ঐতিহাসিক গৌরবকাহিনী নহে পরন্তু পরিপূর্ণ মানবের আদর্শ চরিত ভারতবর্ষ শুনিতে চাহিয়াছিল, এবং আজ পর্য্যন্ত তাহা অশ্রান্ত আনন্দের সহিত শুনিয়া আসিতেছে। এ কথা বলে নাই যে বড় বাড়াবাড়ি হইতেছে—এ কথা বলে নাই যে এ কেবল কাব্যকথা মাত্র। ভারতবাসীর ঘরের লোক এত সত্য নহে—রাম লক্ষ্মণ সীতা তাহার যত সত্য।

পরিপূর্ণতার প্রতি ভারতবর্ষের একটি প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আছে। ইহাকে সে বাস্তবসত্যের অতীত বলিয়া অবজ্ঞা করে নাই, অবিশ্বাস করে নাই। ইহাকেই সে যথার্থ সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং ইহাতেই সে আনন্দ পাইয়াছে। সেই পরিপূর্ণতার আকাঙ্ক্ষাকেই উদ্বোধিত ও তৃপ্ত করিয়া রামায়ণের কবি ভারতবর্ষের ভক্ত-হৃদয়কে চিরদিনের জন্য কিনিয়া রাখিয়াছেন।

যে জাতি খণ্ড-সত্যকে প্রাধান্য দেন, যাঁহারা বাস্তব-সত্যের অনুসরণে ক্লান্তি বোধ করেন না, কাব্যকে যাঁহারা প্রকৃতির দর্পণমাত্র বলেন, তাঁহারা জগতে অনেক কাজ করিতেছেন—তাঁহারা বিশেষ ভাবে ধন্য হইয়াছেন—মানবজাতি তাঁহাদের কাছে ঋণী। অন্যদিকে, যাঁহারা বলিয়াছেন "ভূমৈব সুখং। ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" যাঁহারা পরিপূর্ণ পরিণামের মধ্যে সমস্ত খণ্ডতার সুষমা, সমস্ত বিরোধের শান্তি উপলব্ধি করিবার জন্য সাধনা করিয়াছেন তাঁহাদেরও ঋণ কোনোকালে পরিশোধ হইবার নহে। তাঁহাদের পরিচয় বিলুপ্ত হইলে তাঁহাদের উপদেশ বিস্মৃত হইলে মানবসভ্যতা

আপন ধূলিধূম্রসমাকীর্ণ কারখানা-ঘরের জনতামধ্যে নিঃশ্বাস-কলুষিত বদ্ধ আকাশে পলে পলে পীড়িত হইয়া কৃশ হইয়া মরিতে থাকিবে। রামায়ণ সেই অখণ্ড অমৃতপিপাসুদেরই চিরপরিচয় বহন করিতেছে। ইহাতে যে সৌভ্রাত্র, যে সত্যপরতা, যে পাতিব্রত্য, যে প্রভুভক্তি বর্ণিত হইয়াছে তাহার প্রতি যদি সরল শ্রদ্ধা ও অন্তরের ভক্তি রক্ষা করিতে পারি তবে আমাদের কারখানাঘরের বাতায়নমধ্যে মহাসমুদ্রের নির্ম্মলবায়ু প্রবেশের পথ পাইবে।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, বোলপুর।
৫ই পৌষ, ১৩১০।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---o---

গ্রন্থকারের নিবেদন।

"রামচন্দ্র" শীর্ষক প্রবন্ধটি অপরগুলির ন্যায় ঠিক চরিত্র-চিত্রণ নহে। রামায়ণ মহাভারতের বৃত্তান্ত আজকালকার বঙ্গীয় পাঠকগণের আর তেমন পরিজ্ঞাত নহে, এই জন্য "রামচন্দ্র" শীর্ষক সন্দর্ভটিতে রামায়ণের আখ্যায়িকা অনেকটা জুড়িয়া দিয়াছি, ঠিক রামচরিত্রের আলোচনা বলিয়া যাঁহারা ইহা পাঠ করিবেন, তাঁহারা অনেক স্থান বৃথা পল্লবিত মনে করিতে পারেন। রামায়ণানভিজ্ঞপাঠকগণ ধৈর্য্যসহকারে এই আখ্যায়িকাটি পাঠ করিলে রামায়ণের মূল বৃত্তান্ত অবগত হইবেন এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণের সঙ্গে মূলের কোন্ কোন্ স্থানে অনৈক্য তাহারও একটা আভাষ পাইবেন।

প্রবন্ধগুলির কোন কোনটিতে একই কথার পুনরুল্লেখ দৃষ্ট হইবে। দুই ব্যক্তির উত্তর প্রত্যুত্তরে তাহাদের উভয়ের চরিত্র অনেক সময় দুই দিক্ হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে এজন্য প্রত্যেকের চরিত্রের বিকাশ দেখাইবার নিমিত্ত একই কথার পুনরুল্লেখ অপরিহার্য্য বোধ হইয়াছে।

এই পুস্তকে যে সকল শ্লোকের অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা কোন কোন স্থানে ঠিক আক্ষরিক না হইলেও সর্ব্বত্রই মূলানুযায়ী—কোথায়ও মূলের অভিপ্রায়-বিরোধী নহে। অনেক স্থলে আমি গোরেসিওর সংস্করণ অবলম্বন করিয়া অনুবাদ দিয়াছি, তাহা প্রচলিত বাল্মীকির রামায়ণের বাঙ্গালা বা বোম্বের সংস্করণগুলিতে পাওয়া যাইবে না।

প্রবন্ধগুলির মধ্যে দশরথ এবং রামচন্দ্রের অনেকাংশ "বঙ্গ-ভাষায়" এবং অপরাপরগুলি "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত হইয়াছিল। এবার অনেকগুলি প্রবন্ধ আমূল পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

ভক্তিভাজন সুহৃৎ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অসুস্থাবস্থা সত্ত্বেও আমার অনুরোধে ভূমিকাটি লিখিয়া দিয়াছেন; এই সুন্দর ভূমিকাটিতে স্বল্পকথায় মহাকাব্যের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য ও সার কথা লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি এরূপ গৌরবজনক আভরণ পরিয়া বাহির হওয়াতে আমার চক্ষে ইহার সর্ব্বপ্রকার দৈন্য ঘুচিয়া গিয়াছে। এস্থলে কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেছি শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃৎ কবিবর শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র সি. এস. মহোদয়ের অবিরত উৎসাহ না পাইলে পুস্তকখানি প্রকাশিত হইত কি না সন্দেহ।

শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একটি তরুণ বয়স্ক যুবক এই পুস্তকখানির জন্য দুই খানি ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন। ইনি কোথায়ও চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন নাই। এ সম্বন্ধে ইঁহার এই প্রথম হাতেখড়ি বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না,—হাফটোন্ ছবি দুইখানি দেখিয়া পাঠকগণ ইঁহার উদ্যমের গুণাগুণের বিচার করিবেন।

পরিশেষে গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি, কটকের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত রায় হরিবল্লভ বসু বাহাদুর এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণ ব্যয়ের সাহায্য করিয়া আমাকে বিশেষরূপ উপকৃত করিয়াছেন।

কলিকাতা, ১৭ নং শ্যামপুকুর লেন,
১২ই বৈশাখ, ১৩১১ সন। } শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

বিষয়-সূচী।

চিত্র-সূচী।

রামায়ণী কথা।

দশরথ।

বাল্মীকি লিখিয়াছেন, মহারাজ দশরথ লোকবিশ্রুত মহর্ষিকল্প উজ্জ্বল চরিত্রবান্ ছিলেন ;—

"ন দ্বেষ্টা বিদ্যতে তস্য স তু দ্বেষ্টি ন কঞ্চন"

'এ জগতে তাঁহার কেহ শত্রু ছিল না, তিনিও কাহারও শত্রু ছিলেন না।' তিনি এতদুর পরাক্রান্ত ছিলেন, যে ইন্দ্র অসুরগণের সহিত যুদ্ধকালে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। তিনি জিতেন্দ্রিয় এবং প্রজাবৎসল ছিলেন ; প্রজাগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ— "পিতামহ ইবাপরঃ"—দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় সম্মান করিত।

অযোধ্যাকাণ্ডের ১০৭ সর্গে রামচন্দ্র ভরতকে বলিয়াছিলেন ;—

"ভ্রাতঃ পুত্রো দশরথাৎ কৈকেয্যাং রাজসত্তমাৎ।
পুরা ভ্রাতঃ পিতা নঃ স মাতরং তে সমুদ্বহন্।
মাতামহে সমাশ্রৌষীদ্রাজ্যশুল্কমনুত্তমম্।"

রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে বিবাহ করিবার সময় তৎপিতা অশ্বপতির নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন, তিনি কৈকেয়ীজাত পুত্রকে রাজ্য প্রদান করিবেন।

ইহার অর্থ এমন নহে যে, এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে রাজ্য ভরতেরই প্রাপ্য ছিল। কৌশল্যা প্রধানা রাজমহিষী ছিলেন, তাঁহার সন্তানই রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী; কৈকেয়ী নর্ম্ম-বিবাহের স্ত্রী, তথাপি উক্ত প্রতিশ্রুতি দ্বারা তাঁহার সন্তানগণও রাজ্যের অধিকার পাইলেন। অপরাপর মহিষীগণের গর্ভজাত পুত্রের সিংহাসনে দাবীই ছিল না। কৈকেয়ীর পুত্রগণের সেই-রূপ দাবী মান্য হইবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তিনি তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন।

কিন্তু অগ্র-মহিষীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া কৈকেয়ীর পুত্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবেন,—এই প্রতিশ্রুতির এ অর্থ নহে। প্রধানা মহিষী অপুত্রক হইলে কিংবা কৈকেয়ীর পুত্র জ্যেষ্ঠ হইলে, তাহার সিংহাসনের দাবী অগ্রাহ্য হইবে না—ইহার এই অর্থ।

দশরথ এরূপ প্রতিশ্রুতিই বা কেন করিলেন? কৈকেয়ী সুন্দরী এবং তরুণবয়স্কা ছিলেন—সুতরাং রূপজ মোহবশতঃই কি দশরথ এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন? বাল্মীকি লিখিয়াছেন, দশরথ 'জিতেন্দ্রিয়' ছিলেন, এ কথা অত্যুক্তি বা ব্যঙ্গোক্তি নহে। আমার বোধ হয় দশরথের অপুত্রকতা নিবন্ধনই তিনি এইরূপ প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন। তিনি বহুবিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা তৎকালের রাজপদ্ধতি অনুযায়ী,—কিন্তু কতকপরিমাণে উহা পুত্র-লাভের ঐকান্তিক ইচ্ছাবশতঃও হইতে পারে। এই পুত্রলাভার্থেই তিনি "অগ্নিষ্টোম", "অশ্বমেধ" প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান

করিয়াছিলেন, তাহাও আমরা দেখিতে পাইয়াছি। কিন্তু কৈকেয়ী যে তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী হইয়া উঠিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভরত বলিয়াছিলেন,—

"রাজা ভবতি ভূয়িষ্ঠম্ ইহাম্বায়া নিবেশনে"

রাজা অনেক সময় অম্বা কৈকেয়ীর গৃহেই বাস করিয়া থাকেন ;—

"সবৃদ্ধস্তরুণীং ভার্য্যাং প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্"

উক্তিও বাল্মীকিই দশরথের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সুতরাং বৃদ্ধ রাজা যে তরুণীর প্রতি কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন,—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে কৈকেয়ী যে অত্যন্ত স্বামিসেবাপরায়ণা ছিলেন, তাহার বৃত্তান্তও আমরা অবগত আছি ; দেবাসুর-যুদ্ধে শরাহত ও পীড়িত দশরথের উৎকট পরিচর্য্যা দ্বারা তিনি দুইটি বরলাভ করিয়াছিলেন। এই দুই বর দশরথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে দিয়াছিলেন। কৈকেয়ী তাহা সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন। তিনি স্বামিসেবার কোন পুরস্কার প্রত্যাশা করেন নাই ; সেই বরের কথা তিনি সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কুব্জার অভিসন্ধির ব্যাপার না ঘটিলে এবং তৎকর্তৃক তাহা স্মৃতিপথে পুনরায় উজ্জীবিত না হইলে কৈকেয়ী সেই বরের কথা কখনও মনে করিতেন কিনা সন্দেহ। ঈদৃশী গুণবতী রমণীর প্রতি অনুরাগ কতকটা স্বাভাবিক, এবং তজ্জন্য আমরা দশরথকে যতটা অভিযোগ দিয়া থাকি, তিনি ততদূর দোষী কিনা তাহাও বিবেচ্য।

কিন্তু এই অনুরাগ বশতঃ তিনি বাহিরে কৌশল্যার প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শন করিতে ক্রটী দেখাইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

বহুস্ত্রী থাকিলে কোন একটির প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই স্নেহ একটু বেশী হইতে পারে, কিন্তু তৎবশবর্ত্তী হইয়া তিনি জ্যেষ্ঠা মহিষীর প্রতি বাহ্য অবহেলা দেখাইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। যজ্ঞের চরু ভাগ করিবার সময় আমরা দেখিতে পাই, কৌশল্যাকে তিনি চরুর অর্দ্ধেক ভাগ বণ্টন করিয়া দিয়া অপর দুই মহিষীর জন্য অর্দ্ধেক ভাগ রাখিতেছেন, জ্যেষ্ঠা মহিষীর অধিকাংশ প্রাপ্য, তাহা তিনি ভুলিয়া যান নাই। বনযাত্রাকালে রাম লক্ষ্মণকে কৌশল্যার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করিয়া যাইতে চাহিলে, লক্ষ্মণ প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন. "কৌশল্যা স্বীয় অধীন ব্যক্তিগণকে সহস্র সহস্র গ্রাম দান করিয়াছেন, তিনি আমাদিগের ন্যায় সহস্র সহস্র ব্যক্তির ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিতে পারেন, তিনি নিজের কিম্বা মাতা সুমিত্রার উদরান্নের জন্য অপরের নিকট প্রার্থী হইবেন না। তাঁহার ভারগ্রহণের কোন চিন্তা আমাদের করিতে হইবে না।" সুতরাং কৌশল্যা স্বামীর চিত্তে একাধিপত্য স্থাপিত না করিতে পারিলেও যে অগ্রমহিষীর উচিত বাহ্যসম্পদ ও সম্মানাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

দশরথ কৈকেয়ীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং কৈকেয়ীও এপর্য্যন্ত পারিবারিক শান্তি নষ্ট করিতে প্রকাশ্যভাবে কোন চেষ্টা পান নাই। কৌশল্যার প্রতি কৈকেয়ী কিছু কুব্যবহার করিতেন, কিন্তু তাহা ধর্ম্মভীরু দেবভাবাপন্না কৌশল্যা স্বামীর কর্ণে তুলিতেন না, সুতরাং কৈকেয়ীর প্রতি দশরথের অতি-অনুরাগের জন্য কোন অশান্তির উদ্ভব হয় নাই।

কৈকেয়ীর প্রতি দশরথের যেরূপ একটু স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল, পুত্রগণের মধ্যে রামচন্দ্রের প্রতিও তাঁহার সেইরূপ স্নেহাধিক্যের পরিচয় পাওয়া যায়।—

"তেষামপি মহাতেজা রামো রতিকরঃ পিতুঃ"

'তাহাদিগের (পুত্রগণের) মধ্যে রামই রাজার বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন।' যখন বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে তাড়কাবধের জন্য লইয়া যাইতে চাহিলেন, তখন—

"ঊনষোড়শবর্ষো মে রামো রাজীবলোচনঃ"

বলিয়া রাজা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং রাক্ষসবধকল্পে যাইতে অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু বিশ্বামিত্রের নিকট তিনি সত্যবদ্ধ ছিলেন, সত্যের কথা স্মরণ করিয়া তিনি শেষে আর কোন আপত্তি করেন নাই। সত্যসন্ধ মহারাজ দশরথ সত্যের জন্য প্রাণপ্রিয় কাকপক্ষধর বালক পুত্রদ্বয়কে ভীষণ রাক্ষসযুদ্ধে প্রেরণ করিতে সম্মত হইলেন। এই সত্যপালনের জন্যই তিনি স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

অভিষেক-ব্যাপারে দশরথের অতিরিক্ত আগ্রহ কতকপরিমাণে বিস্ময়জনক বলিয়া বোধ হয়। অভিষেকের প্রাক্কালে এইরূপ আভাষ পাওয়া যায়, যে তিনি স্বীয় আসন্নমৃত্যুর পূর্ব্বাভাষ পাইয়াছিলেন; তাঁহার শরীর জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল এবং কতকগুলি প্রাকৃতিক দুর্লক্ষণ তাঁহার অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার করিয়াছিল; তজ্জন্য তিনি জ্যেষ্ঠ-পুত্রকে সিংহাসনে

স্থাপিত করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন, তাহা স্বাভাবিক।—

"বিপ্রোষিতশ্চ ভরতো যাবদেব পুরাদিতঃ।
তাবদেবাভিষেকস্তেপ্রাপ্তোকালো মতো মম॥"

ভরত অযোধ্যা হইতে দূরে থাকিতে থাকিতেই অভিষেক সম্পন্ন হইয়া যায়, ইহাই আমার অভিপ্রায়—এই কথার সমর্থন-জন্য রাজা বলিয়াছিলেন—"যদিও ভরত ধর্ম্মশীল, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বদা জ্যেষ্ঠের ছন্দোনুবর্ত্তী কিন্তু ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধুব্যক্তিরও চিত্ত-বিচলিত হইতে পারে", এইরূপ আশঙ্কা দশরথের কেন হইয়াছিল, তাহার কারণ বিশদরূপে বুঝিতে পারা যায় না। ভরত এবং শত্রুঘ্ন মাতুলালয়ে বাস করিতেছিলেন, সেখানে মাতুল অশ্বপতি-কর্ত্তৃক পুত্রস্নেহে পালিত হইয়াও—

"তত্রাপি নিবসন্তৌ তৌ তর্পামাণৌ চ কামতঃ।
ভ্রাতরৌ স্মরতাং বীরৌ বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্॥"

মাতুলালয়ের বিবিধ আদর সত্ত্বেও তাঁহারা ভ্রাতাদিগকে এবং বৃদ্ধ দশরথ রাজাকে স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা দুঃখিত ছিলেন। পিতৃবৎসল এবং ভ্রাতৃবৎসল ভরতের প্রতি রাজার আশঙ্কার কোনও কারণ পাওয়া যায় না। এদিকে জনকরাজাকে ও অশ্বপতিকে তিনি অভিষেকোৎসবে নিমন্ত্রণ করিলেন না; শুভব্যাপার শেষ হইলে তাঁহারা শুনিয়া সুখী হইবেন, এই কথা বলিলেন। এইভাবে ত্বরান্বিত ও সশঙ্ক হইয়া তিনি অভিষেকের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইলেন; যেন কোন অমঙ্গলের ছায়া তাঁহার সম্মুখে পতিত হইয়াছিল; ভাবী

অনর্থের পূর্ব্বাভাষ যেন অলক্ষিতভাবে তাঁহার মনের উপর ক্রিয়া করিতেছিল; কোন অশুভ গ্রহের তাড়নায় যেন তিনি রামাভিষেকের অচিন্তিতপূর্ব্ব বিঘ্নরাশি স্বয়ং আশঙ্কা দ্বারা আকর্ষণ করিয়া আনিলেন। ভরতকে আনিয়া এবং আত্মীয়গণকে আমন্ত্রণ করিয়া এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে এরূপ অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত না; ভরত উপস্থিত থাকিলে কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইত।

কৈকেয়ী যে এইরূপ অনর্থের সূচনা করিবেন, তাহা দশরথ কখনও চিন্তাই করেন নাই; কৈকেয়ী দশরথকে বারংবার বলিয়াছেন তাঁহার নিকট ভরত এবং রাম একরূপই প্রীতিভাজন। * রামচন্দ্রের ধর্ম্মশীলতার কত প্রশংসা কৈকেয়ী বহুবার রাজার নিকট করিয়াছেন। † মন্থরা কৈকেয়ীকে উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে যখন ক্রুদ্ধস্বরে রামের অভিষেক সংবাদ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল, তখন প্রফুল্ল মনে কৈকেয়ী স্বীয় কণ্ঠবিলম্বিত বহুমূল্য হার মন্থরাকে উপহার দিলেন এবং মন্থরার ক্রোধ ও আশঙ্কার কিছুমাত্র কারণ বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন—

"রামে বা ভরতে বাহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে।
যথা বৈ ভরতো মান্যস্তথা ভূয়োঽপি রাঘবঃ।
কৌসল্যাতোঽতিরিক্তং চ মম শুশ্রূষতে বহু।
রাজ্যং যদি হি রামস্য ভরতস্যাপি তত্তদা।"

"রাম এবং ভরতে আমি কিছু মাত্র প্রভেদ দেখি না, ভরত

* অযোধ্যাকাণ্ড, ১২ অধ্যায়, ১৭ শ্লোক।
† অযোধ্যাকাণ্ড, ১২ অধ্যায়, ২১ শ্লোক।

এবং রাম আমার নিকট তুল্যরূপ ; কৌশল্যা হইতে রাম আমার প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। রাজ্য রামের হইলেই ভরতের হইল।”

যিনি রাজার গোচরে এবং তাঁহার অগোচরে রামের প্রতি এইরূপ সরল স্নেহভাবাপন্না, তাঁহাকে দিয়া রাজা কেনই বা আশঙ্কা করিবেন! এই দেবভাবাপন্ন সুখ শান্তিময় পরিবারে এক বিকৃতাঙ্গী দাসীর কুটিল হৃদয়ের বিষ প্রবেশ করিয়া সমস্ত অনর্থের উৎপত্তি করিয়াছিল।

অভিষেকের সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়া রাজা প্রফুল্ল মনে কৈকেয়ীর গৃহে গমন করিলেন; তখন সন্ধ্যাকাল উপস্থিত—কৈকেয়ীর প্রাসাদের পার্শ্বে বিচিত্র লতাগৃহ ও চিত্রশালার প্রাচীরবাহী সপুষ্পবল্লরীর উপর অস্তোন্মুখ সূর্য্যের কিরণ আসিয়া পড়িয়াছিল। কৈকেয়ী —“প্রিয়ার্হা” প্রিয় কথার যোগ্যা, সুতরাং—“প্রিয়মাখ্যাতুং” তাঁহাকে রামাভিষেকের প্রিয় সংবাদ দেওয়ার জন্য রাজা আগ্রহান্বিত হইলেন।

কৈকেয়ী ক্রোধাগারে ছিলেন, রাজা তাঁহাকে শয়নগৃহে না পাইয়া ও তাঁহার ক্রোধের সংবাদ শুনিয়া উৎকণ্ঠিত হইলেন। ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়া তিনি যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণ আতঙ্কিত হইল। কৈকেয়ী তাঁহার সমস্ত ভূষণ ছুড়িয়া ফেলিয়াছেন, চিত্রগুলি স্থানচ্যুত হইয়াছে, পুষ্পমাল্যগুলি হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত খট্টার পার্শ্বে ছিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে। অসংযত কেশপাশে মানিনী ভূলুণ্ঠিতা লতার ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন।

রাজা আদরে তাঁহার কেশরাজি স্পর্শ করিয়া বলিলেন—"কেহ কি তোমাকে অপমান করিয়াছে? তোমার শরীর অসুস্থ হইয়া থাকিলে রাজবৈদ্যগণ এখনই তোমার চিকিৎসায় নিযুক্ত হইবেন, কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে কি ধনাঢ্য করিতে হইবে?—

"অহঞ্চ হি মদীয়াশ্চ সর্ব্বে তব বশানুগাঃ"

আমি এবং আমার যাহা কিছু, সকলই তোমার অধীন; তুমি যাহা চাহ বল, আমি এখনই তোমাকে তাহা প্রদান করিয়া তোমার প্রীতি উৎপাদন করি।—

"যাবদাবর্ত্ততে চক্রং তাবতী মে বসুন্ধরা।"

"সূর্য্যমণ্ডল বসুন্ধরার যে পর্য্যন্ত আলোকিত করেন, সেই সমস্ত রাজ্যই আমার অধিকারভুক্ত"—সুতরাং জগতে তোমার অপ্রাপ্য কিছুই নাই।

তখন সুযোগ বুঝিয়া কৈকেয়ী দুই বর চাহিলেন। রাজা তাহা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। "আমি রামাপেক্ষা জগতে কাহাকেও অধিক ভালবাসি না, সেই রামের শপথ, আমি প্রতিশ্রুত হইলাম, তুমি যাহা চাহিবে দিব।"

কৈকেয়ী কি চাহিবেন? হয়ত "সাগরসেঁচা মাণিকের" একটা কণ্ঠী কিম্বা অপর কোন মূল্যবান্ অলঙ্কার, রমণীগণ ইহাই লইয়া আবদার করিয়া থাকেন; আজ এই শুভদিনে কৈকেয়ীকে তাহা অদেয় হইবে না। রাজা বিশ্বস্তমনে অকুতোভয়ে প্রতিশ্রুত হইয়া পড়িলেন।

তখন কৈকেয়ী নিশ্চলভাবে ধীরে ধীরে তাঁহাকে দুইটি ঘোর

অপ্রিয় কথা শুনাইলেন—ভরতের অভিষেক ও চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য রামের বনবাস, এই দুই বর।

রাজা কিছুকাল কৈকেয়ীর কথা বুঝিতে পারিলেন না, উহা কি দিবাস্বপ্ন না চিত্তমোহ? তাঁহার সর্ব্বশরীর হিম হইয়া পড়িল। যে সুন্দরীর কেশপাশ সাদরে ধারণ করিয়া তিনি কত স্নেহমধুর কথা বলিতেছিলেন, তাঁহার সেই কুঞ্চিত কেশরাজি তাঁহার নিকট মৃত্যুর বাগুরা বলিয়া বোধ হইল; রূপসী কৈকেয়ী তাঁহার নিকট ভয়ঙ্করী বলিয়া প্রতীয়মানা হইলেন। ব্যথিত ও বিক্লব দৃষ্টিতে তিনি কৈকেয়ীর দিকে চাহিয়া ভীত হইলেন—"ব্যাঘ্রীং দৃষ্ট্বা যথা মৃগঃ",

মৃগ যেরূপ ব্যাঘ্রীর প্রতি ভীতভাবে দৃষ্টি করে, রাজা কৈকেয়ীকে দেখিয়া তদ্রূপ আতঙ্কিত হইলেন।

"নৃশংসে, রাম তোমাকে সর্ব্বদা জননীতুল্য স্নেহ ও শুশ্রূষা করিয়া আসিয়াছেন, তাহার এই ঘোর অনিষ্ট তুমি কেন কামনা করিতেছ? আমি কৌশল্যা, সুমিত্রা এমন কি অযোধ্যায় অধিষ্ঠিত রাজলক্ষ্মীকেও বিদায় দিতে পারি, কিন্তু রাম ভিন্ন আমি জীবন ধারণ করিতে পারিব না।

"তিষ্ঠেল্লোকো বিনা সূর্য্যং শস্যং বা সলিলং বিনা।"

'সূর্য্য ভিন্ন জগৎ ও জল ভিন্ন শস্য বাঁচিতে পারে',—কিন্তু রামকে ছাড়িয়া আমি জীবন ধারণ করিতে অসমর্থ।" এই সকল কথা বলিয়া কখনও রাজা ক্রুদ্ধস্বরে কৈকেয়ীকে গঞ্জনা করিলেন, কখনও কৃতাঞ্জলি হইয়া কৈকেয়ীর পদে পতিত হইলেন। কিন্তু কৈকেয়ীর হৃদয় কিছুমাত্র আর্দ্র হইল না, তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন

—"মহারাজা শৈব্য সত্য-রক্ষার জন্য স্বীয় মাংস শ্যেন পক্ষীকে প্রদান করিয়াছিলেন, সত্যবদ্ধ হইয়া অলর্ক তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করিয়াছিলেন, সমুদ্র সত্যবদ্ধ থাকাতে বেলাভূমি আক্রমণ করেন না; তুমি যদি সত্যরক্ষা না কর, তবে এখনই আমি বিষ ভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।" মহারাজ দশরথ ক্রমেই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; অভিষেকোৎসবে আমন্ত্রিত হইয়া নানা দিগ্‌দেশ হইতে রাজগণ আগত হইয়াছেন; বহু বৃদ্ধ গুণবান্ ও সজ্জনগণ একত্র হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে লইয়া কল্য যে মহতী সভার অধিবেশন হইবে, তিনি সেই সভায় উপস্থিত হইবেন কিরূপে? আর জগতে তিনি কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারিবেন না;—মানী-ব্যক্তির অপমান মৃত্যু তুল্য; মহামান্য রাজা দশরথের যে সম্মান পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ ও অটুট ছিল আজ তাহা ভূলুণ্ঠিত হইবে। এক দিকে এই ঘোর লজ্জা,—অপর দিকে চির স্নেহময়, অনুগত ভৃত্যের ন্যায় বশ্য, প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্রের ইন্দীবরসুন্দর মুখখানি মনে পড়িয়া দশরথের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। নক্ষত্রমালিনী নিশা জ্যোৎস্না-সম্পদ্ বিভূষিতা হইয়া শোভা পাইতেছিল; রাজা অশ্রু-সিক্ত দৃষ্টি গগনে নিবিষ্ট করিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক বলিলেন—

"ন প্রভাতং ত্বয়েচ্ছামি নিশে নক্ষত্রভূষিতে"

হে নক্ষত্রময়ী শর্ব্বরি, আমি তোমার প্রভাত ইচ্ছা করি না" প্রভাত যেন এই লজ্জা ও শোকের দৃশ্য জগৎ সম্মুখে উন্মোচন না করে, সজলনেত্রে বৃদ্ধ দশরথ রাজা ইহাই সকাতরে প্রার্থনা করিলেন। কখনও পুণ্যান্তে পতিত যযাতির ন্যায় তিনি কৈকেয়ীর

পদতলে পতিত হইলেন; গীত শব্দে লুব্ধ হইয়া মৃগ যেরূপ মৃত্যু-মুখে পতিত হয়, আজ দশরথের অবস্থা সেইরূপ। "কুণ্ডলধর সুপকারগণ যাঁহার মহার্ঘ আহার্য্যের পরিবেশন করেন, তিনি কিরূপে কষায়, কটু ও তিক্ত বন্য ফল খাইয়া বনে বনে বিচরণ করিবেন! রাজকুমারের অভিষেকোজ্জ্বল চিরসুখোচিত-মূর্ত্তি কল্পনার চক্ষে ভিখারী সাজাইয়া দশরথ মুহ্যমান হইলেন, তাঁহার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল।

এই প্রলাপ ও বিলাপ করিতে করিতে রজনী প্রভাত হইল; বন্দীরা সুমধুর গান ধরিল; মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ণে যেরূপ মিষ্ট সংগীত পৌঁছিয়াও পৌঁছে না, হতভাগ্য দশরথের আজ সেই অবস্থা।

তখন বশিষ্ঠ অভিষেকের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিয়া দ্বার-দেশে দণ্ডায়মান; রামাভিষেকের হর্ষে অযোধ্যাপুরীর নিদ্রা শীঘ্র শীঘ্র ছুটিয়া গিয়াছে, রাজপ্রাসাদ হইতে বিশাল কলরব শ্রুত হইতেছে। বশিষ্ঠের আদেশে সুমন্ত্র রাজাকে সভাগৃহে আহ্বান করিবার জন্য তৎসকাশে উপস্থিত হইলেন; সংজ্ঞাহীন রাজা তখন কৈকেয়ীর প্রতি ধারাকুল চক্ষু আবদ্ধ করিয়া বলিতেছিলেন;—

"ধর্ম্মবন্ধেন বদ্ধোঽস্মি নষ্টা চ মম চেতনা
জ্যেষ্ঠং পুত্রং প্রিয়ং রামং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ধার্ম্মিকং।"

'আমি ধর্ম্মবন্ধে আবদ্ধ, আমার চেতনা নষ্ট হইয়াছে, আমি আমার ধর্ম্মবৎসল জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয় রামচন্দ্রকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করি।'

এই সময়ে সুমন্ত্র আসিয়া বলিলেন, ভগবান বশিষ্ঠ,—সুযজ্ঞ,

বামদেব, জাবালি প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে উপস্থিত হইয়াছেন, মহারাজ, রামের অভিষেকের আদেশ প্রদান করুন। শুষ্ক মুখে, দীন নয়নে রাজা সুমন্ত্রের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সুমন্ত্র দশরথের এই করুণমূর্ত্তি দেখিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া সকাতরে তাঁহার আদেশ জানিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তখন কৈকেয়ী বলিলেন,—

"সুমন্ত্র রাজা রজনীং রামহর্ষসমুৎসকঃ।
প্রজাগর পরিশ্রান্তো নিদ্রাবশমুপাগতঃ।"

"সুমন্ত্র, রাজা রামাভিষেকের হর্ষে কাল রাত্রি আনন্দে জাগরণ করিয়াছেন, এজন্য বড় নিদ্রাতুর ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন— "তুমি রামকে শীঘ্র লইয়া আইস।" কৃতাঞ্জলিবদ্ধ সুমন্ত্র বলিলেন—

"অশ্রুত্বা রাজবচনং কথং গচ্ছামি ভামিনি"

"রাজ্ঞি, আমি রাজার অভিপ্রায় না জানিয়া কিরূপে যাইব?" তখন দশরথ বলিলেন—"সুমন্ত্র, আমি সুন্দর রামচন্দ্রকে দেখিতে ইচ্ছা করি, তুমি তাহাকে শীঘ্র লইয়া আইস।"

এই সময় হইতে মহারাজ দশরথের শোকোচ্ছাস আর ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই, নীরবে নেত্রজলে আপ্লুত হইয়া তিনি কখনও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন, কখনও সকাতর অর্থশূন্য দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়াছেন। যখন রাম আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন, তখন 'রাম'—এই কথাটি মাত্র উচ্চারণ করিয়া দীন-ভাবে অধোমুখে কাঁদিতে লাগিলেন, রামের মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না এবং আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। যখন রাম বনবাসের প্রতিশ্রুতি পালনে স্বীকৃত হইয়া কৈকেয়ীকে

আশ্বাসিত করিতেছিলেন তখন দশরথ মৌন এবং বিমূঢ়ভাবে সকলই শুনিতেছিলেন, তাঁহার দিকে চাহিয়া রাম কৈকেয়ীকে বলিলেন, "দেবি, তুমি উহাঁকে আশ্বাস প্রদান কর, উনি কেন অধোমুখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন!" যখন রাম বলিলেন, "পিতা প্রত্যক্ষ দেবতা, আমি তাঁহার আদেশে বিষ ভক্ষণ করিতে পারি, সমুদ্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারি", তখন সেই বিষমিশ্রিত অমৃততুল্য স্নেহ-মধুর অথচ মর্ম্মচ্ছেদী বাক্য শুনিয়া শোকাতুর রাজা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন। রামকে বনে যাইবার জন্য ত্বরান্বিত করিয়া কৈকেয়ী বলিলেন, "রাম, তুমি ইঁহার নিকটে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় লইয়া যে পর্য্যন্ত বনগমন না করিবে, সে পর্য্যন্ত ইনি স্নান ভোজন কিছুই করিবেন না।" এই কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে মহারাজ দশরথ শয্যা হইতে ভূতলে পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া রহিলেন; মহিষীগণের আর্ত্ত-শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল, তাঁহারা যখন চীৎকার করিয়া বলিতেছিলেন,—

"অনাথস্য জনস্যাস্য দুর্ব্বলস্য তপস্বিনঃ।
যো গতিঃ শরণং চাসীৎ স নাথ ক্ক নু গচ্ছতি॥"

অনাথ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির একমাত্র আশ্রয় ও গতি—রামচন্দ্র আজ কোথায় যাইতেছেন"—তখন সেই—"ক্ক গচ্ছতি" স্বরের প্রতিধ্বনি রাজার হৃদয়-তন্ত্রী হইতে উত্থিত হইতেছিল। রাজা 'বুদ্ধিশূন্য' বলিয়া যখন তাঁহারা কাঁদিতেছিলেন, তখন দশরথের মুখমণ্ডল নয়নজলে প্লাবিত হইতেছিল।

রামচন্দ্র মাতার নিকটে বিদায় লইলেন; সীতা ও লক্ষ্মণ সঙ্গী

হইলেন, তখন তিনি বিদায় লইবার জন্য পিতৃসকাশে উপস্থিত হইলেন ; সুমন্ত্র রাজাকে তাঁহার আগমন সংবাদ জানাইলেন ;—

"স সত্যবাক্য ধর্ম্মাত্মা গাম্ভীর্য্যাৎ সাগরোপমঃ।
আকাশ ইব নিষ্পঙ্কো নরেন্দ্রঃ প্রত্যুবাচ তম্॥"

'সেই সত্যবাক্য ধর্ম্মাত্মা সাগর সদৃশ গম্ভীর এবং আকাশের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক রাজা দশরথ সুমন্ত্রকে বলিলেন,—"আমার সমস্ত মহিষীবর্গকে লইয়া আইস, আমি তাঁহাদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া রামচন্দ্রকে দর্শন করিব।" সমস্ত রাজমহিষী উপস্থিত হইলেন, তখন রামচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন—রাজা দুর হইতে কৃতাঞ্জলি-বদ্ধ রামকে আসিতে দেখিয়া শোকবেগে আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিলেন, এবং অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, তখন মহিষীগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন, রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে বনগমনোদ্যত দেখিয়া তাঁহারা শোকার্ত্ত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ভূষণধ্বনিমিশ্রিত "হাহা রাম-ধ্বনি" প্রাসাদ প্রতিধ্বনিত করিল। মহিষীগণ রামলক্ষ্মণ ও সীতাকে বাহুবদ্ধ করিয়া বিবৎসা ধেনুর ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। অশ্রুচক্ষু রাজার সংজ্ঞালাভ হইলে, রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে বনে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাজা কাঁদিতে কাঁদিতে রামচন্দ্রকে বলিলেন,—"ভস্মাগ্নি তুল্য ছন্ন স্ত্রী দ্বারা চালিত হইয়া আমি অশক্ত হইয়া পড়িয়াছি, আমি বরদানে মোহিত, তুমি আমাকে নিগৃহীত করিয়া রাজ্য অধিকার কর।" রাম বনগমনের দৃঢ় সংকল্প বিজ্ঞাপিত করিলে রাজা পুনর্ব্বার বলিলেন—"তাত, তুমি বনে গমন কর, শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিও,

আমি তোমাকে সত্যভ্রষ্ট হইতে বলিতে পারিতেছি না—তোমার পথ ভয়শূন্য হউক। আমার একটি প্রার্থনা, তুমি আজ অযোধ্যায় থাকিয়া যাও, আমি এবং তোমার মাতা একদিন তোমার চন্দ্র-মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া লইব এবং তোমার সঙ্গে একত্র বসিয়া আহার করিব।”

রামচন্দ্র “অদ্যই বনে যাইব” বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন, সুতরাং তিনি রাজার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। কৈকেয়ী যে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—“রাম, তুমি শীঘ্র বনে না গেলে রাজা স্নান ভোজন করিবেন না।” সম্ভবতঃ রাজা সেই মৃত্যু তুল্য দারুণ কথায় মনে নিরতিশয় কষ্ট পাইয়া রামের সঙ্গে একত্র আহারের জন্য ব্যগ্রতা দেখাইয়াছিলেন। রাম স্বীকৃত হইলেন না। বৃদ্ধ রাজা আর সাতদিন মাত্র জীবিত ছিলেন, ইহার মধ্যে কিছু আহার করিয়া-ছিলেন বলিয়া জানা যায় নাই।

তৎপর রাম কৈকেয়ী প্রদত্ত বল্কল পরিয়া ভিখারী সাজিলেন। রাজা ভিখারী পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ সচিববৃন্দ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, তাঁহারা তীব্র ভাষায় কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। সুমন্ত্র হস্ত দ্বারা হস্ত নিষ্পেষণ করিয়া, দন্ত কটমট ও শির-কম্পনের সহিত কৈকেয়ীকে পতিঘ্নী ও কুলঘ্নী বলিয়া গালি দিলেন এবং বলিলেন, “যে মহারাজ পর্ব্বতের ন্যায় অটল, তিনি বালকের ন্যায় আর্ত্ত হইয়া পড়িয়াছেন, দেবি, আপনি ইহা দেখিয়াও কি অনুতপ্ত হইতেছেন না?”--

"ভর্ত্তুরিচ্ছা হি নারীণাং পুত্রকোট্যা বিশিষ্যতে"

"স্বামীর ইচ্ছা রমণীগণের নিকট কোটি পুত্রের অপেক্ষাও অধিকতর গণ্য।" আপনি দেবতুল্য স্বামীকে বধ করিতে দাঁড়াইয়াছেন? বশিষ্ঠ বলিলেন,—

"নহ্যদত্তাং মহীং পিত্রা ভরতঃ শাস্তুমিচ্ছতি।
ত্বয়ি বা পুত্রবত্তস্তং যদি যাতো মহীপতেঃ॥
যদ্যপি ত্বং ক্ষিতিতলাদ্গগনং চোৎপতিষ্যতি।
পিতৃবংশচরিত্রজ্ঞঃ সোঽন্যথা ন করিষ্যতি॥"

ভরত এই রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিবেন না, তিনি যদি দশরথ হইতে জাত হইয়া থাকেন, তবে তুমি ক্ষিতিতল হইতে আকাশে উত্থিত হইলেও পিতৃবংশ-চরিত্রজ্ঞ ভরত অন্যরূপ আচরণ করিবেন না।" কৈকেয়ী অসমঞ্জের উদাহরণ দেখাইয়া রাজা দশরথকে তিরস্কার করাতে রাজা বিমনা হইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। মহারাজের এই অবস্থা দর্শনে ব্যথিত হইয়া মহামাত্র সিদ্ধার্থ কৈকেয়ীকে অসমঞ্জ সম্বন্ধীয় তাহার ভ্রম প্রদর্শন করিয়া দিলেন। এইরূপ বাগ্‌বিতণ্ডায় রাজগৃহ আকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু রামচন্দ্র সেই সকল সুহৃৎ ও আত্মীয়বর্গের যত্নে কিছুমাত্র বিচলিত বা স্বীয় প্রতিজ্ঞা-বিচ্যুত না হইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বারংবার রাজার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন; ভ্রাতা ও স্ত্রীর সঙ্গে রথারোহণ করিয়া তিনি বনযাত্রা করিলেন, তখন অযোধ্যা-বাসিগণ তাঁহার সম্মুখে এবং পশ্চাতে লম্বমান ও উন্মুখ হইয়া অশ্রুত্যাগ করিতে করিতে রথের সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন করিতে

লাগিলেন। এই শোকাকুল জনসঙ্ঘের মধ্যে নগ্নপদে উন্মত্তের ন্যায় মহারাজ দশরথ ছুটিয়া আসিয়া পড়িলেন; কৌশল্যাও সেই সঙ্গে অসম্বৃত ভূলুণ্ঠিত অঞ্চলে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিলেন। যাঁহার রাজপথে আগমনে, শিবিকা, রথ, অশ্ব ও সৈন্যবৃন্দের সমারোহ উপস্থিত হইত, সেই রাজচক্রবর্ত্তীর এই উন্মত্ত অবস্থা দর্শনে প্রজাগণ ব্যথিত হইল, তাহারা সরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু বারণ করিতে সাহসী হইল না। বৎসের উদ্দেশে যেরূপ ধেনু ছুটিয়া যায়, রাজা ও মহিষী সেইরূপ ছুটিলেন; 'হা রাম' বলিতে বলিতে জলধারাকুলনয়নে তাঁহারই রাজপথের কঙ্করের উপর দিয়া যাইতে লাগিলেন। রাজা রামকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিয়া "রথ রাখ, রথ রাখ" বলিতে লাগিলেন। রাম সুমন্ত্রকে বলিলেন, "আমি এই দৃশ্য দেখিতে পারিতেছি না, সুমন্ত্র, তুমি শীঘ্র রথ চালাইয়া লইয়া যাও।"

রথ দৃষ্টিপথ-বহির্ভূত হইল। রাজা ধূলি-শয্যায় অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, প্রজাগণ হাহাকার করিতে লাগিল। চৈতন্যলাভ করিয়া দশরথ দেখিলেন, তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে কৌশল্যা এবং বামপার্শ্বে কৈকেয়ী; তিনি কৈকেয়ীকে বলিলেন, "আমি পবিত্র অগ্নি সাক্ষী করিয়া তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, আজ তোমাকে ত্যাগ করিলাম। তুমি আজ হইতে আমার স্ত্রী নহ।" তৎপর করুণ-কণ্ঠে বলিলেন—"দ্বারদর্শিগণ, আমাকে শীঘ্র রাম-মাতা কৌশল্যার গৃহে লইয়া যাও, আমি অন্যত্র সান্ত্বনা পাইব না।" পুত্রদ্বয় ও রাজবধূবিরহিত শ্মশানতুল্য গৃহে প্রবেশ করিয়া রাজা বালকের ন্যায়

উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। রাত্রে দশরথের তন্দ্রা আসিল, কিন্তু অর্দ্ধরাত্রে জাগিয়া উঠিয়া কৌশল্যাকে বলিলেন—"আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, রামের রথের পশ্চাতে আমার দৃষ্টি চলিয়া গিয়াছে, আমি দৃষ্টি ফিরিয়া পাই নাই, তুমি আমাকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ কর।"

ছয় দিন পরে সুমন্ত্র শূন্যরথ লইয়া ফিরিয়া আসিল। রামকে লইয়া রথ গিয়াছিল, রামশূন্য রথ দর্শনে অযোধ্যাবাসীর হৃদয় বিদীর্ণ হইল। সুমন্ত্র দেখিলেন, অযোধ্যার হরিৎছদ শ্যামল তরু-রাজি যেন ম্লান-মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কুসুম-কুল গুচ্ছে গুচ্ছে শুষ্ক হইয়া আছে, পল্লবান্তরালে অঙ্কুর ও কোরক ধূসর বর্ণ ধারণ করিয়াছে, পক্ষীগুলি গুন্ঠিত পক্ষে মৌন হইয়া নীড়ে বসিয়া আছে, মূলবদ্ধ থাকাতে তরুগুলি রামের সঙ্গে যাইতে পারে নাই, কিন্তু তাহাদের শাখা পল্লব যেন সেই পথে উন্মুখ হইয়া আছে। হর্ম্ম্য-সমূহের শেখর ও বাতায়নে অযোধ্যাবাসিনীগণের সুন্দর চক্ষু শূন্য-রথ দেখিয়া মুহুর্মুহু জলভারাকুল হইয়া উঠিতেছে। "রামকে কোথায় রাখিয়া আসিলে" বলিয়া প্রজাগণ সুমন্ত্রকে সজলচক্ষে প্রশ্ন করিল। উত্তর না দিয়া বাষ্পপূর্ণ চক্ষে সুমন্ত্র রাজসকাশে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহার স্বর শুনিবা মাত্র অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। মহিষীগণ কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন "তোমার প্রিয়-তম রামের সংবাদ লইয়া সুমন্ত্র আসিয়াছে, তাহাকে কেন কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছ না?"

কতক পরিমাণে সুস্থ হইয়া দশরথ রামের সমস্ত সংবাদ শ্রবণ

করিলেন এবং বলিলেন "প্রস্রবণ সান্নিধ্যে করিশাবকের ন্যায় রাম ধূলি-বিলুণ্ঠিত হইয়া হয়ত কোথাও পড়িয়া থাকিবেন, কাষ্ঠ বা প্রস্তরখণ্ডের উপর শিরোরক্ষা করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিবেন, প্রাতে ধূলিময় গাত্রে কটু বনফলের সন্ধানে ধাবিত হইবেন।" আর কিছু বলিতে পারিলেন না, অজস্র অশ্রু-বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সুমন্ত্রকে বলিলেন, "আমাকে শীঘ্র রামের নিকট লইয়া যাও, আমি রাম ভিন্ন মুহূর্ত্তকালও বাঁচিতে পারিব না; আমার মৃত্যু নিকটে, ইহা হইতে আর কি দুঃখের বিষয় হইতে পারে যে আমি এই দুঃসময়ে রামের ইন্দীবর মুখখানি দেখিতে পাইলাম না!"

কৌশল্যা রামের জন্য অনেক বিলাপ করিলেন, রাত্রিতে তিনি অসহ্য হৃদয়ের কষ্টে রাজার প্রতি দু' একটী কটুবাক্য প্রয়োগ করিলেন;—দশরথ নিজের অপরাধ নিজে যত বুঝিয়াছিলেন, এত কেহই বুঝেন নাই, কৌশল্যার কটূক্তি শুনিয়া তিনি নিঃসহায়ভাবে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কাঁদিয়া করজোড়ে কৌশল্যার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন; তখন ধর্ম্মপ্রাণা সাধ্বী কৌশল্যা তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া স্বীয় অপরাধের জন্য বহুবার মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন। আশ্বস্ত হইয়া মহারাজ একটু নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। তখন সূর্য্যদেব মন্দরশ্মি হইয়া আকাশ-প্রান্তে ঢলিয়া পড়িয়াছেন এবং ক্লান্তিহারিণী নিদ্রাকে অগ্রদূতী স্বরূপ প্রেরণ করিয়া নিশীথিনী শনৈঃ শনৈঃ অযোধ্যাপুরীর ক্ষত বিক্ষত হৃদয় স্বীয় স্নেহাঞ্চলে আবরণ করিয়া লইয়াছেন।

কিছুকালের মধ্যে দশরথের তন্দ্রা ভগ্ন হইল; গভীর দুঃখে

পড়িয়া লোকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে; হৃদয়ে অমানিশির তুল্য শোক, নৈরাশ্য বা অনুশোচনার ঘোর অন্ধকার ঘনীভূত না হইলে সেই জ্ঞান আইসে না। পরিতপ্ত দশরথ আজ সপ্তদিবস উৎকট মৃত্যুযাতনা সহ্য করিয়াছেন, আজ তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মুক্ত হইল; তিনি স্বীয় কর্ম্মফল প্রত্যক্ষ করিলেন। এই কষ্টের জন্য তিনি নিজেই দায়ী, আজ কে যেন তাঁহাকে নিঃশব্দে বুঝাইয়া দিল। তিনি কৌশল্যাকে বলিলেন "আম্রতরুচ্ছেদন করিয়া পলাশ-মূলে জল সেচন করিয়া মূঢ় ব্যক্তি শেষে ফল না পাইলে বিস্মিত হয়, পলাশ ফুল হইতে আম্রফল উদ্গত হয় না; আমিও স্বকর্ম্মের দ্বারা এই বিপদ আনয়ন করিয়াছি, এবং আজ স্পষ্ট দেখিতেছি, আমি যে তরু রোপণ করিয়াছিলাম, এ বিষময় ফল তাহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।" তখন অশ্রুপূরিত চক্ষে গদ্গদ কণ্ঠে ধীরে ধীরে রাজা সেই পূর্ব্বকাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

তখন বর্ষাকাল, বিল ও স্রোতের জল উন্মার্গগতি হইয়াছিল; পক্ষিগণ পক্ষপুট হইতে ঘন ঘন জলবিন্দু বিক্ষেপ পূর্ব্বক পুনশ্চ তাহা গুণ্ঠিত করিয়া স্থিরভাবে বসিয়াছিল; সায়ংকালে ভেকগণের নিনাদ ও মৃদুনীরবিন্দুপতনের শব্দে বনস্থলী মুখরিত হইতেছিল, গিরিনিঃসৃত স্রোতোজল গৈরিকরেণুসংযোগে বিচিত্র বর্ণ ধারণ করিয়া সর্পের ন্যায় বক্রগতিতে প্রবাহিত হইতেছিল। স্নিগ্ধ মেঘ-মালা আকাশের প্রান্তে প্রান্তে বিরাজিত ছিল, সেই অতি সুখকর বর্ষার সায়ংকালে অবিবাহিত যুবক দশরথ ধনুহস্তে সরযূর অরণ্য-বহুল পুলিনে মৃগয়া করিতেছিলেন, প্রস্রবণ হইতে ঋষিপুত্র কুম্ভ

জলে পূর্ণ করিতেছিলেন, হস্তীর নর্দ্দন মনে করিয়া দশরথ সেই শব্দলক্ষ্যে তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ করিলেন। আর্ত্ত নরকণ্ঠের স্বর শুনিয়া ভীত দশরথ যাইয়া এক মর্ম্মবিদারক দৃশ্য দেখিতে পাইলেন; কলসীর জল গড়াইয়া পড়িয়াছে, জটা ধূলিতে ধূসরিত হইয়াছে,—রক্তাক্ত ধূলিময় দেহে শরবিদ্ধ দীন বালক জলে পড়িয়া আছে—"

"পাংশু শোণিতদিগ্ধাঙ্গং শয়ানং শল্যবেধিতম্।
জটাজিনধরং বালং দীনং পতিতমম্ভসি॥"

এই বালক অন্ধ ঋষি মিথুনের জীবনোপায়, তাঁহারা আর্ত্ত-কণ্ঠে শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর শব্দে চমকিয়া উঠিতেছিলেন, এই বুঝি বালক জল লইয়া আসিতেছে। দশরথ যখন সেই ঋষি ও তৎ-পত্নীর সন্নিহিত হইলেন, তখন স্নিগ্ধকণ্ঠে ঋষি বলিলেন, "পুত্র, তুমি বুঝি জলে ক্রীড়া করিতেছিলে, আমরা তোমার জন্য কত ব্যস্ত হইয়াছি,—

"ত্বং গতিস্ত্বগতীনাঞ্চ চক্ষুস্ত্বং হীনচক্ষুষাম্।"

"তুমি গতিহীনের গতি ও চক্ষুহীনের চক্ষু"—তখন ভীত ও রুদ্ধকণ্ঠে রাজা বলিলেন,—

"ক্ষত্রিয়োঽহং দশরথো নাহং পুত্রো মহাত্মনঃ।"

'আমি দশরথ নামক ক্ষত্রিয়, হে মহাত্মন্! আপনার পুত্র নহি।' তৎপরে কিরূপে বালককে হত্যা করিয়াছেন, তাহা আর্ত্তস্বরে বর্ণনা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যখন তাঁহাদের অভিপ্রায় অনুসারে মৃতবালকের নিকট রাজা

তাঁহাদিগকে লইয়া আসিলেন, তখন তাঁহারা যে বিলাপ করিয়াছিলেন, আজ দশরথের মর্ম্মে মর্ম্মে সেই নিদারুণ বিলাপ-গাথা প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। ঋষি অশ্রুচক্ষে পুত্রের দেহ স্পর্শ করিয়া বলিলেন—"পুত্র, আজ আমাকে অভিবাদন করিতেছ না কেন? তুমি কি রাগ করিয়াছ? রাত্রিশেষে আর কাহার প্রিয়কণ্ঠস্বরে শাস্ত্র আবৃত্তি শুনিয়া প্রাণ শীতল করিব? কে সন্ধ্যাবন্দনান্তে অগ্নি জ্বালিয়া আমাকে স্নান করাইবে; কে আর শাকমূল ও ফল দ্বারা আমাদিগকে প্রিয় অতিথির ন্যায় আহার করাইবে? আমি যদি তোমার অপ্রিয় হইয়া থাকি, তবে তোমার এই ধর্ম্মশীলা জননীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর।"

ঋষি ও তাঁহার পত্নী পুত্রের সঙ্গে পুত্রশোকে অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। বহুবৎসর হইল এই কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, আজ পুত্রশোক কি—তাহা বুঝাইতে, সেই কর্ম্মের ফল দশরথের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

কতক্ষণ পরে দশরথের হৃদয়ের ব্যথা বড় বাড়িয়া উঠিল, তিনি কাঁদিতে লাগিলেন, এবং কৌশল্যাকে বলিলেন—"আমাকে স্পর্শ কর, আমি দৃষ্টিহারা হইয়াছি।" তৎপরে প্রলাপের ন্যায় রামের কথা বলিতে লাগিলেন, "একবার যদি রাম আসিয়া আমাকে স্পর্শ করিত, তবে সেই স্পর্শ পরম ঔষধির ন্যায় আমাকে জীবন দান করিত।" আবার বলিলেন,—

"ততস্তু কিং দুঃখতরং যদহং জীবিতক্ষয়ে।
নহি পশ্যামি ধর্ম্মজ্ঞং রামং সত্যপরাক্রমম্।"

ইহা হইতে কষ্টের বিষয় আর কি যে মৃত্যুকালে ধর্ম্মজ্ঞ ও সত্যসন্ধ রামচন্দ্রকে আমি দেখিতে পাইলাম না। রাম চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে ফিরিয়া আসিবেন, পদ্মপত্রনেত্র, সুন্দর-নাসিকা ও শুভকুণ্ডলযুক্ত আমার রামের চারু মুখমণ্ডল যাঁহারা দেখিবেন, তাঁহারা দেবতা, আমি আর দেখিতে পাইলাম না।" অর্দ্ধরাত্রে এইভাবে বিলাপ করিতে করিতে "হা পুত্র" "হা রাম" এই শেষ বাক্য উচ্চারণ করিয়া দশরথ প্রাণত্যাগ করিলেন।

রাত্রি অতীতপ্রায়। তখন রাজপুরীতে বীণা ও মুরজ বাজিয়া উঠিয়াছে, পক্ষিগণ সেই ললিত কোলাহলে যোগদান করিয়াছে। কাঞ্চনকুম্ভে হরিচন্দন-নিষেবিত জল আনীত হইয়া রাজার স্নানার্থ যথাস্থানে স্থাপিত হইয়াছে। বন্দীগণ রাজার স্তুতিগীতি আরম্ভ করিয়াছে। রাজা কোথায়? তিনি অযোধ্যাপুরী ছাড়িয়া গিয়াছেন, তাঁহার ব্যথিত হৃদয় চিরতরে শান্তিলাভ করিয়াছে!

দশরথের বরদান ব্যাপারে স্ত্রৈণতা বিশেষ দৃষ্ট হয় না। তিনি সত্যসন্ধ ছিলেন, সত্য রক্ষা করিতে যাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, কৈকেয়ীর বরযাচ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি রাজার সমস্ত ভালবাসার শেষ হইয়াছিল, তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; তিনি অনায়াসে কৈকেয়ীকে তাড়াইয়া দিয়া রামকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি ঘোর স্ত্রৈণতার অপবাদ স্কন্ধে লইয়া প্রকৃতপক্ষে সত্যেরই সেবা করিয়াছিলেন। তিনি কৈকেয়ীকে "কুলনাশিনী" "নৃশংসা" প্রভৃতি দুই একটি ন্যায়সঙ্গত কটুবাক্য বলিলেও কখনও তাঁহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া অন্যায় অপভাষা

প্রয়োগ করেন নাই। কৈকেয়ীর মাতা স্বীয় স্বামি অশ্বপতির জীবননাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন, সুমন্ত্র প্রসঙ্গক্রমে সেই কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু দশরথ স্বীয় স্ত্রীর মাতৃকুল কিম্বা পিতৃকুল উল্লেখ করিয়া কিম্বা অন্য কোনরূপ অসঙ্গত ভাষায় তাঁহার প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করেন নাই। দশরথের চরিত্রে একটি রাজোচিত মর্য্যাদা দৃষ্ট হয়, তজ্জন্য বাল্মীকি-কথিত তৎসম্বন্ধীয় এই কয়েকটি বিশেষণ আমাদের নিকট অতিবিহিত বলিয়া বোধ হয়—

"স সত্যবাক্য ধর্ম্মাত্মা গাম্ভীর্য্যাৎ সাগরোপমঃ।
আকাশ ইব নিষ্পঙ্কঃ—"

রামচন্দ্র।

বাল্মীকি-অঙ্কিত রামচন্দ্র এক অতি বিশাল চিত্র, তুলসীদাস ও কৃত্তিবাস রামচন্দ্রের শ্যাম-সুন্দর পল্লবস্নিগ্ধ শ্রী রক্ষণ করিয়া, তাঁহার বীরত্ব ও বৈরাগ্যের মহিমা বর্জ্জন করিয়াছেন। কৌশল্যা রামের বনবাসোপলক্ষে বিলাপ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"মহেন্দ্রধ্বজসঙ্কাশঃ ক নু শেতে মহাভুজঃ।
ভুজং পরিঘসঙ্কাসমুপাধায় মহাবলঃ॥"

রামচন্দ্র তাঁহার ইন্দ্রধ্বজ ও পরিঘ তুল্য কঠিন বাহু উপাধান করিয়া কিরূপে শয়ন করিবেন? পুত্রের বাহু পরিঘতুল্য কঠিন বলিতে কৌশল্যা কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই, ভরত শৃঙ্গবের-পুরীতে রামের তৃণশয্যা দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"ইঙ্গুদী-মূলে কঠিন স্থণ্ডিল-ভূমি রামের বাহু-নিষ্পীড়নে মর্দ্দিত হইয়া আছে, আমি তাহা চিনিতে পারিতেছি।" সুতরাং রামচন্দ্রের "নবনী জিনিয়া তনু অতি সুকোমল।" কিম্বা "ফুল-ধনু হাতে রাম বেড়ান কাননে" প্রভৃতি ভাবের বর্ণনা দ্বারা যাঁহারা তাঁহাকে ফুলের অবতাররূপে সৃষ্ট করিয়াছেন তাঁহাদের চিত্রের সঙ্গে মহর্ষি-অঙ্কিত রামের রেখায় রেখায় মিল পড়িবে না।

রামের বিশাল বক্ষ ও স্কন্ধদ্বয়ের সন্ধি-স্থল মাংসল, এজন্য কবি তাঁহাকে "গূঢ়জক্র" উপাধি দিয়াছেন, তিনি—"সমঃ সমবিভক্তাঙ্গঃ" তাঁহার মহাবাহু বৃত্তায়িত, তাহা ঊনষোড়শ বর্ষ বয়সে হরধনু ভঙ্গ

করিবার সামর্থ্য রাখিত। তিনি যেমন মহামূর্ত্তি, তেমনই মহাগুণশালী। তিনি স্বদোষ ও পরদোষবিৎ, আশ্রিতের প্রতিপালক স্বজন ও স্বধর্ম্মের রক্ষয়িতা ও নিত্য সংযমী। তিনি পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল, অথচ ক্রুদ্ধ হইলে দেবগণেরও ভীতিদায়ক হইয়া উঠেন। এই মহদ্‌গুণ সমুচ্চয়ের উপর প্রীতিবিচ্ছুরিত হইয়া তাঁহার চরিত্র অতি মধুর ও কমনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। কেহ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে দুর্ব্বাক্য বলিলে তিনি—"নোত্তরং প্রতিপাদিতি" উত্তর প্রদান করেন না।—

"ন স্মরত্যপকারাণাং শতমপি আত্মবত্তয়া"

উদার স্বভাব হেতু তিনি পরকৃত শত অপকারের কথাও বিস্মৃত হন। তিনি বাগ্মী ও পূর্ব্বভাষী, শীলবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধগণ তাঁহার নিকটে সর্ব্বদা সমুচিত শ্রদ্ধা পাইত। কার্য্যবশতঃ রামচন্দ্র নগরের বাহিরে গেলে,—

"—পুনরাগত্য কুঞ্জরেণ রথেন বা।
পৌরাণ স্বজনবন্নিত্যং কুশলং পরিপৃচ্ছতি॥"

হস্তী বা রথারোহণে ফিরিবার সময় পুরবাসীদিগকে স্বজনবর্গের ন্যায় সাদরে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন।

এই রাজকুমারকে যখন মহারাজ দশরথ যুবরাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন নগরে বিপুল প্রীতি সূচক "হলহলা" শব্দ সমুত্থিত হইল। প্রজাগণ একবাক্যে বলিল, "অমিততেজা রামচন্দ্রের অভিষেকের তুল্য আনন্দ-দায়ক আমাদের আর কিছুই নাই।"

রামচন্দ্র অভিষেক-সংবাদে নিতান্ত হৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাকে একবার কৌশল্যার নিকট প্রফুল্ল মুখে অভিষেকের কথা বলিতে দেখিতে পাই,—পুনরায় দেখিতে পাই, লক্ষ্মণের কণ্ঠ-লগ্ন হইয়া বলিতেছেন,—

"জীবিতঞ্চাপি রাজ্যঞ্চ ত্বদর্থমভিকাময়ে।"

'আমি জীবন ও রাজ্য তোমার জন্যই অভিলষণীয় মনে করি'।

দশরথ কৈকয়ীর ক্রোধাগারে তাঁহার ক্রোধপ্রশমনার্থ ব্যস্ত হইয়া নানা কথার মধ্যে এই একটি কথা বলিয়াছিলেন, "অবধ্যো বধ্যতাং কঃ ?" তোমায় প্রীতি-হেতু কোন্ অবধ্যকে বধ করিতে হইবে ? এই উক্তিটী ভাবী অনর্থের পূর্ব্বভাষ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। প্রকৃতই নির্দ্দোষ ব্যক্তির মৃত্যু তুল্য দণ্ড হইয়াছিল, —সেই শোকাবহ কাহিনী রামায়ণ মহাকাব্যে অশ্রুর অক্ষরে লিখিত আছে।

প্রত্যূষে রামচন্দ্রকে সুমন্ত্র রাজাজ্ঞা জানাইয়া কৈকেয়ীর গৃহে আহ্বান করিয়া আনিলেন। রামচন্দ্র ও সীতা অভিষেক-সংকল্পে রাত্রে উপবাসী ছিলেন। সীতাকে রামচন্দ্র বলিলেন, "আজ আমার অভিষেক, অম্বা কৈকেয়ীর সঙ্গে মিলিত হইয়া রাজা আমার মঙ্গলার্থ যেন কি শুভ অনুষ্ঠান করিবেন, এই জন্ত আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, তুমি প্রিয় সখীকুল পরিবৃতা হইয়া কিছুকাল প্রতীক্ষা কর, আমি শীঘ্র আসিতেছি।"

প্রখরবেগশালী চতুরশ্বযোজিত ব্যাঘ্রচর্ম্মাচ্ছাদিত সুন্দর রথ রামচন্দ্রকে বহিয়া লইয়া চলিল। রাম পথে পথে দেখিলেন, অভি-

ষেকের বিপুল আয়োজন হইতেছে ; গঙ্গা যমুনার সঙ্গম-স্থল হইতে আনীত ঘটপূর্ণ জল, সমুদ্রের মুক্তা, ঔডুম্বর পীঠ, চতুর্দ্দন্ত সিংহ, পাণ্ডুর বৃষ, নানা তীর্থের জল, অলঙ্কৃতা বেশ্যা, বিবিধ মৃগ পক্ষী, ব্যাঘ্রতনু প্রভৃতি বিচিত্র উপকরণসম্ভার অভিষেক-শালায় নীত হই-তেছে। রাজপথবর্ত্তী শত শত গবাক্ষের স্বর্ণজাল ভেদ করিয়া অযোধ্যাবাসিনী পুরনারীগণের কৃষ্ণ চক্ষুতারা তাঁহার উপর নিপতিত হইতেছে। রাজপথ জলসিক্ত ও পুষ্পাকীর্ণ হইয়াছে, এবং যেখানে সেখানে আনন্দোন্মত্ত জনসঙ্ঘ তাঁহারই গুণ কীর্ত্তন করিতেছে। অপূর্ব্ব ধ্বজবতী, দীপবৃক্ষমালিনী, শুভ্র দেবালয়শালিনী অযোধ্যা-পুরী নূতন শ্রী ধারণ করিয়া একখানি সুচিত্রিত আলেখ্যের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

পট্টবস্ত্রপরিহিত, অভিষেকব্রতোজ্জ্বল রাজকুমার আনন্দের একটি পুত্তলিকার ন্যায় পিতৃ-সকাশে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা শুষ্ক মুখে কৈকেয়ীর পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি "রাম" এই শব্দ মাত্র উচ্চারণ করিয়া অধোমুখে কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহার রুদ্ধ কণ্ঠ হইতে আর কথা বাহির হইল না। তাঁহার অশ্রুমলিন লজ্জিত চক্ষু আর রামকে চাহিয়া দেখিতে সাহসী হইল না।

সহসা নিবিড় গহনপন্থায় পদ দ্বারা সর্প স্পর্শ করিলে পথিক যেরূপ চমকিয়া উঠে, রাম পিতার এই অচিন্তিতপূর্ব্ব অবস্থা দর্শনে সেইরূপ ভীত হইলেন। রাজার বিশাল বক্ষ সঘনে কম্পিত করিয়া গভীর নিশ্বাস পতিত হইতেছিল, তাঁহার আকুল নয়ন জলভারে

আচ্ছন্ন হইতেছিল, রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া কৈকেয়ীকে বলিলেন, "দেবি, আমি অজ্ঞাতসারে পিতৃপাদপদ্মে কোন অপরাধ করিয়া থাকিলে,—"ত্বমেবৈনং প্রসাদয়" তুমিই ইঁহাকে আমার প্রতি প্রসন্ন কর। আমি পিতার কোপের ভাজন হইয়া মুহূর্ত্ত-কালও জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা করি না। ইঁহার কোন কায়িক বা মানসিক অসুখ হয় নাই ত? ভরত ও শত্রুঘ্ন দূরে আছেন, তাঁহাদের কিম্বা আমার মাতাদের মধ্যে কাহারও কোন অশুভ ঘটে নাই ত? কিম্বা দেবি, তুমি ত অভিমানভরে এমন কোন কথা বল নাই, যাহাতে তিনি এরূপ আর্ত্ত হইয়াছেন?"

কৈকেয়ী নিশ্চিন্তভাবে বলিলেন—"রাজার কোন ব্যাধি হয় নাই, তিনি কোন দুঃখ প্রাপ্ত হন নাই, ইঁহার মনোগত একটি অভিপ্রায় আছে, তোমার ভয়ে তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না, তুমি প্রিয়, তোমাকে অপ্রিয় কথা বলিতে যাইয়া ইঁহার বাণী নিঃসৃত হইতেছে না—

"প্রিয়ং ত্বামপ্রিয়ং বক্তুং বাণী নাস্য প্রবর্ত্ততে।"

শুভ হউক বা অশুভ হউক, তুমি রাজাদেশ পালন করিবে বলিয়া যদি প্রতিশ্রুত হও, তবেই তাহা বলিতে পারি, অন্যথা নহে।" রাম দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—

"অহো ধিঙ্ নার্হসে দেবি বক্তুং মামীদৃশং বচঃ।
অহং হি বচনাদ্রাজ্ঞঃ পতয়েয়মপি পাবকে।
ভক্ষয়েয়ং বিষং তীক্ষ্ণং মজ্জেয়মপি চার্ণবে॥"

"দেবি, তোমার এরূপ কথা আমাকে বলা উচিত নহে, আমি

রাজার আজ্ঞায় এখনই অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারি, বিষ খাইতে পারি, সমুদ্রে পতিত হইতে পারি।"

"রাজার আজ্ঞা আমাকে জ্ঞাপন কর, আমি তাহা পালন করিব, প্রতিশ্রুত হইলাম, আমার বাক্য ব্যর্থ হইবে না।"

সেই অভিষেক কল্পে উপবাসী, পবিত্র পট্টবস্ত্রপরিহিত তরুণ যুবককে কৈকেয়ী অকুণ্ঠিতচিত্তে বনবাসাজ্ঞা শুনাইলেন, "ভরত এই ধনধান্যশালিনী অযোধ্যার রাজা হইবে। তোমার অভিষেকার্থ আনীত উপকরণে তাহার অভিষেকক্রিয়া সম্পাদিত হইবে, আর তোমাকে অদ্যই চীরবাস ও জটা পরিয়া চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসী হইতে হইবে, রাজা আমাকে এই দুই বর দিয়া প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় পরে তাপিত হইয়াছেন।"

এই মর্ম্মচ্ছেদী মৃত্যুতুল্য বাক্য শুনিয়া রামচন্দ্র মুহূর্ত্তকাল নিশ্চল থাকিয়া অবিকৃতচিত্তে বলিলেন,—

"এবমস্তু গমিষ্যামি বনং বস্তুমহং ত্বিতঃ।
জটাচীরধরো রাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্ ॥"

তাহাই হউক, আমি জটাচীর ধারণ করিয়া রাজাজ্ঞা পালন জন্য বনবাসী হইব। আমি জানিতে ইচ্ছা করি মহারাজ পূর্ব্ববৎ আমাকে আদর করিতেছেন না কেন? দেবি, তুমি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না, আমি তোমার সমক্ষে অঙ্গীকার করিয়া বলিতেছি আমি চীর ও জটাধারী হইয়া বনবাসী হইব, তুমি আমার প্রতি প্রীত হও। আমার মনে একটা মিথ্যা কষ্ট এই হইতেছে, পিতা আমাকে নিজে ভরতের অভিষেকের কথা কেন বলেন নাই; ভরত

চাহিলেই আমি রাজ্য, ধন, প্রাণ, সীতা সকলই দিতে পারি! পিতৃ-আজ্ঞায় রাজ্য তাহাকে দিব, ইহাতে আর কি কথা হইতে পারে? দেবি, তুমি উঁহাকে আশ্বাস প্রদান কর, উনি কেন অধোমুখে মন্দ মন্দ অশ্রু ত্যাগ করিতেছেন! শীঘ্রগতি অশ্বারোহী দূতগণ এখনই ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনিতে প্রেরিত হউক।" এই বাক্যে হৃষ্ট হইয়া কৈকেয়ী তাঁহাকে বনে যাইবার জন্য ত্বরান্বিত করিতে চেষ্টা পাইলেন,—পাছে রামের মত পরিবর্ত্তিত হয়, কিম্বা দশরথের মুখের কথা না শুনিলে রামচন্দ্র না যান এই আশঙ্কা; অশ্বকে যেরূপ কশাঘাতে তাড়াইয়া চালিত করিতে হয়, বনে যাইবার জন্য রামকেও তিনি সেইরূপ তাড়না করিতে লাগিলেন—

"কশয়েব হতো বাজী বনং গন্তুং কৃতত্বরঃ।

"তাহাই হউক, রাম আমি তোমার বিলম্ব অনুমোদন করি না, রাজা তোমাকে লজ্জায় নিজে কিছু বলিতেছেন না, তজ্জন্য তুমি মনে কিছু করিও না।—

"যাবত্ত্বং ন বনং যাতঃ পুরাদস্মাদতিত্বরন্।
পিতা তাবন্ন তে রাম স্নাস্যতে ভোক্ষ্যতেঽপি বা॥"

"যে পর্য্যন্ত তুমি শীঘ্র শীঘ্র ইঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বনে না যাইবে, তাবৎ ইনি স্নান বা ভোজন কিছুই করিবেন না!" এই কথা শুনিয়া হেমভূষিত পর্য্যঙ্ক হইতে মহারাজ দশরথ অজ্ঞান হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। সৌমমূর্ত্তি বিষয়-নিস্পৃহ রামচন্দ্র তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন ও কৈকেয়ীর শঙ্কা-দর্শনে দুঃখিত অথচ দৃঢ় স্বরে বলিলেন,—

"নাহমর্থপরো দেবি লোকমাবস্তুমুৎসহে।
বিদ্ধি মাং ঋষিভিস্তুল্যং বিমলং ধর্ম্মমাস্থিতম্॥"

"দেবি, আমি স্বার্থপর হইয়া পৃথিবীতে বাস করিতে ইচ্ছুক নহি, আমাকে ঋষিদিগের তুল্য বিমল ধর্ম্মাশ্রিত বলিয়া জানিও।" পিতা নাই বা বলিলেন, আমি তোমারই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনে যাইব। মাতা কৌশল্যাকে ও সীতাকে বলিয়া অনুমতি লইতে যে বিলম্ব, সেইটুকু অপেক্ষা কর।" এই বলিয়া সংজ্ঞাহীন পিতা ও কৈকেয়ীর পদবন্দনা করিয়া রামচন্দ্র ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন; চতুরশ্বযোজিত রথ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তিনি সে পথে গেলেন না; উৎকণ্ঠিত পৌরজন সাগ্রহে তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, তিনি তাহাদের দৃষ্টিবহির্ভূত পন্থায় যাইতে লাগিলেন, হেমছত্রধর ও ব্যজনবহ পশ্চাৎ অনুবর্ত্তী হইতেছিল, তাহাদিগকে বিদায় দিলেন; অভিষেক-শালার বিচিত্র সম্ভারের প্রতি একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া চক্ষু প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। সিদ্ধপুরুষের ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডলে কোনরূপ অধীরতা প্রকাশ পাইল না।—

"ধারয়ন্ মনসা দুঃখমিন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্য চ।"

মনের দ্বারা দুঃখ ধারণ করিয়া ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পূর্ব্বক শনৈঃ শনৈঃ মাতৃমন্দিরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

কিন্তু এক হস্ত চন্দনচর্চ্চিত ও অপর হস্ত কুঠারাহত হইলে যাঁহারা তুল্যরূপ বোধ করিতেন, রাম সেরূপ যোগী ছিলেন না। জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার দুঃখ-নিরুদ্ধ

হৃদয়-জাত ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, তিনি কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—

"দেবি নূনং ন জানীষে মহদ্ভয়মুপস্থিতম্।"

'দেবি, তুমি জান না মহদ্ভয় উপস্থিত হইয়াছে।' মাতৃদত্ত উপাদেয় আহার ও মহার্ঘ আসনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "আমাকে মুনির ন্যায় কষায় কন্দফলমূল খাইয়া জীবনধারণ করিতে হইবে, এই খাদ্যে আমার আর প্রয়োজন নাই,—আমি কুশাসনের যোগ্য, এ মহার্ঘ আসনে আমার আর স্থান নাই।" কৈকেয়ীর নিকট রাজার প্রতিশ্রুতি কথা বলিয়া বনবাস যাত্রার জন্য মাতৃপাদপদ্মে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। শোকাকুলা মাতা যখন কাঁদিয়া, বলিতে লাগিলেন "স্ত্রীলোকের প্রধানতম সুখ পতির স্নেহসম্পদ, আমার ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। আমি কৈকেয়ীর লোকজনকর্ত্তৃক সর্ব্বদা নিগৃহীত, কোন পরিচারিকা আমার সেবায় নিযুক্ত হইলে, কৈকেয়ীর পরিজনবর্গ দেখিলে ভীত হয়, বৎস, আমি তোমার মুখের দিকে চাহিয়া সমস্ত সহ্য করিয়াছি। তুমি বনে গেলে আমি কোথায় দাঁড়াইব! দেখ গাভীগুলিও বনে বৎসের অনুগমন করে, আমাকে তোমার সঙ্গে লইয়া যাও।" এই সকল মর্ম্মচ্ছেদী কাতরোক্তি শুনিয়া রাম নানা প্রকারে মাতাকে সান্ত্বনা দান করিতে চেষ্টা পাইলেন; অশ্রুমুখী শোকোন্মাদিনী জননীর নিকট স্বীয় উদ্যত অশ্রু দমন করিয়া বারংবার বনবাসের অনুমতি ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রোধ-স্ফুরিতনেত্রে লক্ষ্মণ এই অন্যায় আদেশপালনের বিরুদ্ধে বহু যুক্তির অবতারণা করিয়া ধনু লইয়া ক্ষিপ্তবৎ—

"হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয্যাসক্তমানসম্!"

"কৈকয়ীতে আসক্ত বৃদ্ধ পিতাকে আমি হত্যা করিব" প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। রামচন্দ্র হস্ত ধরিয়া লক্ষ্মণের ক্রোধ প্রশমনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং পরম সৌম্যভাবে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন,—

"সৌমিত্রে যো অভিষেকার্থে মম সম্ভারসম্ভ্রমঃ।
অভিষেকনিবৃত্তার্থে সোঽস্তু সম্ভারসম্ভ্রমঃ।"

'সৌমিত্রে, আমার অভিষেকের জন্য যে সম্ভার ও আয়োজন হইয়াছে তাহা আমার অভিষেকনিবৃত্তির জন্য হউক।' পিতৃ-ভক্ত বিষয়-নিস্পৃহ কুমারের স্নিগ্ধ কিন্তু অটল সংকল্প এই মহাশোক ও ক্রোধের অভিনয় ক্ষেত্রে এক অসামান্য বৈরাগ্য ও বীরত্বের শ্রী জাগাইয়া দিল; কৌশল্যা বলিলেন, "রাজা তোমার যেমন গুরু, আমিও তেমনই গুরু, আমি তোমাকে বনে যাইতে দিব না, তুমি মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কেমনে বনে যাইবে? লক্ষ্মণ বলিলেন, "কামাসক্ত পিতার আদেশ পালন অধর্ম্ম।" রামচন্দ্র অবিচলিত ভাবে বিনীত স্নেহ-পূরিত-কণ্ঠে মাতাকে বলিলেন, "কণ্ডু ঋষি পিতার আদেশে গোহত্যা করিয়াছিলেন, আমাদের কুলে সগরের পুত্রগণ পিতৃ-আদেশ পালন করিতে যাইয়া নিহত হইয়াছিলেন, পরশুরাম পিতৃ-আদেশে স্বীয় জননী রেণুকার শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন; পিতা প্রত্যক্ষ দেবতা,—তিনি ক্রোধ কাম বা যে কোন প্রবৃত্তির উত্তেজনায় প্রতিশ্রুতি দান করিয়া থাকুন না কেন, আমি তাহার বিচার করিব না, আমি তাহার বিচারক নহি।

আমি তাহা নিশ্চয়ই পালন করিব।" এই বলিয়া রোরুদ্যমানা জননীর নিকট ধর্ম্মোদ্দেশ্যে বনে যাওয়ার অনুমতি বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন! কৌশল্যা রামের আশ্চর্য্য সাধুসংকল্প দর্শনে সান্ত্বনা লাভ করিলেন এবং শত শত আশীষ-বাণী কহিয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে প্রাণপ্রিয় পুত্রকে বনবাসের অনুমতি প্রদান করিলেন।

এইমাত্র সীতার কণ্ঠলগ্ন হইয়া তাঁহার কর্ণে আশার কথা গুঞ্জরন করিয়া আসিয়াছেন, কোন্ মুখে তাঁহাকে এই নিদারুণ কথা শুনাইবেন। রামের অভ্যস্ত দৃঢ়তা শিথিল হইয়া গেল; আর সে সৌম্য অবিকৃত ভাব নাই, তাঁহার মুখশ্রী বিবর্ণ হইল, তাঁহার সুন্দর শ্যাম ললাটে দুশ্চিন্তার রেখা অঙ্কিত হইল। সীতা তাঁহাকে দেখা মাত্রই বুঝিতে পারিলেন, কি যেন অনর্থ ঘটিয়াছে। তিনি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ অভিষেকের মুহূর্ত্তে তোমার মুখ এরূপ নিরানন্দ হইয়াছে কেন?" নানা ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে রামচন্দ্র সীতাকে আসন্ন মহাপরীক্ষার উপযোগিনী করিবার জন্য তাঁহার মহৎ বংশ স্মরণ করাইয়া দিলেন। স্নেহার্দ্র-কণ্ঠে ধর্ম্মশীল পতি কি পবিত্র ও সুন্দর মুখবন্ধ করিয়া কথা আরম্ভ করিলেন—

"কুলে মহতি সম্ভূতে ধর্ম্মজ্ঞে ধর্ম্মচারিণি।"

এই সম্বোধন সহধর্ম্মিণীর প্রাপ্য, ইহা সাধ্বী স্ত্রীর মর্য্যাদাব্যঞ্জক। সীতা বনবাসের কথা শুনিয়াই রামের সঙ্গিনী হইবার দৃঢ় অভি-প্রায় জ্ঞাপন করিলেন, রামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার একটি নাতিক্ষুদ্র বাক্‌যুদ্ধ হইয়া গেল। রামচন্দ্রের কত নিষেধ, কত ভয়প্রদর্শন

অগ্রাহ্য করিয়া যখন বীর-বনিতা অরণ্যচারিণী হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা জানাইলেন, তাঁহাকে সঙ্গে না লইয়া গেলে তিনি আত্মঘাতিনী হইবেন, এই সংকল্প প্রকাশ করিলেন—তখন পরস্পরের প্রতি একান্ত নির্ভরশীল স্নিগ্ধ দম্পতির মিলন কি মধুর হইয়াছিল! সীতার গণ্ডবাহী গলদশ্রু রামের সান্ত্বনাবাক্যে একটি একটি করিয়া নির্ম্মল মুক্তা-বিন্দুর ন্যায় অন্তর্হিত হইয়াছিল, সেই দৃশ্যটি বড় সুন্দর মর্ম্মস্পর্শী। রাম কণ্ঠলগ্না অশ্রু-পূরিতা সুন্দরী সাধ্বী স্ত্রীকে বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া স্নিগ্ধ ও করুণ-কণ্ঠে বলিলেন,—"দেবি, তোমার দুঃখ দেখিয়া আমি স্বর্গও অভিলাষ করি না; আমি তোমাকে রক্ষা করিতে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত নহি; সাক্ষাৎ রুদ্র হইতেও আমার ভয় নাই। তুমি বলিলে—বিবাহের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ বলিয়াছিলেন, তুমি স্বামীর সঙ্গে বনবাসিনী হইবে,—তুমি যদি বনবাসের জন্যই সৃষ্ট হইয়া থাক, তবে আমার তোমাকে ছাড়িয়া যাইবার সাধ্য নাই।" যে লক্ষ্মণ "বধ্যতাং বধ্যতামপি" বলিয়া রাজাকে বাঁধিবার এমন কি হত্যা করিবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক একাকী রামের শত্রুকুল নির্ম্মুল করিবেন বলিয়া এত বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি রামের অটল প্রতিজ্ঞা ও বনগমনোদ্যোগ দেখিয়া কাঁদিয়া বালকের ন্যায় অগ্রজের পদতলে পতিত হইলেন এবং বলিলেন,—

"ঐশ্বর্য্যঞ্চাপি লোকানাং কাময়ে ন ত্বয়া বিনা।"

—'তোমাকে ছাড়া আমি ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যও কামনা করি না' অশ্রুপূর্ণচক্ষু পদতলে পতিত পরম স্নেহাস্পদ লক্ষ্মণকে রামচন্দ্র

সাদরে তুলিয়া উঠাইলেন এবং বনসঙ্গী করিতে স্বীকৃত হইলেন, লক্ষ্মণ পুলকাশ্রু মুছিয়া আনন্দে বনবাস-প্রয়োজনীয় অস্ত্র শস্ত্র বাছিয়া লইয়া প্রস্তুত হইলেন। রামচন্দ্র ভরত কিম্বা কৈকেয়ীর প্রতি কোন বিদ্বেষসূচক বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। সীতার নিকট বলিলেন—

"উভয়ৌ ভরতশত্রুঘ্নৌ প্রাণৈঃ প্রিয়তরৌ মম।"

'ভরত এবং শত্রুঘ্ন উভয়ে আমার প্রাণ হইতে প্রিয়।' কৈকেয়ী এবং অপরাপর মাতাদের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন—

"স্নেহপ্রণয়সম্ভোগৈঃ সমা হি মম মাতরঃ।"

'স্নেহ এবং শুশ্রূষায় আমার প্রতি আমার সকল মাতাই সম-দর্শিনী।' বনবাসকল্পে বিদায়প্রার্থী রামচন্দ্র দশরথের নিকট উপস্থিত হইলেন, মহিষীবৃন্দ-পরিবৃত দশরথ রামের মুখ দেখিয়া চিত্তবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে রামচন্দ্রকে আর একটি দিন থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন—"আমি আজ তোমাকে চক্ষে চক্ষে রাখিয়া তোমার সহিত একত্র আহার করিব" রাজা অনেক অনুনয় করিয়া ইহা বলিলেন। রাম কহিলেন, "অদ্যই বনে যাইব বলিয়া মাতা কৈকেয়ীর নিকট আমি প্রতিশ্রুত, সুতরাং ইহার অন্যথা করিতে পারিব না।" সম্ভ্রম ও বিনয়ের সহিত পুনর্ব্বার বলিলেন, "ব্রহ্মা যেরূপ স্বীয় পুত্রগণকে তপশ্চরণার্থ অনুমতি দিয়াছিলেন, আপনি বীত-শোক হইয়া সেইরূপ আমা-দিগের বনগমনের আদেশ প্রদান করুন।" দশরথের শোকবেগ বৃদ্ধি পাইল, তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। সুমন্ত্র, মহামাত্র সিদ্ধার্থ

এবং গুরুদেব বশিষ্ঠ কৈকেয়ীর সহিত বাক্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইলেন, আত্মীয় সুহৃদ্ ও স্বজনবর্গের উত্তেজিত কণ্ঠ-ধ্বনিতে রাজ-প্রাসাদ আকুলিত হইয়া উঠিল, সেই কোলাহল পরাজিত করিয়া ত্যাগশীল রাজকুমারের অপূর্ব্ব বৈরাগ্য ও ধর্ম্ম-ভাবপূর্ণ কণ্ঠ-ধ্বনি স্বর্গীয় শুভ বাণীর মত শ্রুত হইতে লাগিল। কৃতাঞ্জলি হইয়া রামচন্দ্র বারংবার বলিলেন—

"মা বিমর্শো বসুমতী ভরতায় প্রদীয়তাম্।"

"আপনি দুঃখিত না হইয়া এই রাজ্য ভরতকে প্রদান করুন, সুখ কিম্বা রাজ্য, জীবন, এমন কি স্বর্গও আমি ইচ্ছা করি না, আমি সত্যবদ্ধ, আপনার সত্য পালন করিব। পিতা দেবতাগণ অপেক্ষাও পূজ্য, সেই পিতৃ-দেবতার আজ্ঞা পালনে আমি কোন কষ্টই বোধ করিব না। চতুর্দ্দশ বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া আমি আবার আপনার শ্রীচরণ বন্দনা করিব। মাতৃগণের দিকে চাহিয়া কৃতাঞ্জলি রাজকুমার বলিলেন—

"অজ্ঞানাদ্বা প্রমাদাদ্বা ময়া বো যদি কিঞ্চন।
অপরাদ্ধং তদদ্যাহং সর্বশঃ ক্ষময়ামি বঃ॥"

"আমি ভ্রমবশতঃ কিম্বা অজ্ঞানতাবশতঃ যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তবে অদ্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।" যে দশরথের অন্তঃপুর মুরজ ও বীণায় সুমধুর নিক্কণে মুখরিত হইত, আজ তাহা শোকার্ত্তা রমণীগণের আর্ত্তনাদে পূর্ণ হইল।

তৎপর অযোধ্যায় করুণার এক মহাদৃশ্য। যুগ যুগান্তর চলিয়া গিয়াছে, সেই দৃশ্যের শোক ও কারুণ্য এখনও ফুরায় নাই। ধন্য

বাল্মীকির লেখনী! শত শত বৎসর যাবৎ অযোধ্যাকাণ্ডের পাঠকগণ অশ্রুচক্ষে পড়িতে পড়িতে পংক্তিগুলি ভাল করিয়া দেখিতে পান নাই, আরও শত শত বৎসর এই কাণ্ড পাঠকের অশ্রুতে অভিষিক্ত থাকিবে। ভারতবর্ষের পল্লীতে পল্লীতে রাম-বনবাসের করুণ কথা হৃদয়ের রক্তে লিখিত রহিয়াছে, এ দেশের রাজ-ভক্তি, পুত্রস্নেহ, জননীর সোহাগ, স্ত্রীর প্রেম সকলই সেই অযোধ্যাকাণ্ডের চিরকরুণ স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। যাঁহার মনোহর কেশকলাপের উপর রাজশ্রীব্যঞ্জক মুকুটমণি ঝলসিত হইত, আজ তাঁহার ললাট ব্যাপিয়া জটাভার; যাঁহার অঙ্গ মহার্হ অগুরু ও চন্দনের নির্য্যাসে এবং অঙ্গদাদি বহুমূল্য ভূষণে সজ্জিত থাকিত—আজ সত্যের উন্মাদ রাজকুমার কঠোর বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া ভূষণাদি দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক মলদিগ্ধাঙ্গে বনে চলিলেন; কোথায় সেই চর্ম্মাচ্ছাদন-শোভি রত্নপ্রান্ত আস্তরণযুক্ত হেম পর্য্যঙ্ক! বনের ইঙ্গুদীমূল ও তৃণ-কণ্টকপূর্ণ গিরিগহ্বরে তাঁহার শয্যা হইবে, বন্য হস্তীর ন্যায় ধূলি-লুণ্ঠিত দেহে তিনি প্রাতঃকালে জাগিয়া কষায় বন্য ফলের সন্ধানে বহির্গত হইবেন! যাঁহার সূক্ষ্ম পরিধেয়ের জন্য শিল্পী ও তন্তুবায়-গণ দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া বিবিধ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইত, আজ তিনি কৌপীন ও চীর-পরিহিত। রাজকুমারদ্বয় ও রাজবধূ যখন ভিখারীর বেশে এই ভাবে পথে বাহির হইলেন,—

"আর্ত্তশব্দো মহান্ জজ্ঞে স্ত্রীণামন্তঃপুরে তদা।"

তখন অন্তঃপুরে মহা আর্ত্ত শব্দ উত্থিত হইল। রাজমহিষীগণ বিবৎসা ধেনুর ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং প্রজামণ্ডলীর

মধ্যে গভীর পরিতাপসূচক হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। সেই মর্ম্মবিদারক শব্দে উন্মত্ত হইয়া বৃদ্ধ দশরথ রাজা ও দেবী কৌশল্যা নগ্নপদে ধূলিলুণ্ঠিত পরিধেয়প্রান্ত সংবরণ না করিয়া রামকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক রাজপথে দৌড়িয়া যাইতে লাগিলেন, রাজাধিরাজ দশরথের ও রাজমহিষীর এই অবস্থা দর্শনে প্রজাগণ আকুল হইয়া উঠিল। রামচন্দ্র বলিলেন, "সুমন্ত্র, তুমি শীঘ্র রথ চালাইয়া লইয়া যাও, আমি এই দৃশ্য দেখিতে পারিতেছি না।" প্রজাগণ সুমন্ত্রকে বিনয় করিয়া বলিতে লাগিল,—

"সংযচ্ছ বাজিনাং রশ্মীন্ সূত যাহি শনৈঃ শনৈঃ।
মুখং দ্রক্ষ্যাম রামস্য দুর্দর্শন্নো ভবিষ্যতি॥"

"হে সারথি, তুমি অশ্বগণের মুখরশ্মি সংযত করিয়া ধীরে ধীরে চালাও, আমরা রামচন্দ্রের মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া লই, অতঃপর ইঁহার দর্শন আর আমাদের সুলভ হইবে না।" রাম স্নেহার্দ্র-কণ্ঠে প্রজাদিগকে বলিলেন—

"যা প্রীতির্বহুমানশ্চ ময্যযোধ্যানিবাসিনাম্।
মৎপ্রিয়ার্থং বিশেষেণ ভরতে সা বিধীয়তাম্॥

"অযোধ্যাবাসিগণ! তোমাদের আমার প্রতি যে বহুসম্মান ও প্রীতি, তাহা আমার প্রিয়ার্থ ভরতে বিশেষরূপে অর্পণ করিও।

অযোধ্যার প্রান্তদেশে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ রথের পার্শ্বে একত্র হইয়া বলিলেন, "আমরা এই হংসশুভ্র কেশযুক্ত মস্তক ভূলুণ্ঠিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, রাম তুমি আমাদিগকে সঙ্গে

লইয়া যাও।” রামচন্দ্র রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সম্মাননা করিলেন।

গোমতী পার হইয়া রামচন্দ্র স্যন্দিকা নদী উত্তীর্ণ হইলেন,—অযোধ্যার তরুরাজি শ্যামাভ আকাশের প্রান্তে নীল মেঘের ন্যায় অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল, তখন রাম একটিবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে সেই চিরস্নেহজড়িত জন্মভূমির প্রতি দৃষ্টি করিয়া গদ্গদ কণ্ঠে সুমন্ত্রকে বলিলেন—“সরযুর পুষ্পিত বনে আবার কবে ফিরিয়া আসিব ?”

দেশ পর্য্যটনে মনের ভার লঘু হয়। তাঁহারা রথারোহণ পূর্ব্বক অনেক স্থান উত্তীর্ণ হইলেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যরাশি নগর ও পল্লীতে লোকভয়ে কুণ্ঠিত হইয়া থাকে। মানুষ বনলক্ষ্মীকে প্রকৃতির গৃহছাড়া করিয়া দেয়। যেখানে মনুষ্যবসতি নাই, সেখানকার প্রতি ফুল ও পল্লবে যেন বনলক্ষ্মীর কোমল মুখশ্রীর আভা পড়িয়া মায়ের মত স্নিগ্ধ অভিনন্দনে ব্যথিতের ব্যথা ভুলাইয়া দেয়। রামচন্দ্র গঙ্গাতীরে আসিয়া প্রফুল্ল হইলেন। বিশাল নদীর ফেনপুঞ্জ কোথায়ও শুভ্র হাস্যাকারে পরিণত, কোথায়ও সপ্ততন্ত্রী বীণার নিক্কণে নর্ত্তকীর নৃত্যের ন্যায় গঙ্গা ঝঙ্কার দিতেছে, কোথায়ও চিক্কণ জললহরী বেণীর ন্যায় গ্রথিত হইয়া উঠিতেছে, অন্যত্র গঙ্গার এই মনোহর মূর্ত্তির সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ;—তরঙ্গাভিঘাতচূর্ণা গঙ্গা উন্মাদিনীর ন্যায় স্খলিত মেঘকুন্তলে ছুটিয়াছেন, কোথায়ও চলোর্ম্মি ঊর্দ্ধপথে উঠিতে উঠিতে স্বপ্নের ন্যায় সহসা চূর্ণ হইয়া পড়িতেছে—কোন স্থানে তীররুহ বৃক্ষপংক্তি গঙ্গাকে মালার ন্যায় ঘিরিয়া রহিয়াছে এবং অন্যত্র নির্ম্মল

বালুকাময় পুলিন একখণ্ড শ্বেতবস্ত্রের ন্যায় বিস্তৃত রহিয়াছে। সহসা এই বিশাল তরঙ্গিণী দেখিয়া রাজকুমারদ্বয় ও সীতা প্রীত-মনে ইঙ্গুদী-তরুচ্ছায়ায় বিশ্রামের উদ্যোগ করিলেন। নিষাদরাজ গুহক নানা দ্রব্যসম্ভার লইয়া সুহৃদুত্তম রামচন্দ্রের প্রতি আতিথ্য প্রদর্শনে ব্যস্ত হইলেন—তিনি বলিলেন,—

"নহি রামাৎ প্রিয়তমো মমাস্তে ভুবি কশ্চন।"

"রাম অপেক্ষা এ জগতে আমার প্রিয়তম কিছুই নাই।" কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মানুসারে প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ, এই বলিয়া রামচন্দ্র আতিথ্য গ্রহণ করিলেন না, রথের অশ্বসমূহের খাদ্য সংগ্রহের জন্য নিষা-দাধিপতিকে অনুরোধ করিয়া তাঁহারা তিনজন শুধু জলপান করিয়া অনাহারে ইঙ্গুদীমূলে তৃণশয্যায় রাত্রি যাপন করিলেন।

পরদিন সুমন্ত্র বিদায় লইবেন। বৃদ্ধ সচিব কাঁদিয়া বলিলেন, "শূন্যরথ লইয়া আমি কোন্ প্রাণে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইব? যখন উন্মত্ত জনসঙ্ঘ শত কণ্ঠে আমাকে প্রশ্ন করিতে থাকিবে, আমি কি বলিয়া তাহাদিগকে বুঝাইব? হে সেবকবৎসল, আমাকে সঙ্গে যাইবার আদেশ করুন। চতুর্দ্দশ বৎসর পরে আমি এই রথে আপনাদিগকে লইয়া সগৌরবে ও আনন্দে অযো-ধ্যায় প্রবেশ করিব।" রাম অশ্রুচক্ষু বৃদ্ধ মন্ত্রীকে নানারূপ প্রবোধ বাক্যে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিলেন, তিনি তাঁহাকে সকাতরে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বলিলেন, "তুমি ফিরিয়া না গেলে মাতা কৈকয়ীর মনে প্রত্যয় হইবে না যে, আমি বনে গিয়াছি।"

সুমন্ত্রের বিদায়কালে রামচন্দ্র যে সকল কথা বলিয়া পাঠাইয়া-

ছিলেন, তাহা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের মর্ম্মচ্ছেদ করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। তিনি বারংবার বলিলেন—

"ইক্ষ্বাকুণাং ত্বয়া তুল্যং সুহৃদং নোপলক্ষয়ে।
যথা দশরথো রাজা মাং ন শোচেৎ তথা কুরু॥"

'ইক্ষ্বাকুদের তোমার তুল্য সুহৃদ্ আর নাই, মহারাজ দশরথ যেন আমার জন্য শোকাকুল না হন, তাহাই করিবে।" লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধস্বরে দশরথের কার্য্যের সমালোচনা করিতে লাগিলেন, রাম সুমন্ত্রকে সাবধান করিয়া দিলেন।—

"বৃদ্ধঃ করুণবেদী চ মৎপ্রবাসাচ্চ দুঃখিতঃ।
সহসা পরুষং শ্রুত্বা ত্যজেদপি হি জীবিতং।
সুমন্ত্র পরুষং তস্মান্ন বাচ্যস্তে মহীপতিঃ॥"

"রাজা বৃদ্ধ, করুণস্বভাব এবং আমার বনবাসব্যথিত, সহসা এই সকল রুক্ষ কথা শুনিলে তিনি শোকে প্রাণত্যাগ করিতে পারেন। সুমন্ত্র, এই সকল রুক্ষ কথা মহারাজের নিকট বলিও না।"

কাঁদিতে কাঁদিতে সুমন্ত্র চলিয়া গেল। এবার ঘোর আরণ্যপথে চিরসুখোচিত রাজকুমারদ্বয় এবং আদরের পল্লবকোমল ছায়ায় পালিত রাজ-বধূ চলিতেছেন। এখনও সীতার পদ্মকোশপ্রভ পাদযুগ্মে অলক্তকরাগ মলিন হয় নাই,তাহাতে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইতে লাগিল; আর রথ নাই, এবার গভীর অরণ্যে রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল। পদাতি, অশ্ব ও কুঞ্জরারোহী সৈন্যগণ যাহারা অগ্রে অগ্রে যাইত, আজ তিনি অন্ধকার রাত্রে বিজন বনে চীরবাস পরিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও সহধর্ম্মিণীর সহিত কোথায় যাইতেছেন?

কৃষ্ণসর্প ও হিংস্র জন্তুসংকুল আরণ্য পথে পথহারা পথিকবেশী অযোধ্যার এই ক্ষুদ্র রাজ-পরিবার কোথায় রজনী যাপন করিবেন? যাঁহার পাদপদ্মের লীলানুপুরশব্দে শান্ত রাজ-অন্তঃপুরী মুখরিত হইত, অদ্য রাত্রে স্খলিত কুন্তলে চকিত পাদক্ষেপে এই গভীর অরণ্যে তিনি কোথায় যাইতেছেন? হিংস্র জন্তুর ভীতিকর ধ্বনি শুনিয়া তিনি রামের বাহু আশ্রয় করিয়া সন্ত্রস্তা হইতেছেন, মহেন্দ্রধ্বজ সদৃশ রামচন্দ্রের বাহুই আজ ইন্দুনিভাননার একমাত্র অবলম্বন। রাত্রি যাপনের জন্য ইঁহারা এক বৃক্ষমূলে আশ্রয় লইলেন; এই ঘোর অরণ্যে প্রথম রাত্রিবাসের কষ্ট দুঃসহ হইল। মনের ক্ষোভে রামচন্দ্র রাত্রি ভরিয়া লক্ষ্মণের নিকট অনেক পরিতাপ প্রকাশ করিলেন, সে সকল কথা তাঁহার অভ্যস্ত উদার ভাবের নহে। প্রশান্তচিত্ত আসামান্য কষ্টে অশান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি বলিলেন, "ভরত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া প্রীত হইবে, সন্দেহ নাই। রাজা অবশ্য অত্যন্ত মনোকষ্ট ভোগ করিতেছেন, কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্ম-ত্যাগ করিয়া কামসেবা করে, তাহাদিগের দশরথ রাজার ন্যায় দুঃখ-প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। আমার অল্পভাগ্যা জননী আজ শোক-সাগরে পতিত হইয়াছেন। এরূপ কোথায়ও কি শুনা যায়, লক্ষ্মণ, যে বিনা অপরাধে প্রমদার বাক্যের বশবর্ত্তী হইয়া কেহ আমার ন্যায় ছন্দানুবর্ত্তী পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? যাহা হউক, এই কঠোর বন্যজীবনে তোমার প্রয়োজন নাই, আমি ও সীতা বনবাসের দণ্ড ভোগ করিব, তুমি অযোধ্যায় ফিরিয়া যাও। নিষ্ঠুর এবং নীচপ্রকৃতি কৈকেয়ী হয়ত আমার মাতাকে বিষ প্রদান

করিয়া হত্যা করিবেন, তুমি গৃহে যাইয়া আমার মাতাকে রক্ষা কর। তুমি মনে করিও না, অযোধ্যা কিম্বা সমস্ত পৃথিবী আমি বাহুবলে অধিকার করিতে না পারি, শুধু অধর্ম্ম ও পরলোকের ভয়ে আমি নিজের অভিষেক সম্পাদন করি নাই।" এইরূপ বহু বিলাপ করিয়া সেই সমীরচঞ্চল বিটপি-পত্রের কম্পন-মুখর দুর্জ্ঞেয় গভীর অরণ্য প্রদেশে, ভূলুণ্ঠিতা অনশন-কৃশা লবঙ্গলতাপ্রতিমা সীতার দুরবস্থা ও স্বীয় জীবনের ভাবী দুর্গতি কল্পনা করিয়া চির-সুখোচিত রাজকুমার সাশ্রুনেত্রে ও ক্ষুব্ধচিত্তে মৌনভাবে সারা রাত্রি বসিয়া কাটাইলেন,—

"অশ্রুপূর্ণমুখো দীনো নিশি তুষ্ণীমুপাবিশৎ।"

এই প্রথম রজনীর মহাক্লেশের পর বনবাস ক্রমে অভ্যস্ত হইয়া গেল। চিত্রকূট পর্ব্বতের সানুদেশে অপর্য্যাপ্ত পুষ্পভারসমৃদ্ধ অরণ্যানী দেখিয়া ইঁহারা চমৎকৃত হইলেন। বন-দর্শন-বিস্মিতা প্রকৃতি-সুন্দরী সীতা হরিৎছদ বনতরুরাজি দেখিয়া বনোন্মাদিনী হইয়া পড়িলেন,—কুঞ্চিত ও নিবিড় বেণী পৃষ্ঠদেশে লম্বিত করিয়া স্মিতমুখী রামচন্দ্রকে হস্ত ধরিয়া লইয়া গিয়া রক্তবর্ণ অশোক পুষ্পচয়নে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এ দিকে চিত্রকূটের একপার্শ্বে অগ্নিশিখার ন্যায় গৈরিক রেণুপেত এক শৃঙ্গশৈল গগন চুম্বন করিয়াছে—অপর দিকে ক্ষয়তাগ্রস্ত গুহাপূর্ণ নিবিড় রাজ্যের দুর্জ্ঞেয় শোভা-সম্পদ,—কোথায়ও বা বহু-কন্দর-পার্শ্ববর্ত্তী বহু শৈলমালা গগনাবলম্বিত হইয়া রহিয়াছে, সূর্য্যাংশু সম্পর্কে ধাতু গাত্র শৈলের কোন অংশ চূর্ণ রজতখণ্ডের ন্যায় ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শন

করিতেছে,—কোথায়ও বা কোবিদার ও লোধ্র বৃক্ষ পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের একখানি চিত্র-পটের সৃষ্টি করিতেছে,—কোথায়ও বা ভূর্জ্জবৃক্ষ অবনমিত পত্রে বেপথুমতী রমণীর নম্রতা প্রদর্শন করিতেছে—এই সমস্ত নানা বিচিত্র বর্ণের সমাবেশে,—নানা উদ্ভিদ সম্পদে, কন্দরনিঃসৃত খরবেগা স্রোতস্বিনীর গদ্গদনাদী তরঙ্গের অভিঘাতে—পুষ্প ও লতিকা আভরণের বিচিত্রতায় চিত্রকূট পর্ব্বত উষ্ণদেশসুলভ প্রকৃতির শোভা ও বিলাসসম্ভার একত্র পরিব্যক্ত করিয়া বসুধার ভিত্তি স্বরূপ যেন সহসা বসুধাতল হইতে সমুত্থিত হইয়াছে—

"ভিত্ত্বেব বসুধাং ভাতি চিত্রকূটঃ সমুত্থিতঃ।"

এই চিত্রকূটের কণ্ঠে নির্ম্মল মুক্তার কণ্ঠীর ন্যায় মন্দাকিনী প্রবাহিত। সহসা এই উদার অদৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রাকৃতিক সমৃদ্ধির সন্নিহিত হইয়া রামচন্দ্র উচ্ছ্বাস সহকারে বলিয়া উঠিলেন—

"রাজ্যনাশ ও সুহৃদ্বিরহ আজ আমার দৃষ্টির বাধা জন্মাইতেছে না,—এই মহা সৌন্দর্য্য আমি সম্যক্‌রূপে উপভোগ করিতে সমর্থ হইতেছি, বনবাস আজ আমার নিকট অতি শুভকর বলিয়া বোধ হইতেছে, ইহার দুই ফলই পরম কাম্য। পিতাকে অসত্য হইতে রক্ষা করিয়াছি এবং ভরতের প্রিয় সাধন করিয়াছি। সীতার সঙ্গে মন্দাকিনীর জলে স্নান করিয়া রামচন্দ্র পদ্ম তুলিয়া বলিলেন,—"এই নদীর স্নিগ্ধ সম্ভাষণ তোমার সখীগণের তুল্য, মন্দাকিনীকে সরযূ বলিয়া মনে করিও।" এই স্থানে দম্পতির দৃশ্য ক্রমশঃ মধুর হইতে মধুরতর হইয়া উঠিয়াছে; কুসুমিত-লতা

আশ্রয়-বৃক্ষকে জড়াইয়া ধরিয়াছে,—রামচন্দ্র বলিলেন, "কি সুন্দর! তুমি পরিশ্রান্ত হইয়া যেরূপ আমাকে আশ্রয় কর, এ যেন সেইরূপ দেখা যাইতেছে।" গজদন্তোৎপাটিত বৃক্ষরাজি দেখিয়া দম্পতি সেই অকাল-শুষ্ক বৃক্ষের প্রতি দুইটি কৃপার কথা বলিয়া গেলেন। শৈলমালা প্রতিশব্দিত করিয়া বন্যকোকিল ডাকিয়া উঠিল, বন্য-ভৃঙ্গ গুঞ্জরণ করিল, তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া শুনিতে শুনিতে চলিলেন। নীলবর্ণ, লোহিতবর্ণ কিম্বা অন্য কোন বর্ণের যে ফুলটী পথে সুন্দর বলিয়া মনে হইল, রামচন্দ্র সপল্লব সেই ফুলটী চয়ন করিয়া সীতার হস্তে প্রদান করিলেন। মনঃশিলার উপর জল-সিক্ত অঙ্গুলী ঘষিয়া তিনি সীতার সীমন্তে সুন্দর তিলক রচনা করিয়া দিলেন। কেশরপুষ্প তুলিয়া তিনি সীতার নিবিড় কর্ণান্তচুম্বী কুন্তলে পরাইয়া দিলেন এবং স্নিগ্ধ আদরে বলিলেন—

"নাযোধ্যায়ৈ ন রাজ্যায় স্পৃহয়েয়ং ত্বয়া সহ।"

'আমি তোমার সঙ্গে বাস করিয়া অযোধ্যার রাজ্যপদ স্পৃহা করিতেছি না।'

চিত্রকূটের মনোহর শৈলমালা পরিবৃত প্রদেশে শাল, তাল ও অশ্বকর্ণ বৃক্ষের পত্র ও কাণ্ড দ্বারা লক্ষ্মণ মনোরম্য পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন। মন্দাকিনীর তরঙ্গাভিঘাত শব্দ সেই স্থানে মন্দীভূত হইয়া শ্রুত হইত, রামচন্দ্র সেই বন্যবাটিকায় ভ্রাতা ও পত্নীর সঙ্গে বাস করিয়া সমস্ত কষ্ট বিস্মৃত হইলেন। এই সময় মহতী সৈন্যমালা ও আত্মীয়-সুহৃদ্বর্গ পরিবৃত হইয়া ভরত তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে আসিল। লক্ষ্মণ শালবৃক্ষের শাখা হইতে

ভরতের চিরপরিচিত কোবিদার-ধ্বজাঙ্কিত-পতাকাপরিবেষ্টী অযোধ্যার বিশাল সৈন্যসজ্ঘ দর্শনে মনে করিয়াছিলেন—ভরত তাঁহাদিগের বিনাশ কল্পে অগ্রসর হইয়াছেন। এই ধারণায় উত্তেজিত হইয়া তিনি ভরতকে নিধন করিবার সংকল্প জানাইয়া রামচন্দ্রকে যুদ্ধার্থ উদ্যত হইতে উদ্বোধন করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন—"ভরত যদি সত্য সত্যই সৈন্য লইয়া এস্থলে আসিয়া থাকেন, তবেই বা আমাদের যুদ্ধের উদ্যোগ করিবার প্রয়োজন কি? পিতৃসত্য পালন করিতে বনে আসিয়া ভরতকে যুদ্ধে নিহত করিয়া আমরা কি কীর্ত্তিলাভ করিব? ভ্রাতৃরক্ত কলঙ্কিত ঐশ্বর্য্য আমাদিগকে কি পরিতৃপ্তি প্রদান করিবে? বন্ধু কিম্বা সুহৃদ্বর্গের বিনাশ দ্বারা যে দ্রব্য লব্ধ হয়, তাহা বিষাক্ত খাদ্যের ন্যায় আমার পরিহার্য্য। ভ্রাতা ও আত্মীয়বর্গের সুখের নিকট আমার স্বীয় সুখ অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করি।" তৎপর ভরত যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন, তাহা অনুমান করিয়া তিনি বলিলেন,—"আমার প্রাণ হইতে প্রিয়তর কনিষ্ঠ ভাই ভরত আমার বনবাস-সংবাদে শোক-ক্ষিপ্ত হইয়া আমাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে, ভরত আর কোন কারণে আইসে নাই।"

এ দিকে নগ্নপদে জটা ও চীরধারী অনুগত ভৃত্যের ন্যায় বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে চিরবৎসল ভরত আসিয়া—

"ভ্রাতুঃ শিষ্যস্য দাসস্য প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি।"

বলিতে বলিতে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া রামের পদতলে পতিত হইলেন। ভরতের মুখ শুষ্ক, লজ্জা ও মনস্তাপে তাঁহার শরীর শীর্ণ ও

বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। রামচন্দ্র অশ্রুপূরিত চক্ষে স্নেহের পুত্তলী ভরতকে ক্রোড়ে লইলেন ও কত স্নিগ্ধ সম্ভাষণে তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক আদর করিতে লাগিলেন। ভরত দেখিলেন সত্যব্রত রামচন্দ্রের দেহ হইতে দিব্য জ্যোতিঃ স্ফুরিত হইতেছে, তিনি স্থণ্ডিল-ভূমিতে আসীন, তথাপি তাঁহাকে সাগরান্ত পৃথিবীর একমাত্র অধিপতির ন্যায় বোধ হইতেছে, তাঁহার দুইটী পদ্মপ্রভ চক্ষু উজ্জ্বল, জটা ও চীর পরিয়া আছেন, তবুও তাঁহাকে পবিত্র যজ্ঞাগ্নির ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। ধর্ম্মচারী ভ্রাতা যেন রাজ্য ত্যাগ করিয়াই প্রকৃত রাজাধিরাজ সাজিয়াছেন। এই দেবপ্রভাব অগ্রজের পদতলে পড়িয়া আর্ত্তা রমণীর ন্যায় ভরত কত স্নেহার্দ্র কথা বলিতে বলিতে কাঁদিতে লাগিলেন। এই দুই ত্যাগী মহাপুরুষের সংবাদ আদি-কবির অতুল তুলি-সম্পাতে চির-উদার ও চির-করুণ হইয়া রহিয়াছে। রামচন্দ্র ভরতের মুখে পিতৃবিয়োগের সংবাদ শুনিয়া কিছুকাল অধীর হইয়া পড়িলেন। মন্দাকিনী-তীরে ইঙ্গুদীফলে পিতৃ-পিণ্ড রচিত হইল। রাম সেই পিণ্ড প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় শোকোচ্ছ্বাসে ভূলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি ক্ষণপরেই চিত্তসংযম করিয়া সংসারের অনিত্যতা ও ধর্ম্মের সারবত্তা সম্বন্ধে ভরতকে উপদেশ দিলেন—"মনুষ্যের সুদৃশ্য দেহ জরা-বশীভূত হইয়া শক্তিহীন ও বিরূপ হইয়া পড়ে। পক্ক শস্যের যেরূপ পতনের ভয় নাই, সেইরূপ মনুষ্যেরও মৃত্যুর জন্য নির্ভয়ে প্রতীক্ষা করা উচিত—কারণ উহা অবধারিত। যে প্রমোদরজনী অতীত হইয়াছে, তাহা আর

ফিরিয়া আইসে না, যমুনার যে প্রবাহ সাগরে সম্মিলিত হইয়াছে, তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না, সেইরূপ আয়ুর যে অংশ ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা আর প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে না। যখন জীবিত ব্যক্তির মৃত্যুকালই আসন্ন ও অনিশ্চিত, তখন মৃতের জন্য অনুতাপ না করিয়া নিজের জন্য অনুতাপ করাই বিধেয়। ক্রমে দেহ লোলিত ও শিরোরুহ পক্কতা প্রাপ্ত হইবে, জরাগ্রস্ত জীবের কি প্রভাব অবশিষ্ট থাকে? যেরূপ সমুদ্রে পতিত দৈববশে মিলিত কাষ্ঠদ্বয় পুনরায় স্রোত-বেগে ব্যবধান হইয়া পড়ে, সেইরূপ স্ত্রী পুত্র ও জ্ঞাতিদের সঙ্গে মিলন দৈবাধীন, কখন চিরবিরহ উপস্থিত হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। আমাদের পিতা নশ্বর মনুষ্য-দেহ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গিয়াছেন, তাঁহার জন্য শোক করা বৃথা। ধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তৎপ্রতিপালনই এখন আমার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।"—মুহূর্ত্ত মধ্যে গভীর শোক জয় করিয়া শ্রীরামচন্দ্র আত্মস্থ হইলেন; ভরত বিস্ময় সহকারে বলিয়া উঠিলেন—

"কোহি স্যাদীদৃশো লোকে যাদৃশস্ত্বমরিন্দম।
ন ত্বাং প্রব্যথয়েৎ দুঃখং প্রীতির্বা ন প্রহর্ষয়েৎ॥"

"তোমার ন্যায় এই জগতে আর কোন্ ব্যক্তি আছেন, সুখে তোমার হর্ষ নাই, দুঃখে তুমি ব্যথিত হও না।"

ভরত তাঁহাকে ফিরাইয়া লইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টিত হইলেন। বশিষ্ঠ, জাবালী প্রভৃতি কুলপুরোহিতগণ রামকে অযোধ্যায় প্রত্যাগমনের জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন। জাবালী

অনেকগুলি অদ্ভুত তর্ক উপস্থিত করিলেন—"জীবগণ পৃথিবীতে একা আগমন করে এবং এস্থান হইতে একাই অপসৃত হয়, সুতরাং কে কাহার পিতা, কে কাহার মাতা? এই পিতৃত্ব মাতৃত্ব বুদ্ধি উন্মত্ত এবং বুদ্ধিশূন্য লোকেরই হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে শুক্র শোণিত ও বীজই আমাদের পিতা। দশরথ তোমার কেহ নহেন, তুমিও দশরথের কেহ নহ। পিতার জন্য যে শ্রাদ্ধাদি করা হয়, তাহাতে শুধু অন্নাদি নষ্ট হয়, কারণ মৃত ব্যক্তি আহার করিতে পারে না। যদি এক জন ভোজন করিলে অন্যের শরীরে তাহার সঞ্চার হয়, তবে প্রবাসী ব্যক্তির উদ্দেশ্যে অপর কাহাকেও আহার করাইয়া দেখ, উহাতে সেই প্রবাসীর কোন তৃপ্তিই হইবে না। শাস্ত্রাদি শুধু লোক বশীভূত করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব রাম পরলোকসাধনধর্ম্ম নামক কোন পদার্থ নাই, তোমার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হউক। তুমি প্রত্যক্ষের অনুষ্ঠান এবং পরোক্ষের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। এবং অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হও—

"একবেণীধরা হি ত্বা নগরী সংপ্রতীক্ষ্যতে।"

"অযোধ্যা নগরী একবেণীধরা হইয়া তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে।"

শ্রীরামচন্দ্র পিতাকে 'প্রত্যক্ষ দেবতা', 'দেবতার দেবতা' বলিয়া জানিয়াছিলেন। জাবালীর উক্তিতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আপনার বুদ্ধি বেদ-বিরোধিনী, আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণেরা নিষ্কাম হইয়া শুভকার্য্য সাধন করিয়াছেন এবং এখনও

অনেকে অহিংসা, তপ ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারাই প্রকৃত পূজনীয়। আপনি ধর্ম্মভ্রষ্ট নাস্তিক, বিচক্ষণ ব্যক্তিরা নাস্তিকের সহিত সম্ভাষণও করিবেন না। আমার পিতা যে আপনাকে যাজকত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার এই কার্য্যকে অত্যন্ত নিন্দা করি।” বশিষ্ঠ মধ্যে পড়িয়া রামচন্দ্রের ক্রোধ প্রশমন করিয়া দিলেন।

ভরত কোন ক্রমেই রামচন্দ্রের পদচ্ছায়া পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না, তিনি বনবাসী হইবেন এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন, রাম তাঁহাকে অনেক স্নেহানুরোধ করিয়া ফিরিয়া যাইতে বলিলেন; শোকক্লিন্ন ভরত, রাম যাইতে সম্মত না হইলে অনশনে প্রাণত্যাগ করিবেন, এই বলিয়া প্রায়োপবেশন অবলম্বন পূর্ব্বক কুটীরদ্বারে পড়িয়া রহিলেন। ভরতের ক্লেশ রামচন্দ্রের অসহ্য হইল, তিনি স্বীয় পাদুকা ভরতের হস্তে দিয়া তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিলেন। ভরত স্বীয় জটাবদ্ধ-কেশকলাপ-সুশোভন ভ্রাতৃপদরজবাহী পাদুকায় রাজ্য-শাসন নিবেদন করিয়া অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ভরত চলিয়া গেলেন। ভরতের সৈন্য সঙ্গে আগত অশ্ব ও হস্তীর করীষে চিত্রকূটের একপ্রান্ত পূর্ণ হইয়াছিল, উহার দুর্গন্ধ অসহনীয় হইল, এ দিকে অযোধ্যার নিকটবর্ত্তী স্থানে থাকিলে প্রায়ই হয় ত তথাকার লোক গমনাগমন করিবে, এই আশঙ্কায় রামচন্দ্র ভ্রাতা ও পত্নীর সঙ্গে চিত্রকূট পরিত্যাগ পূর্ব্বক শনৈঃ শনৈঃ দক্ষিণাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। ঋষিগণের অনুরোধে রাম

রাক্ষসগণের উপদ্রব নিবারণের ভার গ্রহণ করিলেন; এই উপলক্ষে সীতা রামচন্দ্রকে বলিলেন, "তিনটী কার্য্য পুরুষের বর্জ্জনীয়, মিথ্যা কথা, পরদার এবং অকারণ শক্রতা। তোমার সম্বন্ধে প্রথম দুই দোষের কল্পনাই হইতে পারে না, কিন্তু তুমি রাক্ষসগণের সঙ্গে অকারণ বৈরতায় লিপ্ত হইতেছ বলিয়া আমার আশঙ্কা হইতেছে।" রাম বলিলেন, "ক্ষত হইতে যে ত্রাণ করে সেই 'ক্ষত্রিয়', ঋষিগণ রাক্ষসগণের অত্যাচারে আর্ত্ত হইয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক নিরীহ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে রাক্ষসেরা হত্যা করিয়াছে। তাঁহারা বিপদে পড়িয়া আমার আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছেন, আমিও তাঁহাদিগের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি; এখন রাক্ষসগণের সঙ্গে যুদ্ধ আমার অবশ্যম্ভাবী। আমার যে কোন বিপদই হউক না কেন, আমি রাজ্য এমন কি তোমাকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারি, তথাপি সত্যভ্রষ্ট হইতে পারি না।"

তখন শীতঋতু দেখা দিয়াছে, ইঁহারা নাল-শেষ পদ্ম-লতা ও শীর্ণ-কেশর-কর্ণিকা দেখিতে দেখিতে বন্য উগ্র পিপ্পলী-গন্ধে আমোদিত হইয়া পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় কুটীর রচনা করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

—০—

অযোধ্যাকাণ্ডে রামচন্দ্র অপূর্ব্বরূপে সংযমী, তিনি কচিৎ কোন স্থলে দৌর্ব্বল্যের লেশ প্রদর্শন করিলেও মুহূর্ত্ত মধ্যে আপনাকে আশ্চর্য্যরূপে সংবরণ করিয়া লইয়াছেন।

অযোধ্যাকাণ্ডে বিশ্ব শুদ্ধ সকল ব্যক্তি অধৈর্য্য। কেহ শোকা-

কুল, কেহ ক্রোধোন্মত্ত, কেহ বা রাজ্য-কামুক। শুধু রামচন্দ্র মাত্র এই অধ্যায়ে নিশ্চল কর্ত্তব্যের বিগ্রহ স্বরূপ অকুণ্ঠিত। তাঁহার জন্য জগৎ কুণ্ঠিত, কিন্তু তিনি নিজের জন্য কুণ্ঠিত নহেন। যেখানে বৈষয়িকের সঙ্গে বৈষয়িকের সংঘর্ষ,—কেহ বা সত্যপরায়ণ, কেহ বা অসত্যপরায়ণ,—সেইখানেই রামচন্দ্র ত্যাগ-পরায়ণ। তাঁহার বিষয়ে ঘৃণা ও সত্যে অনুরাগ সর্ব্বত্র আমাদিগের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তাঁহার উজ্জ্বল শ্যাম মূর্ত্তি বিশ্বের নয়নাশ্রুসিক্ত, তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অপরাপরকে অপূর্ব্ব ত্যাগ-স্বীকারে প্রণোদন করিতেছে, অথচ কোন উন্নত গগন-চুম্বী শৈলশৃঙ্গের ন্যায় তাঁহার শোভন চরিত্র সকলের ঊর্দ্ধে অবস্থিত।

কিন্তু পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে রামচন্দ্রের আত্ম-সংযম-শক্তি শিথিল হইয়া পড়িল। তিনি এপর্য্যন্ত লক্ষ্মণাদিকে উপদেশ দিয়া সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, এবার তিনি তাঁহাদের উপদেশার্হ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার লঙ্কা জয় অপেক্ষা অযোধ্যাকাণ্ডের আত্মজয়ের আমরা অধিক পক্ষপাতী।

পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে রামচন্দ্রের বৈরাগ্যের শ্রী কতক পরিমাণে চলিয়া গেলেও তিনি একটুকুও শ্রীহীন হইলেন বলিয়া মনে হয় না, কাব্যশ্রী তাঁহাকে বিশেষরূপে অধিকার করিয়া বসিল! তাঁহার সুধামধুর প্রেমোন্মাদ, পুষ্পিত অনুগোদ প্রদেশের প্রাকৃতিক বিচিত্র ভাবের সঙ্গে ঐকতান বিরহ-গীতি, ঋতুভেদে মাল্যবান্ পর্ব্বতের বিবিধ শোভা সম্পদ দর্শনে অনুরাগী রাজকুমারের উন্মত্ত ভাবাবেশ—এই সকল অধ্যায়ে অফুরন্ত মধুর ভাণ্ডার উন্মুক্ত

করিয়া দিয়াছে। আমরা তাঁহার চিত্ত-সংযমের অভাবে পরিতপ্ত হইব কি সুখী হইব, তাহা মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি নাই। নানা বিচিত্র ভাবে এই সকল অধ্যায়ে তাঁহার চরিত্রের বিকাশ পাইয়াছে। মারীচ রাক্ষস রাবণকে বলিয়াছিল—

"বৃক্ষে বৃক্ষে চ পশ্যামি চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরং।
গৃহীতং ধনুষং রামং পাশহস্তমিবান্তকং॥"

"আমি প্রতি বৃক্ষে বৃক্ষে কৃষ্ণাজিনপরিহিত করাল মৃত্যু সদৃশ ধনুষ্পাণি রামচন্দ্রের মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি।" একদিকে তিনি যেরূপ ভীতি-প্রদ, অপরদিকে তিনি তেমনই সুন্দর—ধনুষ্পাণি রামের বল্কলপরিহিত সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া দর্ভাঙ্কুর রোমন্থন করিতে করিতে আশ্রম-হরিণশাবক চিত্রের পুত্তলীর ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে, কখনও বা তাঁহার বল্কলাগ্র দন্তাগ্রে ধারণ করিয়া স্নেহ-সারে তৎ-পার্শ্ববর্ত্তী হইতেছে এবং যখন বিরহোন্মত্ত রাজকুমার "হে হরিণযূথ, আমার প্রাণপ্রিয়া হরিণাক্ষী কোথায়" এই প্রলাপ বলিতে বলিতে কাতরকণ্ঠে তাঁহাদিগকে সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন তাহারাও যেন সাশ্রুনেত্রে সহসা উত্থিত হইয়া দক্ষিণদিকে মুখ ফিরাইয়া নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দ ভাবে তাহাদের বেদনাতুর মৌন হৃদয়ের ভাব যথাসাধ্য জ্ঞাপন করিয়াছিল।

পঞ্চবটীতে শূর্পনখার নাসাকর্ণচ্ছেদের পরে রামচন্দ্রের সঙ্গে রাক্ষসগণের ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। খরদূষণাদি চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস রামকর্ত্তৃক নিহত হইল। জনস্থানের এই দুর্দ্দশার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাবণ পরিব্রাজক-বেশে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল।

মারীচরাক্ষসের মৃত্যুকালের উক্তি শুনিয়াই রামচন্দ্র রাক্ষসগণের কি একটা অভিসন্ধি আছে, তাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন। পথে লক্ষ্মণকে একাকী আসিতে দেখিয়া তিনি একান্ত ভয়-বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। এই সময় হইতে প্রশান্তচিত্ত রামচন্দ্র ক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার শোকের যথেষ্ট কারণ ছিল। তিনি বনবাস-সংকল্প জানাইলে সাধ্বী—

"অগ্রতস্তে গমিষ্যামি মৃদ্নন্তী কুশকণ্টকান্।"

'কুশকণ্টকে পদচারণ পূর্ব্বক তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব' বলিয়া প্রফুল্লচিত্তে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া ভিখারিণী সাজিয়াছিলেন, অযোধ্যার সুরম্য হর্ম্ম্যরাজির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, এ সকল অট্টালিকার ছায়া অপেক্ষা—

"তব পাদচ্ছায়া বিশিষ্যতে।"

তোমার পাদচ্ছায়াই আমি অধিকতর কামনা করি। নূপুরলীলামুখর পাদক্ষেপে ক্রীড়াশীলা রাজবধূ রামকে ছায়ার ন্যায় অনুগমন করিয়াছেন, মৃগীবৎ ফুল্লনয়না ভীরু বনে ভয় পাইলে স্বীয় ভুজলতা দ্বারা রামচন্দ্রের বাহু আশ্রয় করিতেন। এই ত্রয়োদশ বৎসর চিত্রকূট ও পঞ্চবটীর তরুচ্ছায়ায়, গদ্গদনাদী গোদাবরীর উপকূলে, মন্দাকিনীর সিকতাভূমে,—বন্য কন্দমূল ও কষায় ফল সেবন করিয়া বহু আদরে লালিতা সোহাগিনী রাজবধূ স্বামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া থাকাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ মনে করিয়াছেন। রামচন্দ্রও যখন তাঁহাকে লইয়া আইসেন, তখন বলিয়াছিলেন—"আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে ভয় করি না। সাক্ষাৎ রুদ্র হইতেও আমার ভয়

নাই।" এই অভয় দিয়া তন্বী পদ্মপলাশাক্ষীকে আনিয়াছিলেন, এখন তিনি তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না; সুতরাং রামের ব্যাকুলতার যথেষ্ট কারণ ছিল। তিনি লক্ষ্মণকে একাকী দেখিয়াই সমূহ বিপদাশঙ্কায় মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন, অনভ্যস্ত করুণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "দণ্ডকারণ্যে যিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন, আমার সেই বন-সঙ্গিনী দুঃখসহায়াকে কোথায় রাখিয়া আসিলে? যাহাকে ছাড়া আমি এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারিব না, আমার সেই প্রাণসহায়াকে কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ?"

"যদি মামাশ্রমগতং বৈদেহী নাভিভাষতে।
পুরঃ প্রহসিতা সীতা প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি লক্ষ্মণ॥"

"আমি আশ্রমে উপস্থিত হইলে যদি হাসিয়া সীতা কথা না বলেন, তবে আমি প্রাণ বিসর্জ্জন দিব।" বিপদাশঙ্কায় তিনি কৈকেয়ীর প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিলেন—

"কৈকেয়ী সা সুখিতা ভবিষ্যতি।"

তিনি লক্ষ্মণের সঙ্গে দ্রুতবেগে কুটীরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সমস্ত প্রকৃতি যেন তাঁহার বিপৎপাতের নিবিড় পূর্ব্বভাষ-সূচক ভয়ত্রস্ত মৌনভাব অবলম্বন করিল; চারিদিকে অশুভ লক্ষণ দেখিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল—দেখিলেন হেমন্তে শুষ্ক পদ্মদলের মত সীতাবিহীন শ্রীহীন ম্লান কুটীরখানি দাঁড়াইয়া আছে, উহার সৌন্দর্য্য চলিয়া গিয়াছে; বনদেবতারা যেন পঞ্চবটী হইতে বিদায় লইয়াছেন—যেন সমস্ত বন প্রদেশে সীতা-শূন্যতা বিরাজ করিতেছে; পঞ্চবটীর তরুরাজি অবনত শাখায় যেন কাঁদিতেছে,

পঞ্চবটীর পাখিগণ কাকলী ভুলিয়া গিয়াছে—পঞ্চবটীর তরুশাখায় ফুলগুলি বিশীর্ণ। অজিন ও বল্কলাদি কুটীরের পাশে আবদ্ধ রহিয়াছে—এই অবস্থা দেখিয়া—

"শোকরক্তেক্ষণঃ শ্রীমান্ উন্মত্ত ইব লক্ষ্যতে।"

রামচন্দ্র পাগল হইয়া পড়িলেন, তাঁহার চক্ষু রক্তিমাভ হইয়া উঠিল।

হয় ত গোদাবরীতীরে সীতা পদ্ম খুঁজিতে গিয়াছেন—বনে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। "বনোন্মত্তা চ মৈথিলী" দুই ভাই ব্যাকুলভাবে খুঁজিতে লাগিলেন। গিরি, নদী ও নানা দুর্গম স্থান অন্বেষণ করিলেন। রামচন্দ্র ক্রমেই বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, কদম্ব-কুসুম-প্রিয়ার তত্ত্ব কদম্ব তরু জানিতে পারে, সুতরাং কদম্ব-বৃক্ষকে প্রিয়া-কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; বিল্ববৃক্ষের নিকটে যাইয়া কৃতাঞ্জলি হইলেন; লতাপল্লবপুষ্পাঢ্য বৃহৎ বনস্পতির নিকটে যাইয়া কাতরকণ্ঠে রাম সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। পত্র-পুষ্প-সংচ্ছন্ন অশোকের নিকট শোক-মুক্তির উপদেশ চাহিলেন এবং কর্ণিকার পুষ্পদর্শনে পাগল হইয়া সীতার শ্রীমুখের কর্ণশোভা স্মরণ করিলেন। বনে বনে উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া মৃগযূথের নিকট মৃগশাবাক্ষীর তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন। সহসা ক্ষিপ্তবৎ ছায়া-সীতা দর্শনে ব্যাকুল কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—

"কিং ধাবসি প্রিয়ে নূনং দৃষ্টাসি কমলেক্ষণে।
বৃক্ষৈরাচ্ছাদ্য চাত্মানং কিং মাং ন প্রতিভাষসে॥
তিষ্ঠ তিষ্ঠ বরারোহে ন তেঽস্তি করুণা ময়ি।
নাত্যর্থং হাস্যশীলাসি কিমর্থং মামুপেক্ষসে॥"

"হে প্রিয়ে, তুমি বৃক্ষের অন্তরালে ধাবিত হইতেছ কেন? আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি। তুমি আমার সঙ্গে কথা কহিতেছ না কেন? তুমি ত পূর্ব্বে আমার সঙ্গে এরূপ পরিহাস করিতে না, —তুমি দাঁড়াও,—যেও না, আমার প্রতি তোমার করুণা নাই?"

এই বলিয়া ধ্যানপরায়ণ হইয়া নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ক্ষণেক পরে এই বিমূঢ়তা ঘুচিলে তিনি পুনশ্চ সীতান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। সীতাকে কেহ হরণ করিয়া লইয়াছে, এই আশঙ্কা রামের হয় নাই; তাঁহার ধারণা হইল সীতাকে রাক্ষসগণ খাইয়া ফেলিয়াছে। তাঁহার শুভকুণ্ডলের দীপ্তি-উদ্ভাসিত বক্রান্ত-কেশসংবৃত, সুন্দর পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মুখমণ্ডল, সুচারু নাসিকা ও শুভ ওষ্ঠাধর রাক্ষসের ভয়ে মলিন ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। বেপথু-মতীর পল্লব-কোমল বাহু, সুন্দর অলঙ্কার, সকলই রাক্ষসগণের উদরস্থ হইয়াছে, ভাবিয়া রামচন্দ্র পলকহীন উন্মাদ দৃষ্টিতে আকা-শের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, এবং ক্ষণপরে চলিতে লাগিলেন। একবার দ্রুত একবার মন্থর গতিতে উন্মত্তের ন্যায় নদ নদী ও নির্ঝরণী-মুখরিত গিরিপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে বলিলেন, "লক্ষ্মণ, পদ্মবনাকীর্ণ গোদাবরীর বেলাভূমি, কন্দর ও নির্ঝরপূর্ণ গিরি-প্রদেশ, প্রাণাধিকা সীতার জন্য সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম, তাঁহাকে ত পাইলাম না।" এই বলিয়া মুহূর্ত্তকাল শোকাবেগে বিসংজ্ঞ হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার গভীর ও ঘন নিশ্বাস ধরণীর গাত্রে নিপতিত হইতে লাগিল।

কতকক্ষণ পরে রাম লক্ষ্মণকে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে

অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "আমি অযোধ্যায় আর কোন্ মুখে যাইব, বিদেহরাজ সীতার কথা বলিলে আমি কি কহিব? ভরতকে তুমি গাঢ় আলিঙ্গন্ করিয়া বলিও রাজ্য যেন চিরদিন সে-ই পালন করে। আমার মাতা কৈকেয়ী, সুমিত্রা ও কৌশল্যাকে সমস্ত অবস্থা বলিয়া তাঁহাদিগকে যত্নের সহিত পালন করিও।"

লক্ষ্মণ অনেক উপদেশ-বাক্যে রামের মনে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিলেন। যিনি বলিয়াছিলেন—

"বিদ্ধি মাং ঋষিভিস্তুল্যং বিমলং ধর্ম্মমাশ্রিতং।"—

আমাকে ঋষিতুল্য বিমল ধর্ম্মাশ্রিত বলিয়া জানিও,—যাহাকে রাজ্যনাশ ও সুহৃদ্বিরহ অভিভূত করিতে পারে নাই, পিতা 'রাম' নাম কণ্ঠে বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, এবম্বিধ পিতৃশোকেও যিনি বিহ্বল হন নাই,—আজ তিনি শোকোন্মত্ত। গোদাবরীর নদীকূল তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছেন, কিন্তু আবার লক্ষ্মণকে বলিলেন—

"শীঘ্রং লক্ষ্মণ জানীহি গত্বা গোদাবরীং নদীং।
অপি গোদাবরীং সীতা পদ্মান্যানয়িতুং গতা॥"

"লক্ষ্মণ গোদাবরী নদী শীঘ্র খুঁজিয়া এস, হয় ত সীতা পদ্ম আনিতে সেখানে গিয়াছেন।" লক্ষ্মণ গোদাবরীকূলে সীতার অন্বেষণে পুনঃ প্রবৃত্ত হইলেন, উচ্চৈঃস্বরে চতুর্দ্দিকে ডাকিতে লাগিলেন, নীরব অনুগোদ প্রদেশের বেতসবন হইতে প্রতিধ্বনি তাঁহার কণ্ঠের অনুকরণ করিল। তিনি দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন—

"কং নু সা দেশমাপন্না বৈদেহী ক্লেশনাশিনী।"—

"ক্লেশনাশিনী বৈদেহী কোন্ দেশে গিয়াছেন ?—আমি ত তাঁহার সন্ধান পাইলাম না।"

লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া শোকাকুল রামচন্দ্র নিজে পুনরায় গোদাবরীতীরে উপস্থিত হইলেন।

ক্রমশঃ তাঁহারা দক্ষিণ দিক্ পর্য্যটন করিতে করিতে সীতার অঙ্গভূষণ কুসুমদাম ভূপতিত দেখিতে পাইলেন। তখন অশ্রু-সিক্ত চক্ষে রাম বলিলেন—

"মন্যে সূর্য্যশ্চ বায়ুশ্চ মেদিনী চ যশস্বিনী।
অভিরক্ষন্তি পুষ্পানি প্রকুর্ব্বন্ত মম প্রিয়ম্॥"

পৃথিবী সূর্য্য ও বায়ু এই পুষ্পগুলি রক্ষা করিয়া আমাকে সুখী করিয়াছেন।

কতক দূরে যাইতে যাইতে তাঁহারা দেখিলেন,—মৃত্তিকার উপর রাক্ষসের বৃহৎ পদ-চিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে, পার্শ্বে ভূমি শোণিত-লিপ্ত, তাহাতে সীতার উত্তরীয়স্খলিত কনকবিন্দু পতিত রহিয়াছে, অদূরে এক পুরুষের বিকৃত শব ও বিশীর্ণ কবচ ভূলুণ্ঠিত, তৎপার্শ্বে যুদ্ধরথ চক্রহীন হইয়া পড়িয়া আছে ও তৎসংলগ্ন পতাকা শোণিত ও কর্দ্দমার্দ্র। এই দৃশ্য দেখিয়া রামচন্দ্রের পূর্ব্বাশঙ্কা বদ্ধমূল হইল—রাক্ষসেরা সীতার সুকুমার দেহ খাইয়া ফেলিয়াছে,—তাঁহার দেহ অধিকারের জন্য পরস্পরের মধ্যে ঘোর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়াছিল—এ সকল তাহারই নিদর্শন। রামের চক্ষু ক্রোধে তাম্রবর্ণ হইয়া উঠিল, তাঁহার ওষ্ঠসংপুট স্ফুরমাণ হইতে লাগিল, বল্কলাজিন বন্ধন করিয়া পৃষ্ঠলোলিত জটাভার গুছাইয়া লইলেন

এবং লক্ষ্মণের হস্ত হইতে ধনুর্গ্রহণ পূর্ব্বক ক্ষিপ্তভাবে বলিলেন—"যেরূপ জরা মৃত্যু ও বিধাতার ক্রোধ অনিবার্য্য,—সেইরূপ আজ আমাকেও কেহ প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।" তিনি যাহা কিছু সম্মুখে দেখিবেন, সকলই নষ্ট করিয়া সীতা-বিনাশের প্রতিশোধ তুলিবেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই প্রকার উন্মত্ত ভাব দর্শন করিয়া লক্ষ্মণ অনেক স্নিগ্ধ উপদেশ প্রদান করিলেন,—যেরূপ কথায় প্রাণ জুড়াইয়া যায়, সেইরূপ শান্তি-পূর্ণ উপদেশে রামের চিত্তব্যথা হরণ করিতে চেষ্টা পাইলেন। তাঁহারা আরও দূরে যাইয়া শোণিতার্দ্র গিরিতুল্য অনড় ও বৃহদ্দেহ মুমূর্ষু জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন। রাম উহাকে দেখা মাত্র উন্মত্তভাবে "এই রাক্ষস সীতাকে খাইয়া নিশ্চলভাবে পড়িয়া আছে" বলিয়া তাঁহার বধকল্পে ধনুতে মৃত্যুতুল্য শর আরোপিত করিলেন। জটায়ুর প্রাণ কণ্ঠাগত, তিনি কথা বলিতে যাইয়া সফেন রক্ত বমন করিলেন, এবং অতি দীন ও মৃদু বাক্যে রামকে বলিলেন—"হে আয়ুষ্মন্, তুমি যাঁহাকে বনে বনে মহৌষধির ন্যায় খুঁজিতেছ, সেই দেবী এবং আমার প্রাণ উভয়ই রাবণ কর্তৃক হৃত হইয়াছে। আমি সীতাকে তৎকর্ত্তৃক অপহৃত হইতে দেখিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলাম, এই যে ভগ্নরথচ্ছত্র ও ভগ্ন দণ্ড,—উহা রাবণের। তাহার সারথিও আমার দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে। রাবণকে আমি রথ হইতে নিপাতিত করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়াতে সে খড়্গ দ্বারা আমার পার্শ্বচ্ছেদ করিয়া গিয়াছে।—

"রক্ষসা নিহতং পূর্ব্বং মাং ন হন্তুং ত্বমর্হসি।"

রাবণ আমাকে ইতিপূর্ব্বেই নিহত করিয়াছে, আমাকে পুনর্ব্বার নিধন করিবার চেষ্টা তোমার পক্ষে উচিত নহে।"

এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র স্বীয় বৃহৎ ধনু পরিত্যাগপূর্ব্বক জটায়ুকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, এবং অতি দীনভাবে বলিলেন, "লক্ষ্মণ, দেখ ইঁহার প্রাণ কণ্ঠাগত, জটায়ু মরিতেছেন, আমার ভাগ্যদোষে আমার পিতৃসখা জটায়ু নিহত হইয়াছেন, ইঁহার স্বর বিক্লব হইয়াছে, চক্ষু নিষ্প্রভ হইয়াছে।" জটায়ুর দিকে সজল নেত্রে চাহিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, "যদি শক্তি থাকে, তবে একবার বল, তোমার বধ-কাহিনী ও সীতা-হরণের কথা আমাকে বল। রাবণ আমার স্ত্রীকে কেন হরণ করিল, আমার সঙ্গে তাহার কি শত্রুতা? তাহার রূপ ও শক্তি-সামর্থ্য কি প্রকার? আমার কি অপরাধ পাইয়া সে এই কার্য্য করিয়াছে? সীতার মনোহর মুখশ্রী তখন কিরূপ হইয়া গিয়াছিল,—বিধুমুখী তখন কি বলিয়াছিলেন? হে তাত! রাবণের গৃহ কোথায়? এতগুলি প্রশ্নের উত্তরে জটায়ু এইমাত্র বলিলেন, "আমি দৃষ্টিহারা হইয়াছি, কথা বলিতে পারিতেছি না—দুরাত্মা রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া দক্ষিণ মুখে গিয়াছে, রাবণ বিশ্বশ্রবা মুনির পুত্র এবং কুবেরের ভ্রাতা" এই শেষ কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষুতারা স্থির হইল, জটায়ু প্রাণত্যাগ করিলেন। রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া "বল বল" কহিতেছিলেন, কিন্তু জটায়ু ততক্ষণ প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গগত হইয়াছেন। রামচন্দ্র অশ্রুপূর্ণ চক্ষে বলিলেন, "এই জটায়ু বহু বৎসর দণ্ডকারণ্যে যাপন করিয়া বিশীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু আমার

জন্য আজ ইনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন "কালো হি দুরতিক্রমঃ।" এই পৃথিবীতে সর্ব্বত্রই সাধু ও মহাজনগণ বাস করিতেছেন, নীচ-কুলেও জটায়ুর মত দেবতাদের পূজনীয় চরিত্র ছিল—আমার উপকারের জন্য ইনি স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন—

"মম হেতোরয়ং প্রাণান্ মুমোচ পতগেশ্বরঃ।"

আজ আমার সীতা হরণের কষ্ট নাই, জটায়ুর মৃত্যু-শোক আমার চিত্ত অধিকার করিয়াছে।—

"রাজা দশরথঃ শ্রীমান্ যথা মম মহাযশাঃ।
পূজনীয়শ্চ মান্যশ্চ তথায়ং পতগেশ্বরঃ॥"

আমার নিকট যশস্বী রাজা দশরথ যেমন পূজনীয় ও মান্য, আজ জটায়ুও সেই প্রকার।—লক্ষ্মণ কাষ্ঠ আহরণ কর, আমি এই পবিত্র দেহের সৎকার করিব।"

জটায়ুর দেহের শেষকার্য্য সমাধাপূর্ব্বক প্রথমতঃ পশ্চিমবাহী পন্থা অবলম্বন করিয়া শেষে দুই ভ্রাতা দক্ষিণ উপকূলের সমীপবর্ত্তী হইলেন। ক্রৌঞ্চারণ্য সম্মুখে বিস্তারিত,—অতি দুর্গম অরণ্য। সেই স্থানে এক ভীষণ রাক্ষসীকে শাসন করিয়া বিকৃতমূর্ত্তি কবন্ধের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কবন্ধ রামকর্ত্তৃক নিহত হইল। মৃত্যুকালে সে রামচন্দ্রকে পম্পাতীরবর্ত্তী ঋষ্যমূক পর্ব্বতে সুগ্রীবের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিয়া সীতা উদ্ধারের চেষ্টা করিবার পরামর্শ প্রদান করিল। তৎপর শবরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া উভয় ভ্রাতা দাক্ষিণাপথের বিস্তৃত ভূখণ্ড অতিক্রম করিয়া সারসক্রৌঞ্চনাদিত পম্পাহ্রদের উপকূলে উপনীত হইলেন।

পম্পাতীরবর্ত্তী স্থান বড় রমণীয়; তখন হ্রদকূলস্থ বনরাজির অঙ্গে অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন নব বাস পরাইয়া বসন্ত আগমন করিয়াছে। অদূরে ঋষ্যমূকের কৃষ্ণচ্ছায়া মেঘের সঙ্গে মিশিয়া আছে। গিরি-সানুদেশ হইতে নিম্ন সমতল ভূমি পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ বনরাজির মধ্যে মধ্যে সুদৃশ্য কর্ণিকার-বৃক্ষ পুষ্পসংচ্ছন্ন হইয়া পীতাম্বর-পরিহিত মনুষ্যের ন্যায় দেখা যাইতেছিল। শৈলকন্দর-নিঃসৃত বায়ু পম্পার পদ্মরাজি চুম্বন করিয়া রামচন্দ্রের দেহ স্পর্শ করিল, সেই পদ্মকোষ-নিঃসৃত গন্ধবহ বায়ুর স্পর্শে শ্রীরামচন্দ্র মনে করিলেন—

"নিশ্বাস ইব সীতায়া বাতি বায়ুর্মনোহরঃ।"

সিন্ধুবার ও মাতুলিঙ্গ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, কোবিদার, মল্লিকা ও করবী পুষ্প বায়ুতে দুলিতেছিল; শিখী শিখিনীর সঙ্গে ইতস্ততঃ নৃত্য করিতেছিল; দাত্যূহ করুণকণ্ঠে ডাকিতেছিল। তাম্রবর্ণ পল্লবের অভ্যন্তরলীন রাগরক্ত মধুকর উড়িয়া সহসা কুসুমান্তরে প্রবিষ্ট হইতেছিল। অঙ্কোল, কুরণ্ট ও চূর্ণক বৃক্ষ পম্পা-তীরের প্রহরীর ন্যায় দাঁড়াইয়াছিল। রামচন্দ্র এই প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া সীতার জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন।

"শ্যামা পদ্মপলাশাক্ষী মৃদু-ভাষা চ মে প্রিয়া।"

"তিনি বসন্তাগমে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। ঐ দেখ, লক্ষ্মণ, কারণ্ডব পক্ষী শুভ সলিলে অবগাহন করিয়া. স্বীয় কান্তার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। আজ যদি সীতার সঙ্গে শুভ সম্মিলন হইত, তবে অযোধ্যার ঐশ্বর্য্য কিম্বা স্বর্গও আমি অভিলাষ করিতাম না। এখানে যেরূপ বসন্তাগমে ধরিত্রী হৃষ্টা হইয়াছেন, যে স্থানে

সীতা আছেন, সেখানেও কি বসন্তের এই লীলাভিনয় হইতেছে? তিনি তাহা হইলে যেন কত পরিতাপ পাইতেছেন! এই পুষ্পবহ, হিমশীতল বায়ু, সীতাকে স্মরণ করিয়া আমার নিকট অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বোধ হইতেছে।

"পশ্য লক্ষ্মণ পুষ্পাণি নিষ্ফলানি ভবন্তি মে।"

এই বিশাল পুষ্পসম্ভার আজ আমার নিকট বৃথা। আমি অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলে বিদেহরাজকে কি বলিব? সেই মৃদু-হাসির অন্তরালব্যক্ত চির-হিতৈষিণীর অতুলনীয় কথাগুলি শুনিয়া আর কবে জুড়াইব? লক্ষ্মণ, তুমি ফিরিয়া যাও, আমি সীতা-বিরহে প্রাণধারণ করিতে পারিব না।"

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের এই উন্মত্ততা দর্শনে ভীত হইলেন, তাঁহাকে কত সান্ত্বনা-বাক্য বলিলেন, কিন্তু রামচন্দ্রের ব্যাকুলতার হ্রাস হয় নাই। কখনও মন্দীভূত গতিতে স্খলিতকৌপীন রামচন্দ্র অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন, কখনও গলদশ্রুধারাকুল ঊর্দ্ধসংবদ্ধ দৃষ্টিতে উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ-বাক্য বলিতেছেন। এই অবস্থায় সুগ্রীব-কর্ত্তৃক প্রেরিত হনুমান তাঁহাদিগের নিকট উপনীত হইল। হনু-মানের স্নিগ্ধ অভিনন্দনে লক্ষ্মণ হৃদয়ের আবেগ রোধ করিতে পারিলেন না, হনুমান সুগ্রীবের সংবাদ তাঁহাদিগকে দিয়া বলিয়া-ছিলেন, "আপনাদের আয়ত এবং সুবৃত্ত মহাভুজ পরিঘ তুল্য, আপনারা জগৎ শাসন করিতে পারেন, আপনারা বনচারী কেন? আপনাদের অপূর্ব্ব দেহকান্তি সর্ব্ববিধ ভূষণের যোগ্য, আপনারা ভূষণশূন্য কেন?" লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের ও তাঁহার অবস্থা সংক্ষেপে

কহিয়া সুগ্রীবের আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন,—"যিনি পৃথিবী-পতি, সর্ব্বলোকশরণ্য আমার গুরু ও অগ্রজ—সেই রামচন্দ্র আজ সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছেন, দুঃখ-সাগরে পতিত রামচন্দ্রকে আজ বানরাধিপতি আশ্রয় দিয়া রক্ষা করুন।"—বলিতে বলিতে লক্ষ্মণের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল,—যিনি সর্ব্বদা চিত্তবেগ দমন করিয়াছেন, রামচন্দ্রের কষ্ট দেখিয়া তাঁহার চিত্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল,—লক্ষ্মণ কাঁদিয়া মৌনী হইলেন।

আরণ্যকাণ্ডের উত্তরভাগ ও কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের প্রথমার্দ্ধে ঘটনাবলীর সম্পূর্ণ বিরাম দৃষ্ট হয়। এখানে মহাকাব্য জনসঙ্ঘের ক্রিয়া-কলাপে উদগ্র হইয়া উঠে নাই। গভীর অরণ্যচ্ছায়ায় একমাত্র বীণার সকরুণ ধ্বনির মত রহিয়া রহিয়া রামচন্দ্রের বিরহ-গীতি অনুগোদ প্রদেশ ও পম্পাতীরবর্ত্তী শৈলরাজির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়াছে। এই প্রেমোন্মাদ নববসন্তাগমপ্রফুল্ল প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে; একদিকে বাসন্তী সিন্ধুবার ও কুন্দকুসুম-চুম্বী সুগন্ধ বায়ু, "পদ্মোৎপলঝষাকুলা"—পম্পার নির্ম্মল বারিরাশি, আকাশোর্দ্ধে সহসা-উত্থিত কৃষ্ণ ঋষ্যমূকের নির্জ্জন জঙ্ঘা,—অপর দিকে বিরহী রাজকুমারের সকরুণ বিলাপ, বসন্তঋতুসুলভ হরিৎ-পল্লবোদ্‌গম-দর্শনে বেদনাতুর হৃদয়ের প্রলাপোক্তি যেন একখানি উজ্জ্বল আলেখ্যে মিশিয়া গিয়াছে, রামচন্দ্র তাহার বৈরাগ্য-শ্রীচ্যুত হইয়া কাব্যশ্রীতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছেন। বৈরাগ্যকঠোর রামচরিত্রের এই সকল স্থল-বর্ণিত মৃদুতায় পাঠকের পরিতপ্ত হইবার কোন কারণ নাই, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

রামচন্দ্র শোকাতুর হইয়া এ পর্য্যন্ত শুধু নিজে কষ্ট পাইতেছিলেন, কিন্তু এখন তিনি যে অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা কতদূর যুক্তিযুক্ত ও নীতি-মূলক, তাহার সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হওয়া যায় নাই। বালিবধ বড় জটিল সমস্যা। কবন্ধ মৃত্যুকালে সুগ্রীবের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের উপদেশ দিয়াছিল, সুতরাং রামচন্দ্র সুগ্রীবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া এই বিপৎকালে আপনাকে সহায়বান্ মনে করিলেন। অগ্নি সাক্ষী করিয়া তাঁহারা সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিলেন। সুগ্রীব বলিলেন—

> "যত্ত্বমিচ্ছসি সৌহার্দ্দং বানরেণ ময়া সহ।
> রোচাতে যদি মে সখ্যং বাহুরেষ প্রসারিতঃ॥
> গৃহ্যতাং পাণিনা পাণিঃ——"

"যদি আমার ন্যায় বানরের সঙ্গে আপনি বান্ধবতা করিতে অভিলাষী হইয়া থাকেন, তবে এই আমি বাহু প্রসারণ করিয়া দিতেছি, আপনি হস্তদ্বারা আমার হস্ত ধারণ করুন।" তখন রামচন্দ্র—

> "সংপ্রহৃষ্টমনা হস্তং পীড়য়মাস পাণিনা।"

সন্তোষ সহকারে হস্ত দ্বারা হস্তপীড়ন করিলেন। কিন্তু সুগ্রীব শুধু বন্ধু নহেন, তিনিও তাঁহারই মত বেদনাতুর। তাঁহার স্ত্রী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরণ করিয়া লইয়াছে। সুগ্রীব বালীর ভয়ে দূর দূরান্তর ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, অধুনা মাতঙ্গমুনির আশ্রমসন্নিহিত স্থান বালীর পক্ষে শাপ-নিষিদ্ধ হওয়াতে,—ঋষ্যমূকের সেই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আশ্রয় লইয়া স্ত্রী-বিরহে তিনি অতি কষ্টে জীবন যাপন

করিতেছেন। এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রামচন্দ্র তাঁহার প্রতি একান্ত কৃপাপরবশ হইয়া পড়িলেন; যাঁহার স্ত্রী অপরে লইয়া যায়, তাঁহার তুল্য হতভাগ্য জগতে আর কে? হতভাগ্যের সঙ্গে হতভাগ্যের মৈত্রী শুধু পাণিপীড়নে পর্য্যবসিত হইল না, হৃদয়ের গভীর সহানুভূতি দ্বারা তাহা বদ্ধমূল হইল। সুগ্রীব যখন তাঁহার স্ত্রী-হরণবৃত্তান্ত রামের নিকট বলিতেছিল, তখন সহসা তাঁহার চক্ষে কূলপ্লাবী নদীস্রোতের ন্যায় বাষ্পবেগ উথলিয়া উঠিয়াছিল—কিন্তু সেই অশ্রুবেগ—

"ধারয়ামাস ধৈর্য্যেণ সুগ্রীবো রামসন্নিধৌ।"

রামচন্দ্রের সম্মুখে সুগ্রীব ধৈর্য্যসহকারে ধারণ করিল। এইরূপ সমদুঃখী বন্ধুবরকে পাইয়া যে রামচন্দ্র—

"মুখমশ্রুপরিক্লিন্নং বস্ত্রান্তেন প্রমার্জ্জয়ৎ।"

তাঁহার নিজের অশ্রুমলিন মুখখানি বস্ত্রান্ত দ্বারা মার্জ্জনা করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সীতা ঋষ্যমূক পর্ব্বতে স্বীয় ভূষণাদি ও উত্তরীয় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সুগ্রীব তাহা সযত্নে রাখিয়া দিয়াছিলেন। রাম অবিলম্বে তাহা দেখিতে চাহিলেন, তাহা উপস্থিত করা হইলে তিনি সেই উত্তরীয় ও ভূষণ বক্ষে রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং রাবণের কার্য্য স্মরণ করিয়া—

"নিসশ্বাস ভৃশং সর্পো বিলস্থ ইব রোষিতঃ।"

বিলস্থ সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

সুগ্রীব এবং রামচন্দ্রের মৈত্রী সম্পূর্ণ হইল। বালি-বধে তিনি কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু একজন প্রতাপশালী দেশাধিপতিকে

বৃক্ষান্তরাল হইতে শর নিক্ষেপ করিয়া বধ করা ঠিক ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য কি না, তাহা বিবেচনা করিবার উপযুক্ত মনের অবস্থা তাঁহার ছিল বলিয়া মনে হয় না। বালীকে তিনি বলিয়াছিলেন, "কনিষ্ঠ সহোদরের স্ত্রী কন্যাস্থানীয়া, যে ব্যক্তি তাহাকে হরণ করিতে পারে, মনুর বিধানানুসারে সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয়।" মনূক্ত দণ্ড দেওয়ার কর্ত্তা তুমি কিসে হইলে? এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়াই যেন তিনি বারংবার বলিলেন "এই সশৈলবনকাননশালিনী ধরিত্রী ইক্ষ্বাকু-বংশীয়গণের অধিকৃত; ভরত সেই বংশের রাজা, আমরা তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে পাপের দণ্ড দিতে নিযুক্ত। যাহাকে দণ্ড দিতে হইবে, তাহার সঙ্গে ক্ষত্রিয়োচিত সম্মুখযুদ্ধের প্রয়োজন নাই।" বোধ হয়, তিনি আর্য্যজাতির যুদ্ধ-নিয়ম কিষ্কিন্ধ্যায় পালন করিবার যথেষ্ট কারণ পান নাই। এই কার্য্য তাঁহার পক্ষে কতদুর ন্যায়ানুমোদিত ঠিক বলা যায় না। বালী যে অপরাধে দোষী, সুগ্রীবও সেইরূপ ব্যাপারে একান্তরূপ নিরপরাধ ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। সমুদ্রের তীরে অঙ্গদ বানরমণ্ডলীর নিকট বলিয়াছিলেন—"জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী মাতৃতুল্য, এই সুগ্রাব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জীবদ্দশায়ই তাঁহার পত্নীতে উপগত হইয়াছিল।" অর্থাৎ মায়াবীকে বধ করিবার জন্য যখন বালী ধরণী-গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন তাহার মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যাপুরী ও বালীর সহধর্ম্মিণীকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। সেই কারণেই বোধ হয় বালী এত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং নৈতিক বিচারে সুগ্রীবও বালীর ন্যায় অভিযুক্ত হইতে পারিতেন। এই সকল অবস্থা পর্য্যালোচনা

করিলে রামের কার্য্য সমর্থন করা কঠিন হইয়া পড়ে। তারা যখন বালীকে রামচন্দ্রের কথা উল্লেখ করিয়া দ্বিতীয় দিবস সুগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিল, সে দিন সরল-চেতা বালী বলিয়াছিল—"বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি ধর্ম্মাবতার রামচন্দ্র কেন কপটভাবে তাহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা পাইবেন?" এই বিশ্বাস উপযুক্ত পাত্রে ন্যস্ত হয় নাই। মৃত্যুকালে বালী রামচন্দ্রকে অনেক কটূক্তি করিয়াছিল যথা—"আপনি ধর্ম্মধ্বজ কিন্তু অধার্ম্মিক, তৃণাবৃত কূপের ন্যায় আপনি প্রতারক, মহাত্মা দশরথের পুত্র বলিয়া পরিচয় দেওয়ার যোগ্য নহেন।" বালীর এই সকল উক্তি বাল্মীকি "ধর্ম্ম-সংহত" বলিয়া মুখবন্ধ করিয়া লইয়াছিলেন, সুতরাং রামচন্দ্রের এই কার্য্য মহাকবি নিজে অনুমোদন করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ।

কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে কবন্ধরূপী দনুগন্ধর্ব্ব রামচন্দ্রকে সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্য স্থাপনপূর্ব্বক সীতা উদ্ধারের চেষ্টা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। শোক-বিহ্বল রামচন্দ্র সুগ্রীবের সঙ্গ-লাভ করিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন, এ দিকে আবার সুগ্রীবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর বালী কর্ত্তৃক তাহার স্ত্রীহরণের বৃত্তান্ত অবগত হন। সুগ্রীবকে সমদুঃখী দেখিয়া তাহার প্রতি পক্ষপাতী হইয়া পড়া তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়াছিল। একান্ত শোকাতুর অবস্থায় তাঁহার সমস্ত অবস্থা বিচার করিয়া কার্য্য করিবার সুবিধা ঘটে নাই। কৃত্তিবাস পণ্ডিত এই অধ্যায়ের ভণিতায় লিখিয়াছিলেন—

"কৃত্তিবাস পণ্ডিতের ঘটিল বিষাদ।
বালী বধ করি কেন করিলা প্রমাদ॥"

'প্রমাদ' শব্দের অর্থ 'ভ্রম'। কিন্তু নৈতিক বিচারে এই ব্যাপারের ভ্রম মানিয়া লইলেও ইহা স্বীকার্য্য যে, রামচরিত্রের স্বাভাবিকত্ব এই ঘটনায় বিশেষরূপে রক্ষিত হইয়াছে। সীতাবিরহে রাম যেরূপ শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অন্যথাচরণ করিতে সমর্থ ছিলেন না। এই ঘটনা অন্যরূপ হইলে রামচন্দ্র আদর্শের বেশে সন্নিহিত হইতেন, কিন্তু বাস্তব হইতে সুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়িতেন, এবং কাব্যোক্ত বিষয়ের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইত না! রাম বালীর নিকট আত্ম-সমর্থনার্থ বলিয়াছিলেন, "আমি সুগ্রীবের সঙ্গে অগ্নি সাক্ষী করিয়া মৈত্রী স্থাপন করিয়াছি, তাহার শত্রু আমার শত্রু, আমি সত্য রক্ষা করিতে বাধ্য।" সত্যরক্ষাই রাম-চরিত্রের বিশেষত্ব। এই দিক হইতে রামের চরিত্র আলোচনা করিলে বোধ হয়, তাহা এই ব্যাপারে কতক পরিমাণে সমর্থিত হইতে পারে। *

---

* এই অংশ পাঠ করিয়া ভক্তি-ভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,—"সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচ পরিত্যাগপূর্ব্বক সুস্পষ্ট করিয়া বলা উচিত রামের পক্ষে এই কার্য্য কোনক্রমেই বিহিত হয় নাই। তিনি স্বকার্য্য উদ্ধারের অন্ধ উৎসাহে এই অকার্য্য করিয়াছিলেন। দীনেশ বাবু কুণ্ঠিত হইয়া কথা বলিতেছেন কেন? * * *

মহাত্মাদেরও স্খলন হইয়া থাকে। রামের পক্ষে এই স্খলন এত অভাবনীয় যে এই উন্মত্ততায় তাঁহার সীতার প্রতি প্রীতি অত্যন্ত বিশেষভাবে ব্যক্ত

রামচন্দ্র নিজের পরাক্রমের পরিচয় দিবার জন্য সুগ্রীবের সম্মুখে এক শরে সপ্ততাল ভেদ করেন; কিন্তু যখন মনে হয়, তিনি বৃক্ষান্তরাল হইতে ভ্রাতার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে নিযুক্ত বালীর প্রতি গুপ্তভাবে শর নিক্ষেপ করিয়া তাহার বধ সাধন করেন, তখন সেই সকল পরাক্রম প্রদর্শনের কোন আবশ্যকই ছিল না বলিয়া মনে হয়।

ঋষ্যমূক পর্ব্বতের গুহা ভেদ করিয়া দুর্গম শৈলসঙ্কুল প্রদেশে বালীর রাজ্য রচিত হইয়াছিল। সেই স্থানে সুগ্রীব বিজয়মালা কণ্ঠে পরিয়া সিংহাসনাভিষিক্ত হইলেন। মাল্যবান্ পর্ব্বতের নাতিদূরে চিত্রকাননা কিষ্কিন্ধ্যার গীতিবাদিত্রনির্ঘোষ শ্রুত হইতেছিল;—রামচন্দ্র মাল্যবান্ পর্ব্বতে ভ্রাতার সঙ্গে বাস করিয়া তাহা শুনিতে পাইতেন। কিষ্কিন্ধ্যানগরীতে সাদরে আমন্ত্রিত হইয়াও তিনি পুরীতে প্রবেশ করেন নাই, বনবাস-প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া পর্ব্বতে বাস করিতেছিলেন। রামচন্দ্রের চক্ষে দিনরাত্র নিদ্রা ছিল না, উদিত শশিলেখা দেখিয়া বিধুমুখীকে স্মরণ করিয়া আকুল হইতেন—

করিতেছে। রামের চরিত্রে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, রাম মায়ামুক্ত উদাসীন নহেন, হৃদয়ের প্রাচুর্য্য তাঁহার মধ্যে নিরতিশয়, তৎসত্ত্বেও তিনি ধর্ম্মের শাসন উপেক্ষা করেন নাই। হৃদয়ের প্রবলতা অথচ সংযমের দৃঢ়তা—ভাবে অপরিমেয় অথচ কর্ম্মে নিয়মিত,—ইহাই রাম। বালি-বধের দ্বারাও রামের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের ক্ষণকালীন উন্মত্ত উদ্বেলতা প্রকাশ পাইতেছে—সেই ঝড়ের সময় তাঁহার শৈলকঠিন দুর্লঙ্ঘ্য কূলের দিক্ দেখা যায় নাই, আলোড়িত অতলের ফেনিল আবর্ত্তের দিকটাই উদ্দাম হইয়াছিল। অন্য সময় কঠিন কূলেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে।"

"উদয়াভ্যুদিতং দৃষ্ট্বা শশাঙ্কং স বিশেষতঃ।
আবিবেশ ন তং নিদ্রা নিশাসু শয়নং গতং॥"

"চন্দ্রোদয় দেখিয়া রাত্রিকালে শয্যায় শয়িত হইয়াও তিনি নিদ্রা-সুখ লাভ করিতে পারিতেন না।" সন্ধ্যাকাল যেন চন্দন-চর্চ্চিত হইয়া পর্ব্বতের ঊর্দ্ধে শোভা পাইত। তখন বর্ষা-কাল, অবিরল জলধারা দর্শনে রাম মনে করিতেন, তাঁহার বিরহে সীতা অশ্রুত্যাগ করিতেছেন; নীল মেঘে স্ফুরমাণ বিদ্যুৎ দেখিয়া রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ চিত্র তাঁহার স্মৃতিপথে জাগরিত হইত। মাল্যবান্ গিরিতে বর্ষাঋতুর শুভাগমে দৃশ্যাবলী এক নবশ্রী ধারণ করিল। মেঘমালা অম্বর আবৃত করিয়া ক্বচিৎ ক্বচিৎ গুরু গম্ভীর শব্দ করিত, ক্বচিৎ বিচ্ছিন্ন মেঘপংক্তি-মণ্ডিত শৈলশৃঙ্গ ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় শোভা পাইত, কখনও বিপুল নীলাম্বরে মেঘ-সমূহ যেন বিশ্রাম করিতে করিতে ধীরে ধীরে যাইত। নবশালিধান্যাবৃত বিচিত্র ধরণীর গাত্র কম্বলাবৃত সুন্দরী-দেহের ন্যায় প্রকাশিত হইত। নবাম্বু-ধারাহত-কেশরপদ্মদল পরিত্যাগ করিয়া সকেশর কদম্বপুষ্পের লোভে ভ্রমরগুলি উড়িতেছিল। এই বর্ষা ঋতুতে—

"প্রবাসিনো যান্তি নরাঃ স্বদেশান্।"

প্রবাসী ব্যক্তিরা স্বদেশে গমন করেন। বর্ষায় রামচন্দ্রের সীতা-শোক দ্বিগুণিত হইল; বর্ষার চারিটি মাস তাঁহার নিকট শত বৎসরের ন্যায় দীর্ঘ প্রতীয়মান হইল, সীতাশোকে এই সময় তিনি অতি কষ্টে অতিবাহিত করিলেন—

"চত্বারো বার্ষিকা মাসা গতা বর্ষশতোপমাঃ।"

ক্রমে আকাশ শরদাগমে প্রসন্ন হইয়া উঠিল, বলাকা-সমূহ উড়িয়া গেল, সপ্তচ্ছদ তরুর শাখায় শাখায় পুষ্প বিকাশ পাইল; মেঘ, ময়ূর, হস্তিযূথ এবং প্রস্রবণ সমূহের গদ্গদ ধ্বনি সহসা প্রশান্ত হইল, নীলোৎপলাভ মেঘ-রাজিতে আকাশ আর শ্যামীকৃত হইয়া রহিল না, শুভ শরদাগমে নদীকূলের পুলিনরাশি শনৈঃ শনৈঃ জাগিয়া উঠিল। বাপীতীরে, কাননে এবং নদীতটে রামচন্দ্র ঘুরিয়া মৃগশাবাক্ষীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে ছাড়া কোথাও তিনি সুখ লাভ করিতে পারিলেন না।

"সরাংসি সরিতো বাপীঃ কাননানি বনানি চ।
তাং বিনা মৃগশাবাক্ষীং চরন্নাদ্য সুখং লভে॥"

প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য্যের প্রতি স্তরে স্তরে তিনি বিরহ-কাতরতার অশ্রু ঢালিয়া কত না আক্ষেপ করিলেন। চাতক যেরূপ স্বর্গাধিপের নিকট কাতরকণ্ঠে একবিন্দু জল যাচ্ঞা করে, তিনিও সেইরূপ ব্যগ্র হইয়া সীতা দর্শন কামনা করিতে লাগিলেন,—

"বিহঙ্গ ইব সারঙ্গঃ সলিলং ত্রিদশেশ্বরাৎ।"

সলিলাশয় সমূহে চক্রবাকগণ ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত, তীরভূমিতে অসনা সপ্তপর্ণা কোবিদার পুষ্প প্রস্ফুটিত। রামচন্দ্র বলিলেন— "শরৎ ঋতু উপস্থিত, বর্ষা অতিক্রান্তে নদীসমূহ বিশীর্ণ হইলে সীতা উদ্ধারের উদ্যোগ করিবে বলিয়া সুগ্রীব প্রতিশ্রুত। এখন উদ্যোগের সময় উপস্থিত, কিন্তু তাহার কোন অনুষ্ঠানই দৃষ্ট হইতেছে না। আমি প্রিয়াবিহীন, দুঃখার্ত্ত ও হৃতরাজ্য, সুগ্রীব আমাকে কৃপা করিতেছে না। আমি অনাথ, রাজ্যভ্রষ্ট, প্রবাসী,

দীন প্রার্থী—এই অবস্থায় সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইয়াছি, সুগ্রীব এজন্য আমাকে উপেক্ষা করিতেছে। তাহার কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইয়া মূর্খ এখন গ্রাম্য সুখাসক্ত হইয়া রহিয়াছে। লক্ষ্মণ, তুমি তাহার নিকট যাও, পুনরায় সে কি আমার বাণাগ্নির প্রভায় কিষ্কিন্ধ্যা আলোকিত দেখিতে চায়?”

“ন স সঙ্কুচিতঃ পন্থা যেন বালী হতো গতঃ।”

‘যে পথে বালী হত হইয়া গমন করিয়াছে, সেই পথ সঙ্কুচিত হয় নাই।’ তাহাকে বলিও, সে যেন সময়ানুসারে কার্য্য করে, এবং বালীর পথে যেন তাহাকে না যাইতে হয়।” এই কথা বলিয়া তিনি লক্ষ্মণকে পুনরায় বলিলেন, “সুগ্রীবের প্রীতিকর কথা বলিও, রুক্ষ কথা পরিহার করিও।”

সুগ্রীব যথার্থই গ্রাম্যসুখাসক্ত হইয়া তারা, রুমা ও অপরাপর ললনাবৃন্দপরিবৃত হইয়াছিল, মদবিহ্বলিতাঙ্গ ও পানারুণনেত্রে দিনের ন্যায় রাত্রি এবং রাত্রির ন্যায় দিন যাপন করিতেছিল, এমন কি লক্ষ্মণের ভীষণ জ্যানিনাদ ও বানরগণের কোলাহল প্রথমতঃ তাহার কর্ণপথেই প্রবেশ করে নাই। শেষে অঙ্গদকর্ত্তৃক সমস্ত অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া সুগ্রীব বলিল, “আমি ত কোন কুব্যবহার করি নাই, তবে রামের ভ্রাতা লক্ষ্মণ কেন ক্রোধ করিতেছেন? আমি লক্ষ্মণ কিম্বা রামকে কিছুমাত্র ভয় করি না,—তবে বন্ধু বিচ্ছেদের আশঙ্কা করি মাত্র।—

“সর্ব্বথা সুকরং মিত্রং দুষ্করং প্রতিপালনম্।”

মিত্রত্ব সর্ব্বত্রই সুলভ, মিত্রত্ব রক্ষা করাই কঠিন।” কিন্তু হনুমান

সুগ্রীবকে তাহার অপরাধ বুঝাইয়া দিল—শ্যাম সপ্তচ্ছদ-তরু পুষ্পিত ও পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে, নির্ম্মল আকাশ হইতে বলাকা উড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং শুভ শরৎকাল সমাগত। এই শরৎকালে সুগ্রীব রামের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত, "এখন অপরাধ স্বীকার করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া লক্ষ্মণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন।" সুগ্রীব ক্রমে স্বীয় বিপজ্জনক অবস্থা উপলব্ধি করিলেন, এবং লক্ষ্মণের সম্মুখে স্বীয় কণ্ঠাবলম্বী বিচিত্র ক্রীড়ামাল্য ছেদন করিয়া অন্তঃপুর হইতে বিদায় লইলেন এবং তাহার বিশাল রাজ্যের সমস্ত প্রজামণ্ডলীর মধ্যে এই আদেশ প্রচার করিয়া দিলেন—

"অহোভির্দশভির্যে চ নাগচ্ছন্তি মমাজ্ঞয়া।
হন্তব্যাস্তে দুরাত্মানো রাজশাসনদূষকাঃ॥"

"যে সকল দুরাত্মা আমার আজ্ঞায় দশদিনের মধ্যে রাজধানীতে উপস্থিত না হইবে, সেই সকল শাসন-লঙ্ঘনকারিগণের উপর হত্যার আদেশ প্রদত্ত হইবে।"

সুগ্রীবের দ্বারা নিযুক্ত বানরগণ তন্ন তন্ন করিয়া নানা দিগ্দেশ খুঁজিয়া সীতার কোন সন্ধানই করিতে পারিল না। হনুমান বিশাল সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কায় প্রবেশ-পূর্ব্বক সীতাকে দেখিয়া আসিল।

সীতা-প্রদত্ত অভিজ্ঞান-মণি লইয়া হনুমান প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এই আনন্দ-সংবাদ শোক-বিহ্বল রামচন্দ্রকে মহাকবি সহসা শুনান নাই। হনুমান সীতার সংবাদ লইয়া সমুদ্রকূলে তৎ-প্রত্যাগমন-আশান্বিত বানরমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত হইল।

তাহারা এই তত্ত্ব পাইয়া হৃষ্ট হইল, কিন্তু একবারে তখনই রামচন্দ্রের নিকট গেল না। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া সুগ্রীবের বিশাল মধুবনে প্রবেশ করিল। এই মধুবন কিষ্কিন্ধাধিপের বিশেষ আদেশ ভিন্ন অপ্রবেশ্য ছিল। সেই বনে দধিমুখ নামক একজন প্রহরী নিযুক্ত ছিল। সীতার সংবাদ-লাভে পুলকিত বানরযূথ সেই মধুবনে প্রবেশ করিল। দধিমুখ তাহাদিগকে বারণ করেন, কিন্তু সে আনন্দের সময় তাহারা কেন নিষেধ মান্য করিবে? তাহারা মধু-তরুর ডাল ভাঙ্গিয়া বনের শ্রী নষ্ট করিয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মধুপান করিতে লাগিল। দধিমুখ অগত্যা বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা পাইল। দধিমুখের এই ব্যবহারে তাহাকে একত্র হইয়া তাহারা "ভ্রুকুটিং দর্শয়ন্তি হি" ভ্রুকুটি দেখাইতে লাগিল। তৎপর দধিমুখের বলপ্রয়োগ চেষ্টার ফলে তাহারা জুটিয়া দধিমুখকে বিশেষরূপ প্রহার করিল। দধিমুখ অশ্রুমুখে সুগ্রীবের নিকট নালিশ করিতে গেল। ইত্যবসরে মুক্ত মধুবনে মধু ও যৌবনোন্মত্ত বানরযূথ—

"গায়ন্তি কেচিৎ, প্রণমন্তি কেচিৎ, পঠন্তি কেচিৎ, প্রচরন্তি কেচিৎ।"

কেহ গাহিতে লাগিল, কেহ প্রণাম করিতে লাগিল, কেহ পাঠ করিতে লাগিল, কেহ প্রচার করিতে লাগিল,—এই ভাবে আনন্দোৎসব আরম্ভ করিয়া দিল।

সুগ্রীব রাম লক্ষ্মণের নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। দধিমুখ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বানরাধিপতির পদ ধরিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। তিনি অভয় দিয়া তাঁহার এই শোকের কারণ জিজ্ঞাসা

করাতে সে সমস্ত কথা জ্ঞাপন করিল। সুগ্রীব বলিলেন, "সীতা-ন্বেষণতৎপর বানর সম্প্রদায় নিতান্ত হতাশ ও দুঃখার্ত্ত হইয়া দিন যাপন করিতেছে। তাহাদের অকস্মাৎ এ ভাবান্তর কেন? তাহারা অবশ্য কোন সুখ-সংবাদ পাইয়াছে, হয় ত সীতার খোঁজ করিয়া আসিয়াছে।" সহসা এই সুখের পূর্ব্বাভাষ প্রাপ্ত হইয়া রামচন্দ্র বিন্দুমাত্র অমৃত পানে তৃষাতুর যেরূপ আরও পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তেমনই আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন, সুগ্রী-বোক্ত এই কর্ণসুখ-বাণী তাঁহাকে সীতার সংবাদ প্রাপ্তির জন্য প্রস্তুত করিল।

তৎপরে সুগ্রীবের আজ্ঞাক্রমে বানর সকল সেই স্থানে আগ-মন করিল। হনুমান রামচন্দ্রের নিকট অভিজ্ঞানমণি দিয়া সীতার অবস্থা বর্ণন করিল—

"অধঃশয্যা বিবর্ণাঙ্গী পদ্মিনীব হিমাগমে।"

সীতার মৃত্তিকা-শয্যা, অঙ্গ বিবর্ণ হইয়াছে,—তিনি শীত-ক্লিষ্টা পদ্মিনীর মত হইয়া গিয়াছেন। রাম সেই মণি বক্ষে ধারণ করিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন, সেই মণির স্পর্শে যেন সীতার অঙ্গস্পর্শের সুখ অনুভব করিলেন, সুগ্রীবকে বলিলেন,—"বৎস-দর্শনে যেরূপ ধেনুর পয়ঃ আপনা আপনি ক্ষরিত হয়, এই মণির দর্শনে আমার হৃদয় সেইরূপ স্নেহাতুর হইয়াছে।" পুনঃ পুনঃ হনুমানকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"আমার ভামিনী মধুর কণ্ঠে কি কহিয়াছেন, তাহা বল। রোগী যেরূপ ঔষধে জীবন পায়, সীতার কথায় আমার সেইরূপ হয়—

"দুঃখাৎ দুঃখতরং প্রাপ্য কথং জীবতি জানকী।"

দুঃখ হইতে অধিকতর দুঃখে পড়িয়া সীতা কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন ?"

হনুমানের নিকট সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া রামচন্দ্র বলিলেন, "এই অপূর্ব্ব সুখাবহ সংবাদ প্রদানের প্রতিদানে আমি কি দিব, আমার কি আছে ? আমার একমাত্র আয়ত্ত পুরস্কার তোমাকে আলিঙ্গন দান" এই বলিয়া সাশ্রুনেত্রে রামচন্দ্র তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

কিন্তু হনুমান লঙ্কাপুরীর যে বর্ণনা প্রদান করিল, তাহা আশঙ্কা-জনক। বিশাল লঙ্কাপুরীর চারিদিক ঘিরিয়া বিমানস্পর্শী প্রাচীর,—তাহার চারিটি সুদৃঢ় কপাট, সেইখানে নানা প্রকার যন্ত্র-নির্ম্মিত অস্ত্রাদি রক্ষিত, সেই প্রাচীর পার হইলে ভয়ঙ্কর পরিখা,—তাহাতে নক্র কুম্ভীরাদি বিরাজ করিতেছে। সেই পরিখার উপর চারিটি যন্ত্রনির্ম্মিত সেতু। প্রতিপক্ষীয় সৈন্য সেই সেতুর উপরে আরোহণ করিলে যন্ত্রবলে তাহারা পরিখায় নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। যন্ত্রকৌশলে সেই সকল সেতু ইচ্ছানুসারে উত্তোলিত হইতে পারে,—একটী সেতু অতি বিশাল, তাহার বহু-সংখ্যক সুদৃঢ় ভিত্তি স্বর্ণমণ্ডিত। ত্রিকূট পর্ব্বতের উপরে অবস্থিত লঙ্কাপুরী দেবতাদিগেরও অগম্য। শত শত বিকৃতমুখ, পিঙ্গলকেশ, শেল ও শূলধারী রাক্ষস-সৈন্য সেই বিরাট প্রাচীর ও পরিখার প্রবেশপথ রক্ষা করিতেছে। তৎপর লঙ্কাপুরীর বীরগণের পরাক্রম,—তাহাদের কেহ ঐরাবতের দন্তোৎপাটন করিয়াছে, কেহ

যমপুরী অবরোধ করিয়া যমরাজকে শাসন করিয়াছে। এই বিশাল, দুরধিগম্য লঙ্কাপুরী হইতে সীতাকে উদ্ধার করিতে হইবে। শত্রুপক্ষ তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বাভাষ প্রাপ্ত হইয়া সাবধান হইয়াছে। রামচন্দ্র সুগ্রীবের সমস্ত সৈন্যসহ পার্ব্বত্যপথে সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। পথে দ্রুমরাজি অপর্য্যাপ্ত পুষ্প ও ফলসম্ভারে সমৃদ্ধ। কিন্তু রাম সৈন্যদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন, পরীক্ষা না করিয়া যেন কেহ কোন ফলের আস্বাদ গ্রহণ না করে, কি জানি যদি রাবণের গুপ্তচরগণ পূর্ব্বেই তাহা বিষাক্ত করিয়া থাকে। এই সময়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ত্তৃক অপমানিত বিভীষণ আসিয়া রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহাকে গ্রহণ করা সম্বন্ধে অধিকাংশেরই নানা আশঙ্কাজনিত অমত প্রকাশিত হইল, বিশেষতঃ অজ্ঞাতাচার শত্রুপক্ষীয়কে স্বীয় শিবিরে স্থান দেওয়া সম্বন্ধে সুগ্রীব নিতান্তই প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু রামচন্দ্র কোন ক্রমেই শরণাগতকে প্রত্যাখ্যান করিতে সম্মত হইলেন না।

সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী হইয়া বিশাল সৈন্য অসীম জলরাশির অনন্ত প্রসারিত ক্রীড়া লক্ষ্য করিল। কোথায়ও জলরাশি ফেন-রাজিবিরাজিত ওষ্ঠে কি উৎকট অট্ট হাস্য করিতেছে,—কোথায়ও প্রকাণ্ড উর্ম্মি সহকারে কি উদগ্র নৃত্য করিতেছে! তিমি, তিমিঙ্গিল প্রভৃতি জলাসুরগণের আন্দোলনে উহা গাঢ়রূপে আবর্ত্তিত;—বায়ুদ্বারা উদ্ধৃত হইয়া বিপুল সলিলবক্ষ যেন আকাশকে প্রগাঢ় পরিরম্ভণ করিয়া আছে। অনন্ত সমুদ্রের একমাত্র উপমা আছে, সেই উপমা আকাশ, এবং আকাশের উপমা সমুদ্র।

উভয়েই বায়ু কর্ত্তৃক আলোড়িত হইয়া অনন্তকাল দিগন্তবিশ্রুত শব্দে কি মন্ত্র সাধন করিতেছে, সমুদ্রের ঊর্ম্মি আকাশের মেঘ, সমুদ্রের মুক্তা, আকাশের তারা কে গণিয়া শেষ করিবে? সমুদ্র আকাশে মিশিয়াছে, আকাশ সমুদ্রে মিশিয়াছে। অনন্তকাল হইতে আকাশ ও সমুদ্র দিগ্বধূগণের অঞ্চল আশ্রয় করিয়া যেন পরস্পরের সঙ্গে ঘনীভূত সংস্পর্শ লাভের চেষ্টা করিতেছে। এই বিপুল সমুদ্রের অগাধ তলদেশ নক্র কুম্ভীরাদির নিকেতন। ঊর্ম্মি-গণের সঙ্গে ঝঞ্ঝার অনন্ত ক্ষেত্রে যেন প্রলাপ কথোপকথন চলি-তেছে! মৌন বিস্ময়ে তীরে দাঁড়াইয়া অসংখ্য সুগ্রীবসৈন্য ভীতচক্ষে এই অসীম জলরাশি দর্শন করিতে লাগিল, ইহা উত্তীর্ণ হইবে কিরূপে?

রামচন্দ্র স্বীয় পরিঘসঙ্কাশ দক্ষিণ বাহু তাঁহার উপাধান করি-লেন। যে বাহু একদা সুগন্ধি চন্দন ও বিবিধ অঙ্গরাগে সেবিত হইত, যে বাহু চর্ম্মাচ্ছাদনশোভী সুকোমল শয্যায় থাকিতে অভ্যস্ত,—যাহা অনন্য-সহায়া সীতার বিশ্রস্ত আলাপ ও নিদ্রার চির-বিশ্বস্ত উপাধান, যাহা শত্রুগণের দর্পহারী ও সুহৃদ্‌গণের চির আনন্দ ও অবলম্বন, যাহা সহস্র গোদানের পুণ্যে পবিত্র, সেই মহাবাহু-মূলে শির রক্ষা করিয়া কুশ-শয়নে রামচন্দ্র তিন রাত্রি তিন দিন অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া মৌনভাবে যাপন করেন,—

"অদ্য মে মরণং বাপি তরণং সাগরস্য বা।"

"আজ আমি সমুদ্র উত্তীর্ণ হইব, নতুবা প্রাণ বিসর্জ্জন দিব," এই তপস্যা করিয়া সেতুবন্ধনোদ্দেশ্যে সমুদ্রের উপাসনা করেন।

রামায়ণে বর্ণিত আছে, সমুদ্র এই তপস্যায়ও তাঁহাকে দর্শন না দেওয়াতে রামচন্দ্র ধনু লইয়া সাগরকে শাসন করিতে উদ্যত হন, তাঁহার বিরাট ধনু নিঃসৃত অজস্র শরজালে শঙ্খশুক্তিকাপূর্ণ মগ্নশৈলমালাবৃত মহাসমুদ্র ব্যথিত ও কম্পিত হইয়া উঠিলেন। তখন গঙ্গা, সিন্ধু প্রভৃতি নদীনদপরিবৃত রক্তমাল্যাম্বরধর, কিরীট-চ্ছটাদীপ্ত শুভকুণ্ডল সমুদ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, এবং সেতু-বন্ধের উপায় বলিয়া দেন।

বিশাল সমুদ্রব্যাপী বিশাল সেতু নির্ম্মিত হইল। সেতু বক্র না হয় এই জন্য সৈন্যগণের কেহ সূত্র ধরিয়া, কেহ বা মানদণ্ড ধরিয়া দণ্ডায়মান থাকিত। শিলা ও বৃক্ষ প্রভৃতি উপাদানে নীল অল্প সময়ে এই সেতু গঠন সম্পন্ন করেন। সেতু রচিত হইলে রামচন্দ্র সসৈন্য লঙ্কাপুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া সীতার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। "যে বায়ু তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছ তাহা আমাকে স্পর্শ করিয়া পবিত্র কর; যে চন্দ্র আমি দেখিতেছি, তিনিও হয় ত সেই চন্দ্রের প্রতি অশ্রুসিক্ত দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া উন্মাদিনী হইতেছেন—

"রাত্রিন্দিবং শরীরং মে দহ্যতে মদনাগ্নিনা।"

দিন রাত্র আমি তাঁহার বিরহের অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছি।

"কদা সুচারুদন্তোষ্ঠং তস্যা পদ্মমিবাননম্।
ঈষদুন্নম্য পশ্যামি রসায়নমিবাতুরঃ।"

"কবে তাঁহার সুচারু দন্ত ও অধরযুগ্ম, তাঁহার পদ্ম তুল্য সুন্দর মুখ, ঈষৎ উত্তোলন করিয়া দেখিব,—রোগীর পক্ষে ঔষধের ন্যায় সেই দর্শন আমাকে পরম শান্তি দান করিবে।"

ইহার পরে যুদ্ধ আরব্ধ হইল। রাবণের মন্ত্রিগণ তাঁহাকে নানারূপ পরামর্শ দিল; এক জন বলিল "এক দল রাক্ষসসৈন্য মনুষ্যসৈন্যের বেশ ধারণপূর্ব্বক রামচন্দ্রের নিকট যাইয়া বলুক, "ভরত আপনার সাহায্যার্থে আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন" এই ভাবে তাহারা রামসৈন্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনায়াসে তাহাদিগের বিনাশ সাধন করিতে পারিবে। রাবণ সুগ্রীবকে সসৈন্য রামের পক্ষ হইতে বিচ্যুত করিয়া স্বীয় পক্ষভুক্ত করিবার জন্য অনেক প্রকার প্রলোভন প্রদর্শন করিয়াছিল, বলা বাহুল্য তাহার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। রাবণের নিযুক্ত গুপ্তচরগণ নানারূপ ছদ্মবেশ ধারণপূর্ব্বক রামচন্দ্রের সৈন্যসংখ্যা ও ব্যূহপ্রণালী দেখিয়া যাইতে লাগিল। তাহারা ধৃত হইলে বানরগণ তাহাদিগকে প্রহার করিতে থাকিত, কিন্তু রামচন্দ্র তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতেন। সুগ্রীব ও বিভীষণ তাহাদিগকে হত্যা করিবার পরামর্শ দিতেন—"ইহারা দূত নহে, ইহারা গুপ্ত চর, সুতরাং ইহারা যুদ্ধ-নিয়মানুসারে বধার্হ;" কিন্তু রামচন্দ্র তাহাদের কথা শুনিতেন না, শরণাপন্ন হইলে অমনি তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিতে আদেশ করিতেন। এক জন গুপ্তচর এই ভাবে দণ্ডের জন্য তাঁহার নিকট আনীত হইয়া শরণাপন্ন হইলে তিনি বলিয়াছিলেন—"তুমি আমাদিগের সৈন্যসংখ্যা ভাল করিয়া দেখিয়া যাও, তোমার প্রভু যে উদ্দেশ্যে তোমাকে পাঠাইয়াছেন, আমি তাহার সাহায্য করিতেছি, তুমি আমার ব্যূহসংস্থান ও ছিদ্রাদি যাহা কিছু আছে, দেখিয়া যাও, যদি নিজে সব বুঝিতে না পার, আমার অনুজ্ঞাক্রমে বিভীষণ

তোমাকে সকলই দেখাইবে।" রামচন্দ্র এইরূপ নীতি অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে রাক্ষসগণকে নিহত করিয়াছিলেন। একদিনকার উৎকট যুদ্ধে রাবণ একান্ত হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছিল; রাক্ষসাধিপতি লক্ষ্মণকে বিধ্বস্ত ও রামের বহু সৈন্য নষ্ট করিয়া অবশেষে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক পরাস্ত হইলেন। তাঁহার কিরীট কর্ত্তিত হইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়াছিল, তাঁহার মস্তকোর্দ্ধে ধৃত হেমচ্ছত্র শীর্ণশলাকা হইয়া বিধ্বস্ত হইয়াছিল, রামচন্দ্রের বাণদিগ্ধাঙ্গ হইয়া রাবণ পলাইবার পন্থা প্রাপ্ত হন নাই, এমন সময় রামচন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন,—"রাক্ষস, তুমি আমার বহু সৈন্য নষ্ট করিয়া যুদ্ধে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছ। আমি পরিশ্রান্ত শত্রু পীড়ন করিতে ইচ্ছা করি না, তুমি অদ্য রজনীতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিশ্রাম লাভ কর, কল্য সবল হইয়া আসিয়া পুনরায় যুদ্ধ করিও।"

লক্ষ্মণ রাবণের শেলে মুমূর্ষু,—রামের সৈন্যগণের মধ্যে কেহ সেই হৃদয়ভেদী শেল উঠাইতে সাহসী হইল না,—পাছে সেই চেষ্টায় লক্ষ্মণ প্রাণত্যাগ করেন। রামচন্দ্র গলদশ্রু নেত্রে সেই শেল উঠাইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, এবং মুমূর্ষু লক্ষ্মণকে বক্ষে রাখিয়া তাঁহাকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। সে সময়ে রাবণের শরনিকরে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ ছিন্ন হইয়া যাইতেছিল, ভ্রাতৃবৎসল তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতও করেন নাই।

ইন্দ্রজিৎকর্ত্তৃক মায়া-সীতার কর্ত্তনসংবাদ শুনিয়া রামচন্দ্র সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন সৈন্যগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া পদ্ম ও ইন্দীবর-গন্ধী স্নিগ্ধজলধারা-দ্বারা তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের

চেষ্টা পাইতেছিল, তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া শুনিলেন, বিভীষণ বলিতেছেন "এ সীতা মায়াসীতা,—প্রকৃত নহে, সীতা অশোক বনে সুস্থ আছেন।" রাম ইহা শুনিয়া বলিলেন, "তুমি কি বলিতেছ তাহা আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতেছে না, আমি কিছুই বুঝিলাম না, তুমি আবার বল" শোক-মুহ্যমান রামের এই মৌন অথচ করুণ দৃশ্যটি বড় মর্ম্মস্পর্শী।

ভীষণ যুদ্ধে দুর্দ্দান্ত রাক্ষসগণ একে একে প্রাণত্যাগ করিল। অতিকায়, ত্রিশিরা, নরান্তক, দেবান্তক, মহাপার্শ্ব, মহোদর, অকম্পন, কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি মহারথিগণ সমরাঙ্গণে পতিত হইল,—দুই বার রামচন্দ্র ইন্দ্রজিতের প্রচ্ছন্ন যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু দৈব বলে অব্যাহতি লাভ করেন। এই যুদ্ধে রাক্ষসগণ কোন বিনয়-সূচক কথা রামচন্দ্রকে বলে নাই,—যে সকল ভক্তির কথা কৃত্তিবাস, তুলসীদাস প্রভৃতি কবিকৃত প্রচলিত রামায়ণে স্থান পাইয়াছে, তাহা মূল কাব্যে নাই। ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্র যে কিরূপে ভক্তির তীর্থধামে পরিণত হইতে পারে, অস্ত্রময় রণক্ষেত্র যে অশ্রুময় হইয়া উঠিতে পারে, ইহা কাব্য জগতের এক অসামান্য প্রহেলিকার মত বোধ হয়, তাহা আমরা শুধু বাঙ্গালা ও হিন্দী রামায়ণে পাইতেছি।

"রামরাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব।"

রাম রাবণের যুদ্ধ রাম রাবণের যুদ্ধেরই মত, তাহার অন্য উপমা হইতে পারে না। রাবণের সঙ্গে শেষ যুদ্ধ অতি ভীষণ; উভয়ের করাল জ্যানিঃসৃত বাণজ্যোতিতে দিঙ্মণ্ডল আলোকিত

হইয়া গেল। দিগ্বধূ-গণের মুক্ত কেশকলাপে বাণাগ্নির দীপ্তি প্রতিভাত হইতে লাগিল এবং অদ্ভুত দ্বৈরথ যুদ্ধে ধরিত্রী বারংবার কম্পিতা হইলেন। কোনরূপেই রাবণকে বিনষ্ট করিতে না পারিয়া রামচন্দ্র ক্ষণকাল চিত্র-পটের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। অগস্ত্যঋষির উপদেশানুসারে রামচন্দ্র এই সময় সূর্য্যদেবের স্তব-সূচক মন্ত্র ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—"হে তমোঘ্ন, হে হিমঘ্ন, হে শত্রুঘ্ন, হে জ্যোতিপতি, হে লোকসাক্ষি, হে ব্যোমনাথ," এইরূপ ভাবে মন্ত্র জপ করিতে করিতে সহসা তাঁহার দেহ হইতে নব-শক্তি ও তেজ বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল; এইবার রাবণের আয়ু ফুরাইল।

রাবণ-বধ সম্পাদিত হইল। যে রামচন্দ্র সীতার জন্য এতদিন উন্মত্তপ্রায় ছিলেন, রাবণ বিনাশের পর তাঁহার সেই ব্যাকুলতা যেন সহসা হ্রাস পাইল। তাঁহার অতীত প্রেমোচ্ছ্বাস স্মরণ করিয়া মনে হয় যেন রাবণ-বধের পরে তিনি অশোকবনে ছুটিয়া যাইয়া পূর্ণচন্দ্রনিভাননা সীতাকে দেখিয়া জুড়াইবেন। কিন্তু সহসা একটি শান্ত অচঞ্চল ভাব পরিগ্রহ করিয়া তিনি আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিতেছেন। তিনি রাবণের সৎকারের জন্য বিভীষণকে ত্বরান্বিত হইতে উপদেশ দিলেন, চন্দন ও অগুরু কাষ্ঠে রাক্ষসাধি-পতির দেহ ভস্মীভূত হইল। রাম বিভীষণকে রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের পরে, হনুমানকে অশোক বনে পাঠাইয়া দিলেন—সীতাকে আনিবার জন্য নহে,—তিনি রাবণকে নিহত করিয়া সসৈন্যে কুশলে আছেন, এই সংবাদ

দেওয়ার জন্য। হনুমানকে বলিয়া দিলেন,—রাক্ষসরাজ বিভীষণের অনুমতি লইয়া যেন সে অশোক-বনে প্রবেশ করে।

হনুমান এই শুভ সংবাদ প্রদান করিলে সীতা হর্ষোচ্ছ্বাসে কিছুকাল কোন কথাই বলিতে পারেন নাই। তাঁহার দুইটি পদ্মপলাশসুন্দর চক্ষুতে অশ্রুবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাঁহার শোকপাণ্ডুর উপবাসকৃশ মুখখানি এক নবশ্রীতে শোভিত হইয়াছিল। হনুমান যখন বলিল, "আপনার কি কিছু বলিবার নাই?" তখন দীনহীনা জনকদুহিতা বলিলেন, "পৃথিবীতে এমন কোন ধন রত্ন নাই, যাহা দান করিয়া আমি এই শুভ সংবাদের আনন্দ বুঝাইতে পারি।" যে সকল রাক্ষসী সীতাকে নানারূপ যন্ত্রণা দিয়াছিল, হনুমান তাহাদিগকে নিধন করিতে উদ্যত হইলে সীতা তাহাকে বারণ করিলেন—"ইহাদের প্রভুর নিয়োগে ইহারা আমাকে যে কষ্ট দিয়াছে, তজ্জন্য ইহারা দণ্ডার্হ নহে।" বিদায়-কালে সীতা হনুমানকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন,—তিনি স্বামীর পূর্ণচন্দ্রানন দেখিবার অনুমতি ভিক্ষা করেন। হনুমান সীতার কথা রামচন্দ্রকে বলিলেন—

"সাহি শোকসমাবিষ্টা বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণা।
মৈথিলী বিজয়ং শ্রুত্বা দ্রষ্টুং তামভিকাঙ্ক্ষতি॥"

"শোকাতুরা অশ্রুমুখী সীতা বিজয়বার্ত্তা শুনিয়া আপনাকে দেখিতে অভিলাষ করিতেছেন।" সীতার এই অনুমতি প্রার্থনার কথা শুনিয়া রামচন্দ্র গম্ভীর হইলেন, অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয় উচ্ছলিত হইয়া চক্ষে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল, কিন্তু তিনি তাহা রোধ

করিলেন; মৃত্তিকার দিকে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া রহিলেন, তখন একটি গভীর মর্ম্মবিদারী শ্বাস ভূতলে পতিত হইল। তৎপর বিভীষণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "সীতার কেশকলাপ উত্তমরূপে মার্জ্জনা করিয়া তাহাকে সুন্দর বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া এখানে আনিতে অনুমতি করুন, আমি তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি।"

বিভীষণ স্বয়ং রামের কথা সীতাকে জানাইলে, অশ্রুপূরিত চক্ষে সীতা বলিলেন—

"অস্নাতা দ্রষ্টু মিচ্ছামি ভর্ত্তারং রাক্ষসেশ্বর।"

"আমি যে ভাবে আছি, এইরূপ অস্নাত অবস্থায়ই স্বামীকে দেখিতে ইচ্ছা করি।" কিন্তু বিভীষণ বলিলেন, "রামচন্দ্র যেরূপ অনুজ্ঞা করিয়াছেন, সেইরূপ ভাবে কার্য্য করাই আপনার উচিত।"

তখন জটিল কেশকলাপের বহু দিনান্তে মার্জ্জনা হইল। দিব্যাম্বর পরিধানপূর্ব্বক, সুন্দর ভূষণাদিতে বিভূষিত হইয়া অলোক-সামান্যা শ্রীশালিনী সীতাদেবী শিবিকারোহণ করিয়া চলিলেন। সীতাকে দেখিবার ইচ্ছায় শত শত বানর ও রাক্ষস শিবিকার পার্শ্বে ভিড় করিল। বিভীষণ তাহাদিগকে অজস্র বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন; কিন্তু রামচন্দ্র ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বিভীষণকে বলিলেন, "বিপৎকালে, যুদ্ধে এবং স্বয়ংবরস্থলে পুরাঙ্গনাদের দর্শন দূষণীয় নহে। সীতার ন্যায় বিপদাপন্না ও দুঃস্থা কে আছে? তাহাকে দেখিতে কোন বাধা নাই, সীতাকে শিবিকা ত্যাগ করিয়া পদ-ব্রজে আমার নিকট আসিতে বলুন।" এই কথায় বিভীষণ, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। সেই বিশাল সৈন্য-

মণ্ডলীর মধ্যবর্ত্তী নাতিপরিসর পথ দিয়া শত শত দৃষ্টির পাত্রী লজ্জায় বেপথুমানা তন্বী সীতাদেবী রামচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া চিরঈপ্সিত দয়িতের মুখচন্দ্র দর্শন করিলেন।

রামচন্দ্র বলিলেন—"অদ্য আমার শ্রম সফল, যে ব্যক্তি অপমানিত হইয়া প্রতিশোধ না নেয়, সে পৌরুষশূন্য, কৃপার্হ। অদ্য হনুমানের সমুদ্র লঙ্ঘন, সুগ্রীব বিভীষণ এবং সৈন্যবৃন্দের পরিশ্রম সার্থক।" এই কথায় সীতাদেবীর মুখপঙ্কজ হর্ষরাগে রক্তিমাভ হইয়া উঠিল, তাঁহার চক্ষে আনন্দাশ্রু উচ্ছলিত হইল। কিন্তু—

"জনবাদভয়াদ্রাজ্ঞো বভুব হৃদয়ং দ্বিধা।"

লোকনিন্দা ভয়ে রামচন্দ্রের হৃদয় দ্বিধা হইতে লাগিল, তিনি বহু কষ্টে হৃদয়ের আবেগ সম্বরণ করিয়া বলিলেন—"আমি মানাকাঙ্ক্ষী, রাবণ আমার অপমান করাতে তাহার প্রতিশোধ লইয়াছি। পবিত্র ইক্ষ্বাকুবংশের গৌরব রক্ষার্থ আমি যুদ্ধে রাক্ষসকে নিহত করিয়াছি, কিন্তু তুমি রাক্ষসগৃহে ছিলে, আমি তোমার চরিত্রে সন্দেহ করিতেছি। তুমি আমার চক্ষের পরম প্রীতির সামগ্রী, কিন্তু নেত্র-রোগী যেরূপ দীপের জ্যোতি সহ্য করিতে পারে না, তোমাকে দেখিয়া আমি সেইরূপ কষ্ট পাইতেছি। এরূপ পৌরুষবর্জ্জিত ব্যক্তি কে আছে যে শত্রুগৃহস্থিতা স্বীয় স্ত্রীকে পুনশ্চ গ্রহণ করিয়া সুখী হয়! তুমি রাবণের অঙ্কক্লিষ্টা, রাবণের দুষ্ট চক্ষে দৃষ্টা, তোমাকে গৃহে লইয়া গেলে আমার পবিত্র গৃহের কলঙ্ক হইবে। আমি যে সুহৃদ্‌গণের বাহুবলে এই যুদ্ধে বিজয় লাভ করিলাম, ইহা তোমার জন্য নহে। আমার

বংশের গৌরব রক্ষা করিয়াছি। এইক্ষণে এই দশদিক্ পড়িয়া আছে, তুমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও। লক্ষ্মণ, ভরত, সুগ্রীব কিম্বা বিভীষণ, ইঁহাদের যাঁহাকে অভিরুচি, তাঁহারই উপর মনো-নিবেশ কর।"

রামের এই কথায় সীতার মন কিরূপ হইল, তাহা অনুভব-নীয়। চতুর্দ্দিকে মহাসৈন্যসঙ্ঘ, সহস্র কর্ণ বিস্ময়ে রামের এই কথা শুনিয়া ব্যথিত হইল। ঘোর লজ্জায় সীতা অবনত হইলেন, লজ্জায় যেন নিজের শরীরের ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিলেন; কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয়-রমণী, অপ্রতিম তেজস্বিনী; চক্ষুপ্লাবী অশ্রু-রাশি এক হস্তে মার্জ্জনা করিয়া গদগদ-কণ্ঠে স্বামীকে বলিলেন—"তুমি আমাকে এই শ্রুতিকঠোর দুরক্ষর কথা কেন বলিতেছ? এই ভাবের কথা ইতর ব্যক্তিগণ তাহাদিগের স্ত্রীদিগকে বলিলে শোভা পায়, দৈববশে আমার গাত্র সংস্পর্শ দোষ হইয়াছে, তজ্জন্য আমি অপরাধিনী নহি, আমার মনে সর্ব্বদা তুমি বিরাজিত আছ। যদি তুমি আমাকে গ্রহণ করিবে না বলিয়াই স্থির করিয়াছিলে, তবে প্রথম যখন হনুমানকে লঙ্কায় পাঠাইয়াছিলে, তখন এ কথা বলিয়া পাঠাও নাই কেন? তাহা হইলে তোমাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এই জীবন আমি তখনই ত্যাগ করিতাম। তাহা হইলে তোমার ও তোমার সুহৃদ্বর্গের এই শ্রম স্বীকার করিতে হইত না।" এই বলিয়া সাশ্রুনেত্রে লক্ষ্মণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মণ, তুমি চিতা সজ্জিত করিয়া দাও। আমি আর এই অপবাদকলঙ্কিত জীবন বহন করিতে ইচ্ছা করি না।" লক্ষ্মণ রামের মুখের দিকে

চাহিয়া অসম্মতির কোন লক্ষণ পাইলেন না। চিতা সজ্জিত হইল, সীতা অধোমুখে স্থিত ধনুষ্পাণি রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া জ্বলন্ত অগ্নিতে শরীর আহুতি প্রদান করিলেন। অগ্নি-প্রবেশের পূর্ব্বে সীতা বলিয়াছিলেন—"আমি রাম ভিন্ন অন্য কাহাকেও মনে চিন্তা করি নাই, হে পবিত্র সর্ব্ব-সাক্ষী হুতাশন, আমাকে আশ্রয় দান কর। আমি শুদ্ধচরিত্রা, কিন্তু রামচন্দ্র আমাকে দুষ্টা বলিয়া জানিতেছেন, অতএব হে বহ্নি, আমাকে আশ্রয় দান কর।"

অগ্নিতে স্বর্ণপ্রতিমা বিলীন হইয়া গেল। সাশ্রুনেত্রে রাম মুহূর্ত্তকাল শোকাতুর হইয়া পড়িলেন; তখন অগ্নি সীতাকে রামের নিকট ফিরাইয়া দিয়া গেল। দেবগণ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া রামচন্দ্রের নিকট সীতা সম্বন্ধে নানা কথা বলিতে লাগি-লেন। রামচন্দ্র সীতাকে পুনঃ পাইয়া হৃষ্ট হইয়া বলিলেন, "সীতা শুদ্ধচরিত্রা এবং সতীত্বের প্রভায় আত্মরক্ষা করিয়াছেন, তাহা আমি মনে জানিয়াছি। যদি আমি প্রাপ্তি-মাত্রই সীতাকে গ্রহণ করিতাম, তবে লোকে আমাকে কামপরায়ণ বলিত এবং কোন প্রকার বিচার না করিয়া স্ত্রৈণতা বশতঃ ইঁহাকে গ্রহণ করিয়াছি, এই অপবাদ প্রচারিত হইত।

"বিশুদ্ধা ত্রিষু লোকেষু মৈথিলী জনকাত্মজা"—

"সীতা ত্রিলোকের মধ্যে বিশুদ্ধা" ইহা আমি অবগত আছি।

তৎপরে দেবগণ তাঁহাকে—

"ভবন্নারায়ণো দেবঃ শ্রীমাংশ্চক্রায়ুধঃ প্রভুঃ।"

"আপনি স্বয়ং চক্রধারী নারায়ণ।" ইত্যাদিরূপ স্তোত্র দ্বারা অভিনন্দিত করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

তৎপরে সভ্রাতা ও সস্ত্রীক রামচন্দ্র পুষ্পক রথারোহণ পূর্ব্বক বিভীষণপ্রমুখ রাক্ষসবৃন্দ ও সুগ্রীবপ্রমুখ বানরসৈন্যপরিবৃত হইয়া অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে সীতার ইচ্ছানুসারে কিষ্কিন্ধার পুরস্ত্রীবর্গকে রথে তুলিয়া লইলেন। বিজয়ী রামচন্দ্রকে লইয়া পুষ্পকরথ আকাশ-পথে চলিতে লাগিল। সমুদ্রের তীর-নিষেবিত সুস্নিগ্ধ বায়ুপ্রবাহ পর্য্যাপ্ত কেতকীরেণু আকাশে ব্যাপ্ত করিতে লাগিল, সীতার সুন্দর মুখ সেই পুষ্পরেণুসংচ্ছন্ন হইল; দূরে তমালতালশোভী সমুদ্রের বেলাভূমি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর রেখায় দৃশ্যমান হইতে লাগিল। রামচন্দ্র সীতাকে রথ হইতে চিরপরিচিত দণ্ডকারণ্যের নানা স্থান দেখাইয়া পূর্ব্বকথা তাঁহার স্মৃতিতে জাগরিত করিতে লাগিলেন; এই স্থানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বিস্তারিত করিয়াই কালিদাস রঘুবংশের অপূর্ব্ব ত্রয়োদশ-সর্গের সৃষ্টি করিয়াছেন।

বন-গমনের ঠিক চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে রামচন্দ্র ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সেখানে যাইয়া শুনিলেন, ভরত তাঁহার পাদুকার উপর রাজচ্ছত্র ধারণ করিয়া প্রতিনিধিস্বরূপ নন্দীগ্রামে রাজ্য শাসন করিতেছেন। ভরদ্বাজের আশ্রম হইতে রামচন্দ্র হনুমানকে ছদ্মবেশে ভরতের নিকট গমন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। পথে শৃঙ্গবের পুরাধিপতি গুহককে তিনি তাঁহার আগমন-সংবাদ দিয়া যাইতে বলিলেন। হনুমানকে ভরতের নিকট তাঁহার

যুদ্ধবৃত্তান্ত, সীতা-উদ্ধার এবং বিভীষণ ও সুগ্রীবের বিরাট মৈত্র-সৈন্য সহকারে অযোধ্যায় প্রত্যাগমনের কথা বলিতে কহিয়া শেষে বলিয়া দিলেন—"এই সকল কথা শুনিয়া ভরতের মুখভঙ্গী কিরূপ হয়, তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিও।" কোনও রূপ অপ্রীতি-ব্যঞ্জক ভাব লক্ষিত হইলে তিনি অযোধ্যায় যাইবেন না, দীর্ঘকাল ধনধান্যশালিনী ধরিত্রী শাসন করিয়া যদি তাঁহার রাজ্য কামনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভরতকেই রাজ্য প্রদান করিবেন।

হনুমান পথে গুহকরাজকে রামাগমনের শুভ সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিয়া অযোধ্যা হইতে এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী নন্দীগ্রামে উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে যাইয়া—

"দদর্শ ভরতং দীনং কৃশমাশ্রমবাসিনম্।
জটিলং মলদিগ্ধাঙ্গং ভ্রাতৃব্যসনকর্ষিতম্॥
সমুন্নতজটাভারং বল্কলাজিনবাসসম্।
নিয়তং ভাবিতাত্মানং ব্রহ্মর্ষিসমতেজসম্॥
পাদুকে তে পুরস্কৃত্য প্রশাসন্তং বসুন্ধরাম্।"

দেখিলেন ভরত দীন, কৃশ এবং আশ্রমবাসী, তাঁহার শরীর অমার্জ্জিত ও মলিন, তিনি ভ্রাতৃদুঃখে বিষণ্ণ। তাঁহার মস্তকে উন্নত জটাভার এবং পরিধানে বল্কল ও অজিন। তিনি সর্ব্বদা আত্মবিষয়ক ধ্যানমগ্ন এবং ব্রহ্মর্ষির ন্যায় তেজযুক্ত। পাদুকায় নিবেদন করিয়া বসুন্ধরা শাসন করিতেছেন। হনুমান যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন—

"বসন্তং দণ্ডকারণ্যে যং ত্বং চীরজটাধরম্।
অনুশোচসি কাকুৎস্থং স ত্বাং কুশলমব্রবীৎ॥"

"দণ্ডকারণ্যবাসী চীরজটাধর যে অগ্রজের জন্য আপনি অনুশোচনা করিতেছেন, তিনি আপনাকে কুশল জানাইয়াছেন।" রামের প্রত্যাগমনের সংবাদে ভরতের চক্ষে বহুদিনের নিরুদ্ধ অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, সমস্ত ভোগ বিলাস পরিত্যাগ করিয়া জটিল মলদিগ্ধাঙ্গে তিনি যাঁহার জন্য এতদিন কঠোর পারিব্রাজ্য পালন করিয়াছেন, যে রামের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়াছে—এই চতুর্দ্দশবর্ষব্যাপী কঠোর ব্রত পালনের ফলস্বরূপ সেই রামচন্দ্র গৃহপ্রত্যাগত হইতেছেন, এই সংবাদ শুনিয়া তিনি সাশ্রুনেত্রে হনুমানকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুজলে তাহাকে অভিষিক্ত করিলেন এবং তাহার জন্য বহু উপচারের সহিত বিবিধ মহার্ঘ পুরস্কারের ব্যবস্থা করিলেন।

সমস্ত সচিববৃন্দপরিবৃত হইয়া ভরত রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিতে যাত্রা করিলেন, তাঁহার জটার উপরে শ্রীরামের পাদুকা, তদূর্দ্ধে ছত্রধর বিশাল পাণ্ডুর ছত্র ধারণ করিয়াছিল, ভরত যাইয়া রামকে বরণ করিয়া আনিলেন এবং স্বহস্তে রামের পদে পাদুকা পরাইয়া দিয়া ন্যাস স্বরূপ ব্যবহৃত রাজ্যভার অগ্রজের হস্তে প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

রামচন্দ্র শুভদিনে রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন, সুগ্রীবকে বৈদূর্য্য ও চন্দ্রকান্ত মণিখচিত মহার্ঘ কণ্ঠী উপঢৌকন দিলেন, অঙ্গদকে বিপুল মুক্তাহার উপহৃত হইল। সীতা নানারূপ ভূষণ ও বস্ত্রাদি পাইলেন। তিনি স্বীয় কণ্ঠ হইতে মহামূল্য কণ্ঠহার তুলিয়া বানরসৈন্যের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। রামচন্দ্র

বলিলেন, "তোমার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ইহা উপহার দেও।" সীতা সেই হার হনুমানকে প্রদান করিলেন।

আমরা রামচন্দ্রের অভিষেক লইয়া এই আখ্যায়িকার মুখবন্ধ করিয়াছিলাম, তাঁহার অভিষেক আখ্যানের সঙ্গে ইহা পরিসমাপ্ত করিলাম।

—০—

রামের চরিত্র কিছু জটিল। ভরত, লক্ষ্মণ, সীতা প্রভৃতি অপরাপর সকলের চরিত্রই তুলনায় অপেক্ষাকৃত সরল, একমাত্র রামের সম্পর্কেই ইঁহাদের চরিত্র বিকাশ পাইয়াছে। ভরত ও লক্ষ্মণ ভ্রাতৃত্বে, সীতা সতীত্বে এবং দশরথ ও কৌশল্যা পিতৃত্বমাতৃত্বে বিকাশ পাইয়াছেন। নানা দিগ্‌দেশ হইতে আগত হইয়া নদী-গুলি এক সমুদ্রে পড়িয়া যেরূপ আপনাদের সত্তা হারাইয়া ফেলে, রামায়ণের বিচিত্র চরিত্রাবলীও সেইপ্রকার নানাদিক্ হইতে রাম-মুখী হইয়াছে—রামের সঙ্গে যতটুকু সম্বন্ধ, ততখানিতেই তাঁহা-দের সত্তা ও বিকাশ—এজন্য রামের সঙ্গে তুলনায় অপরাপর চরিত্র ন্যূনাধিক সরল। কিন্তু রামচরিত্র সকলের সঙ্গে সম্পর্কিত; —তিনি রামায়ণে পুত্ররূপে প্রাধান্যলাভ করিয়াছেন,—ভ্রাতারূপে, বন্ধুরূপে, স্বামী ও প্রভু রূপে—সকল রূপেই তিনি অগ্রগণ্য; বহুদিক্ হইতে তাঁহার চরিত্রের বিকাশ পাইয়াছে—এবং বহু বিভাগ হইতে তাঁহার চরিত্র দর্শনীয়। আবার তাঁহার চরিত্রের কতকগুলি আপাতবৈষম্যের সামঞ্জস্য করিয়া তাঁহাকে বুঝিতে হইবে; কতকগুলি জটিল রহস্যের মীমাংসা না করিলে তিনি

ভালরূপে বোধগম্য হইবেন না। তিনি আদর্শপুত্র—কৌশল্যাকে তিনি বলিয়াছিলেন,—"কাম মোহ বা অন্য যে কোন ভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই পিতা এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া থাকুন না কেন, আমি তাহার বিচার করিব না, আমি তাহার বিচারক নহি, আমি তাঁহার আদেশ পালন করিব—তিনি প্রত্যক্ষ দেবতা।") সেই রামচন্দ্রই গঙ্গার অপরতীরবর্ত্তী নিবিড় অরণ্যে বিটপিমূলে বসিয়া সাশ্রুনেত্রে লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন—"এমন কি কোথাও দেখিয়াছ লক্ষ্মণ, প্রমদার বাক্যের বশবর্ত্তী হইয়া কোন পিতা আমার ন্যায় ছন্দানুবর্ত্তী পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? মহারাজ অবশ্যই কষ্ট পাইতেছেন—কিন্তু যাহারা ধর্ম্মত্যাগ করিয়া কাম-সেবা করে—রাজা দশরথের ন্যায় কষ্ট তাহাদের অবশ্যম্ভাবী।" যিনি সীতাকে "শুদ্ধায়াং জগতীমধ্যে" বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং যাঁহাকে হারাইয়া তিনি শোকারুণচক্ষে উন্মত্তবৎ পুষ্পতরুকে আলিঙ্গন করিতে গিয়াছিলেন এবং

আগচ্ছ ত্বং বিশালাক্ষি শূন্যোঽয়মুটজস্তব।"

বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন,—লঙ্কাতে প্রবেশ করিয়া 'অশোকবন হইতে সীতাকে স্পর্শ করিয়া বায়ুপ্রবাহ তাঁহার অঙ্গ ছুঁইতেছে' বলিয়া পুলকাশ্রুনেত্রে ধ্যানী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—সেই রাম বিপুল সৈন্যসঙ্ঘের সাক্ষাতে—"লক্ষ্মণ, ভরত, বিভীষণ বা সুগ্রীব, ইঁহাদের যাঁহাকে ইচ্ছা, তুমি ভজনা করিতে পার—দশদিক্ পড়িয়া আছে—তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর—আমার তোমাতে কোন প্রয়োজন নাই"—গলদশ্রুনেত্রা, শোকশীর্ণা, অনপরাধিনী সীতাকে

এইরূপ নির্ম্মম কঠোর উক্তি করিয়াছিলেন। যিনি বনবাসদণ্ডের কথা শুনিয়া কৈকেয়ীর নিকট স্পর্দ্ধাসহকারে বলিয়াছিলেন—

"বিদ্ধি মাং ঋষিভিস্তুল্যং বিমলং ধর্ম্মমাস্থিতম্।"

'আমাকে ঋষিগণের মত বিমলধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানিবেন' তিনিই কৌশল্যার সমীপবর্ত্তী হইয়া "নিশ্বসন্নিব কুঞ্জরঃ" পরিশ্রান্ত হস্তীর ন্যায় নিরুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন, এবং সীতার অঞ্চলপার্শ্ববর্ত্তী হইয়া মুখে অপূর্ব্ব মলিনিমা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। লক্ষ্মণ ভরতকে বিনষ্ট করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে যিনি তাঁহাকে কঠোরবাক্যে বলিয়াছিলেন—"তুমি রাজ্য-লোভে এইরূপ কথা বলিয়া থাকিলে, আমি ভরতকে কহিয়া রাজ্য তোমাকে দিব" এবং যিনি ভরত তাঁহার "প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর" বারংবার এই কথা কহিতেন—তিনিই সীতার নিকট বলিয়া-ছিলেন, "তুমি ভরতের নিকট আমার প্রশংসা করিও না, ঐশ্বর্য্য-শালী ব্যক্তিরা অপরের প্রশংসা সহ্য করিতে পারেন না।" ভর-তের ভ্রাতৃভক্তির অপূর্ব্ব পরিচয় পাইয়া তিনি সীতাবিরহের সময়েও ভরতের দীন শোকাতুর মূর্ত্তি বিস্মৃত হন নাই—পুষ্পভারালঙ্কৃতা পম্পাতীরতরুরাজির পার্শ্বে ভরতের কথা স্মরণ করিয়া অশ্রুত্যাগ করিয়াছিলেন,—বিভীষণ স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, এইজন্য সুগ্রীব তাঁহাকে অবিশ্বাস্য বলিয়া নিন্দা করাতে, রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"বন্ধু, ভরতের ন্যায় ভাই এই পৃথিবীতে তুমি কয়জন পাইবে?" তিনিই আবার বনবাসান্তে ভরদ্বাজের আশ্রমে যাইয়া হনুমান্‌কে নন্দিগ্রামে পাঠাইবার সময় বলিয়াছিলেন,—

"আমার আগমনসংবাদ শুনিয়া ভরতের মুখে কোন বিকৃতি হয় কি না, ভাল করিয়া লক্ষ্য করিও।" এইরূপ বহুবিধ আপাত-বৈষম্য তাঁহার চরিত্রকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

রামায়ণপাঠককে আমরা একটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি। নাটক ও মহাকাব্য দুই পৃথক্ সামগ্রী—গ্রীক্ রীতি অনুসারে নাটকবর্ণিত কাল তিন দিবসের উর্দ্ধ হওয়ার বিধান নাই! এই দিবসত্রয়ের ঘটনাবর্ণনায় চরিত্রবিশেষকে একভাবাপন্ন করা একান্ত আবশ্যক, কোন্ কথাটি কাহার মুখ হইতে বাহির হইবে, লেখককে সতর্কতার সহিত তাহা লক্ষ্য করিয়া নাটকরচনা করিতে হয়। চরিত্রগুলির যেটুকু বিশেষত্ব, লেখককে সেই গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া তাহা সংক্ষেপে সঙ্কলন করিতে হয়। কিন্তু যে কাব্যের ঘটনা জীবনব্যাপী, সে কাব্যের চরিত্রগুলি নাটকের রীতি অনুসারে বিচার্য্য নহে। এই দীর্ঘকালে নানারূপ অবস্থাচক্রে পতিত হইয়া চরিত্রগুলির ক্রিয়াকলাপ ও কথাবার্ত্তা বিচিত্র হইয়া থাকে—তাহা সময়োপযোগী হয় কি না—তাহাই সমধিক পরিমাণে বিচার্য্য। শ্রেষ্ঠতম সাধুরও সারাজীবনের অন্তর্বর্ত্তী দুই একটি ঘটনা বা উক্তি বিচ্ছিন্ন করিয়া আলোকে ধরিলে তাহা তাদৃশ শোভন বলিয়া বিবেচিত না হইতে পারে। অবস্থার ক্রমাগত উৎপীড়ন সহ্য করিয়া লোকে সাধারণতঃ সাত্বিক-গুণসম্পন্ন হইলেও দুই এক স্থলে ভাবের ব্যত্যয় ঘটা স্বাভাবিক। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পতিত হইয়া রামচন্দ্র যাহা করিয়াছেন বা বলিয়াছেন—তাহা তাঁহার সমগ্র জীবনী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া

দেখাইলে দৌর্ব্বল্যজ্ঞাপক বলিয়া অনুমিত হইতে পারে, কিন্তু অবস্থার আলোকপাতে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে তাহা অনেক সময়েই অন্যরূপ প্রতিপন্ন হইবে। তাঁহার "দৌর্ব্বল্যজ্ঞাপক" উক্তিগুলি বাদ দিলে হয় ত তিনি আমাদের সহানুভূতির অত্যূর্দ্ধে যাইয়া পড়িতেন, আমরা তাঁহাকে ধরিতে ছুঁইতে পারিতাম না। রামচরিত্র বিশাল বনস্পতির ন্যায়—উহা কচিৎ নমিত হইয়া ভূস্পর্শ করিলেও সেই অবনয়ন তাহার নভঃস্পর্শী গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করে না—পার্থিব জ্ঞাতিত্বের পরিচয় দিয়া আমাদিগকে আশ্বস্ত করে মাত্র। রামচন্দ্র সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট নীতি অবলম্বন করিয়াই আপনার চরিত্রকে অপূর্ব্বশ্রীসমন্বিত রাখিয়াছেন—তাঁহার কোন চিন্তা বা কার্য্যই পরের অনিষ্ট করিবার প্রবৃত্তি হইতে উত্থিত নহে, এমন কি, বালীকেও তিনি কনিষ্ঠভ্রাতার ভার্য্যাপহারী দস্যু বলিয়া সত্য সত্য বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এইজন্যই দণ্ড দিতেও গিয়াছিলেন। সুগ্রীবের শত্রু তাঁহার শত্রু,—তাহাকে বধ করিতে তিনি অগ্নিসমক্ষে প্রতিশ্রুত ছিলেন—এই [illegible] তিনি ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। উত্তরকাণ্ডবর্ণিত সীতাবর্জ্জনেও দৃষ্ট হয়—রাম যাহা স্বকর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন—তাঁহার জীবনকে সম্যক্‌রূপে নৈরাশ্যপূর্ণ করিয়াও তিনি তাহা প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এই ঘটনায়ও তাঁহার চরিত্রের সতেজ পৌরুষের দিক্‌টাই জাজল্যমান করিয়াছে। মহাকাব্যের কোন গূঢ়দেশে অবস্থার দারুণ পীড়নে নিষ্পেষিত হইয়া তিনি দুই একটি অধীরবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা

লইয়া হট্টগোল করা এবং হিমালয়ের কোন্ শিলা কি পাদপে একটু ক্ষতচিহ্ন আছে, তাহা আবিষ্কার করিয়া পর্ব্বতরাজের মহত্ত্বকে তুচ্ছ করা, দুইই একবিধ। সাহিত্যিক ধূর্ত্তগণ রামচরিত্রের তদ্রূপ সমালোচনার ভার লইবেন। বাল্মীকি-অঙ্কিত রামচরিত্র অতি-মাত্রায় জীবন্ত—এ চিত্রে সূচিকা বিদ্ধ করিলে তাহা হইতে যেন রক্তবিন্দু ক্ষরিত হয়—এই চরিত্র ছায়া কিংবা ধূম্রবিগ্রহে পরিণত হইয়া পুস্তকান্তর্গত আদর্শ হইয়া পড়ে নাই।

সঙ্গীতের ন্যায় মানবজীবনেরও একটা মূলরাগিণী আছে—গীতি যেরূপ নানারূপ আলাপচারিতে ঘুরিয়া ফিরিয়াও স্বীয় মূল-রাগিণীর বাহিরে যাইয়া পড়ে না, মানবচরিত্রেরও সেইরূপ একটা স্বপরিচায়ক স্বাতন্ত্র্য আছে—সেইটিকে জীবনের মূলরাগিণী বলা যায়; জীবনের কার্য্যকলাপ সমগ্রভাবে বিবেচনা করিলে উহা আবিষ্কৃত হয়। যিনি যাহাই বলুন,—সেই অভিষেকোপযোগী বিশাল সম্ভারের প্রতি তাচ্ছীল্যের সহিত দৃষ্টিপাত করিয়া অভি-ষেকব্রতোজ্জ্বল শুদ্ধপট্টবস্ত্রধারী রামচন্দ্র যখন বলিয়াছিলেন—

"এবমস্তু গমিষ্যামি বনং বস্তুমহং স্থিতঃ।
জটাচীরধরো রাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্॥"

'তাহাই হউক, আমি রাজার প্রতিজ্ঞা পালনপূর্ব্বক জটাবল্কল ধারণ করিয়া বনবাসী হইব'—সেই দিনের সেই চিত্রই রামের অমর চিত্র। এই অপূর্ব্ব বৈরাগ্যের শ্রী তাঁহাকে চিনাইয়া দিবে। প্রজাগণ জলভারাচ্ছন্ন আকুল চক্ষে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন—

"যা প্রীতির্বহুমানশ্চ ময্যযোধ্যা নিবাসিনাম্।
মৎপ্রিয়ার্থং বিশেষেণ ভরতে সা বিধীয়তাম্॥"

'অযোধ্যাবাসিগণ, তোমাদের আমার প্রতি যে বহুমান ও প্রীতি, তাহা ভরতের প্রতি বিশেষভাবে অর্পণ করিলেই আমি প্রীত হইব।' এই উদার উক্তিই রামচরিত্রের পরিচায়ক। লক্ষ্মণের ক্রোধ ও বাগ্‌বিতণ্ডা পরাভূত করিয়া ঋষিবৎ সৌম্য রামচন্দ্র অভিষেকশালার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বলিলেন—

"সৌমিত্রে যোঽভিষেকার্থে মম সম্ভারসম্ভ্রমঃ।
অভিষেকনিবৃত্ত্যর্থে সোঽস্ত সম্ভারসম্ভ্রমঃ॥"

'সৌমিত্রে, আমার অভিষেকের জন্য যে সম্ভ্রম ও আয়োজন হইয়াছে, তাহা আমার অভিষেকনিবৃত্তির জন্য হউক।' এই বৈরাগ্যপূর্ণ কণ্ঠধ্বনি সমস্ত ক্ষুদ্রস্বর পরাজিত করিয়া আমাদের কর্ণে বাজিতে থাকে। যে দিন রাবণ রামের শরাসনের তেজে ভ্রষ্টকুণ্ডল ও হতশ্রী হইয়া পলাইবার পন্থা পাইতেছিল না, সে দিন রামচন্দ্র ক্ষমাশীল গম্ভীরকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"রাক্ষস, তুমি আমার বহুসৈন্য নষ্ট করিয়া এখন একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ, আমি ক্লান্ত ব্যক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করি না, তুমি আজ গৃহে যাইয়া বিশ্রাম কর, কল্য সবল হইয়া পুনরায় যুদ্ধ করিও।" সেই মহাহবের মহতী প্রাঙ্গণভূমিতে ধার্ম্মিকপ্রবরের এই কণ্ঠস্বর স্বর্গীয় ক্ষমা উচ্চারণ করিয়াছিল ;—উহাই তাঁহার চিরাভ্যস্ত কণ্ঠধ্বনি,—রাম ভিন্ন জগতে এ কথা শত্রুকে আর কে বলিতে পারিত ? কৈকেয়ীকে লক্ষ্মণ প্রসঙ্গক্রমে নিন্দা করিলে রামচন্দ্র পঞ্চবটীতে তাঁহাকে

বলিয়াছিলেন—"অম্বা কৈকেয়ীর নিন্দা তুমি আমার নিকট করিও না"—এরূপ উদার উক্তি রামের মুখেই স্বাভাবিক; সীতাকেও তিনি এই ভাবে বলিয়াছিলেন—

"স্নেহপ্রণয়সম্ভোগে সমা হি মম মাতরঃ।"

"আমার প্রতি স্নেহ ও আদর প্রদর্শনের সম্পর্কে,—সকল মাতাই আমার পক্ষে তুল্য।" যে দিন শরাহত লক্ষ্মণ মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছিলেন, এদিকে দুর্দ্ধর্ষ রাবণ তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা পাইতেছিল,—ব্যাঘ্রী যেরূপ স্বীয় শাবককে রক্ষা করে, রামচন্দ্র সেই ভাবে লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতেছিলেন; রাবণের শরজাল তাঁহার পৃষ্ঠদেশ ছিন্নভিন্ন করিতেছিল, সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া রামচন্দ্র সজলচক্ষে লক্ষ্মণকে বক্ষে লইয়া বসিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন,—"তুমি যেরূপ বনে আমাকে অনুগমন করিয়াছ, আমিও আজ সেইরূপ মৃত্যুতে তোমাকে অনুগমন করিব, তোমাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিতে পারিব না।"—এইরূপ শত শত চিত্র রামায়ণকাব্যে অমর হইয়া আছে, শত শত উক্তিতে সেই চিত্র স্বর্গের আদর্শ পৃথিবীতে আঁকিয়া ফেলিতেছে, বহু পত্রে সেই চিত্র ও উক্তি আমাদিগকে এই আশ্চর্য্য চরিত্রের সমুন্নত সৌন্দর্য্য দেখাইয়া মুগ্ধ ও বিস্ময়াভিভূত করিতেছে। রামায়ণকাব্যপাঠান্তে রামচন্দ্রের এই উজ্জ্বল ও সাধু মূর্ত্তি মানসপটে চিরতরে মুদ্রিত হইয়া যায়, অপর কোন কথা মনে উদয় হয় না, আর একান্ত সাত্ত্বিকভাবে বিচার করিলে সীতাবিরহে রামের প্রেমোন্মাদ যদি দৌর্ব্বল্যজ্ঞাপক হয়, তবে তাহার এই সান্ত্বনা যে, প্রণয়িগণের

নিকট রামের এই প্রেমোন্মাদের ন্যায় মনোহর কিছু নাই— এখানে বৈরাগ্যের শ্রী নাই, কিন্তু অপর্য্যাপ্ত কাব্যশ্রী সে অভাব পূরণ করিয়া দিতেছে, আর নির্জ্জন গিরিপ্রদেশের শোভান্বিত দৃশ্যাবলীতে বিরহাশ্রুর সংযোগ করিয়া সেই সমস্ত বিচিত্র বাহ্য-সম্পদ্ চিরসুন্দর করিয়া রাখিয়াছে।

ভরত।

ভরতের উল্লেখ করিয়া রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন—

"রামাদপি হি তং মন্যে ধর্ম্মতো বলবত্তরম্।"

ভরতের চরিত্র তিনি বিলক্ষণরূপ অবগত ছিলেন, তথাপি রাম বনগমন করিলে তাঁহাকে ত্যাজ্য পুত্র ও স্বীয় ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্যের অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এমন নির্দ্দোষ—শুধু নির্দ্দোষ বলিলে ঠিক হয় না, রামায়ণকাব্যের একমাত্র আদর্শচরিত্র ভরতের ভাগ্যে যে কি বিড়ম্বনা ঘটিয়াছিল, তাহা আলোচনা করিলে আমরা দুঃখিত হই। পিতা তাঁহাকে অন্যায়ভাবে ত্যাগ করিলেন, এমন কি তাঁহাকে আনিবার জন্য যে সকল দূত কেকয়-রাজ্যে প্রেরিত হইয়াছিল তাহারাও অযোধ্যার কুশলসম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তরে যেন ঈষৎ ক্রূর ব্যঙ্গসহকারে বলিয়াছিল—

"কুশলাস্তে মহাবাহো যেষাং কুশলমিচ্ছসি।"

"আপনি যাহাদের কুশল ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কুশলে আছেন।" অর্থাৎ ভরত যেন দশরথ-রাম-লক্ষ্মণ প্রভৃতির কুশল বাস্তবিক চান না—তিনি কৈকেয়ী ও মন্থরার কুশলই শুধু প্রার্থনা করেন। দূতগণ এক হয় মিথ্যা কথা বলিয়াছিল, না হয় নিষ্ঠুরভাবে ব্যঙ্গ করিয়াছিল, ইহা ভিন্ন এস্থলের আর কোনরূপ অর্থ হয় না। রামবনবাসোপলক্ষে অযোধ্যার রাজগৃহে যে ভয়ানক বাগ্‌বিতণ্ডা

উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যেও দুই এক বার এই নির্দ্দোষ রাজকুমারের প্রতি অন্যায় কটাক্ষপাত হইয়াছে। প্রজাগণ রামের বনবাসকালে,—

"ভরতে সন্নিবদ্ধাঃ স্ম সৌনিকে পশবো যথা।"

"আমরা ঘাতক সন্নিধানে পশুর ন্যায় ভরতের নিকট নিবদ্ধ হইলাম"—এই বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়াছিল। এই সাধু ব্যক্তি নিতান্ত আত্মীয়গণের নিকট হইতেও অতি অন্যায় লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইয়াছেন। রামচন্দ্র ভরতকে এত ভালবাসিতেন যে, "মম প্রাণৈঃ প্রিয়তরঃ" বলিয়া তিনি বারংবার ভরতের উল্লেখ করিয়াছেন। কৌশল্যাকে রাম বলিয়াছিলেন—"ধর্ম্ম-প্রাণ ভরতের কথা মনে করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় রাখিয়া যাইতে আমার কোন চিন্তার কারণ নাই।" অথচ সেই রামচন্দ্রও ভরতের প্রতি দুই একটি সন্দেহের বাণ নিক্ষেপ না করিয়াছেন, এমন নহে। তিনি সীতার নিকট বলিয়াছিলেন, "তুমি ভরতের নিকট আমার প্রশংসা করিও না—ঋদ্ধিযুক্ত পুরুষেরা পরের প্রশংসা শুনিতে ভালবাসেন না।" এই সন্দেহের মার্জ্জনা নাই। পিতা দশরথ রামাভিষেকের উদ্যোগের সময় ভরতকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন, রামকে তিনি আহ্বান করিয়া আনিয়া বলিয়াছিলেন, "ভরত মাতুলালয়ে থাকিতে থাকিতেই তোমার অভিষেক সম্পন্ন হইয়া যায়, ইহাই আমার ইচ্ছা; কারণ যদিও ভরত ধার্ম্মিক ও তোমার অনুগত, তথাপি মনুষ্যের মন বিচলিত হইতে কতক্ষণ!" ইক্ষ্বাকুবংশের চিরাগতপ্রথানুসারে সিংহাসন

জ্যেষ্ঠভ্রাতারই প্রাপ্য, এমত অবস্থায় ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ভরতের প্রতি এই সন্দেহের মার্জ্জনা নাই। রাম ভরতের চরিত্র-মাহাত্ম্য এত বুঝিলেন, তথাপি বনবাসান্তে ভরদ্বাজাশ্রম হইতে হনুমান্‌কে ভরতের নিকটে পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন—"আমার প্রত্যাগমন-সংবাদ শুনিয়া ভরতের মুখে কোন বিকৃতি হয় কি না, তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিও।" এই সন্দেহও একান্ত অমার্জ্জনীয়। জগতে অনপরাধীর দণ্ড অনেকবার হইয়াছে, কিন্তু ভরতের মত আদর্শ-ধার্ম্মিকের প্রতি এইরূপ দণ্ডের দৃষ্টান্ত বিরল। লক্ষ্মণ বারংবার—

"ভরতস্য বধে দোষং নাহং পশ্যামি রাঘব।"

বলিয়া আস্ফালন করিয়াছেন, অথচ সেই ভরত অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে লক্ষ্মণের কথা বলিয়াছেন—

"সিদ্ধার্থঃ খলু সৌমিত্রির্যশ্চন্দ্রবিমলোপমম্।
মুখং পশ্যতি রামস্য রাজীবাক্ষং মহাদ্যুতিম্॥"

লক্ষ্মণ ধন্য, তিনি রামচন্দ্রের পদ্মচক্ষু চন্দ্রোপম উজ্জ্বল মুখখানি দেখিতেছেন। প্রকৃতিপুঞ্জের ভরতের প্রতি বিদ্বিষ্ট হওয়ার কিছু কারণ অবশ্যই বিদ্যমান ছিল। এত বড় ষড়্‌যন্ত্রটা হইয়া গেল, ভরতের ইহাতে কি পরোক্ষে কোনরূপই অনুমোদন ছিল না? মাতুল যুধাজিতের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ভরত যে দূর হইতে সূত্রচালনা করিয়া কৈকেয়ীকে নাচাইয়া তোলেন নাই, তাহার প্রমাণ কি? এই সন্দেহের আশঙ্কা করিয়া ভরত বিসংজ্ঞ অবস্থায় কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন—'যখন অযোধ্যার প্রকৃতিপুঞ্জ রুদ্ধকণ্ঠে সজলনেত্রে আমার দিকে তাকাইবে, আমি তাহা সহ্য করিতে পারিব না।"

কৌশল্যা ভরতকে ডাকিয়া আনিয়া কটুবাক্য বলিতে লাগিলেন, সেই সকল বাক্যে ব্রণে সূচিকা বিদ্ধ করিলে যেরূপ কষ্ট হয়, ভরতকে সেইরূপ বেদনা দিয়াছিল। দৈবচক্রে পড়িয়া এই দেবতুল্যচরিত্র বিশ্বের সকলের সন্দেহের ভাজন হইয়া লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। তিনি রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিপুল বাহিনী সঙ্গে যখন অগ্রসর হইতেছিলেন, নিষাদাধিপতি গুহক তখন তাঁহাকে রামের অনিষ্টকামনায় ধাবিত মনে করিয়া পথে লগুড় ধারণপূর্ব্বক দাঁড়াইয়াছিলেন, এমন কি ভরদ্বাজ ঋষি পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভয়ের চক্ষে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আপনি সেই নিষ্পাপ রাজপুত্রের প্রতি কোন পাপ অভিপ্রায় বহন করিয়া ত যাইতেছেন না ?" প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে দিতে ভরতের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছিল। ভরত কৈকেয়ীকে "মাতৃরূপে মমামিত্রে" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন—বাস্তবিকই কৈকেয়ী মাতারূপে তাঁহার মহাশত্রুস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—বিশ্বময় এই যে সন্দেহ-চক্ষুর বিষবাণ ভরতের উপর পতিত হইতেছিল, তাহার মূল কৈকেয়ী।

কিন্তু ঘটনাবলী যতই জটিলভাব ধারণ করুক না কেন, ভরতের অপূর্ব্ব ভ্রাতৃস্নেহ সমস্ত জটিলতাকে সহজ করিয়া তুলিয়াছিল। রামকে আমরা নানা অবস্থায় সুখী হইতে দেখিয়াছি। যখন চিত্রকূটের পুষ্পোদ্যাননিভ এবং কচিৎ ক্ষয়িতপ্রস্তরপ্রান্ত অধিত্যকায় বিলম্বিত শৈলশৃঙ্গ এবং বিচিত্র পুষ্পসম্ভারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রাম সীতাকে বলিয়াছিলেন, "এই স্থানে তোমার

সঙ্গে বিচরণ করিয়া আমি অযোধ্যার রাজপদ অকিঞ্চিৎকর মনে করিতেছি,” তখন দম্পতির নির্ম্মল আনন্দময় চিত্র আমাদের চক্ষে বড়ই সুন্দর ও তৃপ্তিপ্রদ মনে হইয়াছে। রামচন্দ্রের আকাশ কখন মেঘাচ্ছন্ন, কখন প্রসন্ন। কিন্তু ভরতের চিরবিষণ্ণ চিত্রটি মর্ম্মান্তিক করুণার যোগ্য। রামকে যখন ভরত ফিরাইয়া লইতে আসেন, তখন তাঁহার জটিল, কৃশ ও বিবর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া রামচন্দ্র চমকিয়া উঠিয়াছিলেন, কষ্টে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

ভরতের চিত্র প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে কবিগুরু যখন সর্ব্বপ্রথম যবনিকা উত্তোলন করেন, তখনই তাঁহার মূর্ত্তি বিষণ্ণতা-পূর্ণ। এইমাত্র দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়াছেন, নর্ত্তকীগণ তাঁহার প্রমোদের জন্য সম্মুখে নৃত্য করিতেছে, সখাগণ ব্যগ্রভাবে কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ভরতের চিত্ত ভারাক্রান্ত, মুখখানি শ্রীহীন। অযোধ্যার বিষম বিপদের পূর্ব্বাভাষ যেন তাঁহার মন অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তিনি কোনরূপেই সুস্থ হইতে পারিতেছেন না। এই সময়ে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য অযোধ্যা হইতে দূত আসিল। ব্যগ্রকণ্ঠে ভরত দূতগণকে অযোধ্যার প্রত্যেকের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। দূতগণ দ্ব্যর্থব্যঞ্জক উত্তরে বলিল,—

“কুশলাস্তে মহাবাহো যেষাং কুশলমিচ্ছসি।”

কিন্তু গতরাত্রের দুঃস্বপ্ন ও দূতগণের ব্যগ্রতা তাঁহার নিকট একটা সমস্যার মত মনে হইল। এই দুই ঘটনা তিনি একটি দুশ্চিন্তার সূত্রে গাঁথিয়া একান্ত বিমর্ষ হইলেন—

"বভূব হ্যস্য হৃদয়ে চিন্তা সুমহতী তদা।
ত্বরয়া চাপি দূতানাং স্বপ্নস্যাপি চ দর্শনাৎ॥"

বহু দেশ, নদনদী ও কান্তার অতিক্রম করিয়া ভরত দূর হইতে অযোধ্যার চিরশ্যামল তরুরাজি দেখিতে পাইলেন এবং আতঙ্কিত-কণ্ঠে সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ যে অযোধ্যার মত বোধ হয় না, নগরীর সেই চিরশ্রুত তুমুল শব্দ শুনিতেছি না কেন? বেদপাঠনিরত ব্রাহ্মণগণের কণ্ঠধ্বনি ও কার্য্যস্রোতে প্রবাহিত নরনারীর বিপুল হলহলাশব্দ একান্তরূপে নিস্তব্ধ। যে প্রমোদো-দ্যানসমূহে রমণী ও পুরুষগণ একত্র বিচরণ করিত, তাহা আজ পরিত্যক্ত। রাজপন্থা চন্দন ও জলনিষেকে পবিত্র হয় নাই। রথ, অশ্ব, হস্তী, রাজপথে কিছুই নাই। অসংযত কবাট ও শ্রীহীন রাজপুরী যেন ব্যঙ্গ করিতেছে, এ ত অযোধ্যা নহে, এ যেন অযোধ্যার অরণ্য।"

প্রকৃতই অযোধ্যার শ্রী অন্তর্হিত হইয়াছে। চাঁদের হাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ত্রিলোকবিশ্রুতকীর্ত্তি মহারাজ দশরথ পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; অভিষেকমঞ্চে পাদোত্তোলনোদ্যত জ্যেষ্ঠ রাজকুমার বিধিশাপে অভিশপ্ত হইয়া পাগলের বেশে বনে গিয়াছেন; বলয়কঙ্কণকেয়ূর সখীগণকে বিলাইয়া দিয়া অযোধ্যার রাজবধূ পাগলিনীবেশে স্বামিসঙ্গিনী হইয়াছেন; যাঁহার আয়ত এবং সুবৃত্ত বাহুদ্বয় অঙ্গদ প্রভৃতি সর্ব্ব ভূষণ ধারণের যোগ্য—"সেই সুবর্ণচ্ছবি" লক্ষ্মণ ভ্রাতা ও বধূর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। অযোধ্যার গৃহে গৃহে এই তিন দেবতার জন্য করুণ ক্রন্দনের

উৎসপ্রবাহিত হইতেছে। বিপণী বন্ধ, রাজপথ পরিত্যক্ত। সুমন্ত্র সত্যই বলিয়াছিলেন, সমস্ত অযোধ্যানগরী যেন পুত্রহীনা কৌশল্যার দশা প্রাপ্ত হইয়াছে।

অথচ ভরত এ সকল কিছুই জানেন না। তিনি মৌন প্রতিহারীদিগের প্রণাম গ্রহণ করিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে পিতার প্রকোষ্ঠে গেলেন, সেখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

"রাজা ভবতি ভূয়িষ্ঠমিহাম্বায়া নিবেশনে।"

কৈকেয়ীর গৃহে রাজা অনেক সময় থাকেন,—পিতাকে খুঁজিতে ভরত মাতার গৃহে প্রবেশ করিলেন।

সদ্যোবিধবা কৈকেয়ী আনন্দে ফুল্লা, পতিঘাতিনী পুত্রের ভাবী অভিষেকব্যাপারের আনন্দের চিত্র মনে মনে অঙ্কিত করিয়া সুখী হইতেছিলেন। ভরতকে পাইয়া তিনি নিতান্ত হৃষ্টা হইলেন। ভরত পিতার কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—

"যা গতিঃ সর্ব্বভূতানাং তাং গতিং তে পিতা গতঃ।"

"সর্ব্বজীবের যে গতি, তোমার পিতা তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছেন।" এই সংবাদে পরশুচ্ছিন্ন বন্যবৃক্ষের ন্যায় ভরত ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

"ক্ব স পাণিঃ সুখস্পর্শস্তাতস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।"

"অক্লিষ্টকর্ম্মা পিতার হস্তের সুখের স্পর্শ কোথায় পাইব?"—বলিয়া ভরত কাঁদিতে লাগিলেন। রাজহীন রাজশয্যা তাঁহার নিকট চন্দ্রহীন আকাশের মত বোধ হইল। তিনি কৈকেয়ীকে বলিলেন, "রাম কোথায় আছেন? এখন পিতার অভাবে যিনি আমার পিতা, যিনি আমার বন্ধু, আমি যাঁহার দাস,—সেই

রামচন্দ্রকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে।" রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা নির্ব্বাসিত হইয়াছেন শুনিয়া ভরত ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, ভ্রাতার চরিত্রসম্বন্ধে আশঙ্কা করিয়া তিনি বলিলেন,—"রাম কি কোন ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিয়াছেন, তিনি কি দরিদ্রদিগকে পীড়ন করিয়াছেন, কিংবা পরদারে আসক্ত হইয়াছেন?—এই নির্ব্বাসনদণ্ড কেন হইল?" কৈকেয়ী বলিলেন—"রাম এ সকল কিছুই করেন নাই।" শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন—

"ন রামঃ পরদারান্ স চক্ষুর্ভ্যামপি পশ্যতি।"

শেষে ভরতের উন্নতি ও রাজশ্রী কামনায় কৈকেয়ী যে সকল কাণ্ড করিয়াছেন, তাহা বলিয়া পুত্রের প্রীতি উৎপাদনের প্রতীক্ষায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন।

নিবিড় মেঘমণ্ডল যেন আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ধর্ম্মপ্রাণ বিশ্বস্ত ভ্রাতা এই দুঃসহ সংবাদের মর্ম্ম ক্ষণকাল গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি মাতাকে যে ভর্ৎসনা করিলেন, তাহা তাঁহার মহাদুর্গতি স্মরণ করিয়া আমরা সম্পূর্ণরূপে সময়োপযোগী মনে করি। "তুমি ধার্ম্মিকবর অশ্বপতির কন্যা নহ, তাঁহার বংশে রাক্ষসী। তুমি আমার ধর্ম্মবৎসল পিতাকে বিনাশ করিয়াছ, ভ্রাতাদিগকে পথের ভিখারী করিয়াছ, তুমি নরকে গমন কর।" যখন কাতরকণ্ঠে ভরত এই সকল কথা বলিতেছিলেন, তখন অপর গৃহ হইতে কৌশল্যা সুমিত্রাকে বলিলেন—"ভরতের কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে, সে আসিয়াছে, তাহাকে

আমার নিকট ডাকিয়া আন।” কৃশাঙ্গী সুমিত্রা ভরতকে ডাকিয়া আনিলে কৌশল্যা বলিলেন, “তোমার মাতা তোমাকে লইয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করুন, তুমি আমাকে রামের নিকট পাঠাইয়া দেও।” এই কটূক্তিতে মর্ম্মবিদ্ধ ভরত কৌশল্যার নিকট অনেক শপথ করিলেন; তিনি এই ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না,—বহুপ্রকারে এই কথা জানাইতে চেষ্টা করিয়া নিদারুণ শোক ও লজ্জায় অভিভূত ভরত নিজের প্রতি অজস্র অভিসম্পাত-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে শোকে মুহ্যমান হইয়া তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। করুণাময়ী অম্বা কৌশল্যা ধর্ম্মভীরু কুমারের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন,—তাঁহাকে অঙ্কে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ভরতের শোক এবং ঔদাসীন্য ক্রমেই যেন বাড়িয়া চলিল। শ্মশানঘাটে মৃত পিতার কণ্ঠলগ্ন হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, “পিতঃ, আপনি প্রিয় পুত্রদ্বয়কে বনে পাঠাইয়া নিজে কোথায় যাইতেছেন?” অশ্রুপূর্ণকাতরদৃষ্টি রাজকুমারকে বশিষ্ঠ তাড়না করিতে করিতে পিতার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত করাইলেন, শোকবিহ্বলতায় ভরত নিজে একেবারে চেষ্টাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন।

প্রাতে বন্দিগণ ভরতের স্তবগান আরম্ভ করিল, ভরত পাগলের ন্যায় ছুটিয়া তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া দিলেন। “ইক্ষ্বাকু-বংশের প্রথানুসারে সিংহাসন জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের প্রাপ্য, তোমরা কাহার বন্দনাগীতি গাহিতেছ?” রাজমৃত্যুর চতুর্দ্দশ দিবসে

বশিষ্ঠপ্রমুখ সচিববৃন্দ ভরতকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ভরত বলিলেন—"রামচন্দ্র রাজা হইবেন, অযোধ্যার সমস্ত প্রজামণ্ডলী লইয়া আমি তাঁহার পা' ধরিয়া সাধিয়া আনিব, নতুবা চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য আমিও বনবাসী হইব।"

শত্রুঘ্ন মন্থরাকে মারিতে গেলেন এবং কৈকেয়ীকে তর্জ্জন করিয়া অনুসরণ করিলে, ক্ষমার অবতার ভরত তাঁহাকে নিষেধ করিলেন।

সমস্ত অযোধ্যাবাসী রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিতে ছুটিল। শৃঙ্গবেরপুরীতে গুহকের সঙ্গে ভরতের সাক্ষাৎকার হইল। ভরতকে গুহক প্রথমে সন্দেহ করিয়াছিল, কিন্তু ভরতের মুখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ইঙ্গুদীমূলে তৃণশয্যায় রাম শুধু একটু জল পান করিয়া রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন, সেই তৃণশয্যা রামের বিশালবাহুপীড়নে নিষ্পেষিত হইয়াছিল, সীতার উত্তরীয়প্রক্ষিপ্ত স্বর্ণবিন্দু তৃণের উপর দৃষ্ট হইতেছিল, এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ভরত মৌনী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, গুহক কথা বলিতেছিলেন, ভরত শুনিতে পান নাই। ভরতকে সংজ্ঞাশূন্য দেখিয়া শত্রুঘ্ন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন,—রাণীগণ এবং সচিববৃন্দের শোক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বহুযত্নে ভরত জ্ঞানলাভ করিয়া সাশ্রুনেত্রে বলিলেন, "এই না কি তাঁহার শয্যা,—যিনি আকাশস্পর্শী রাজপ্রাসাদে চিরদিন বাস করিতে অভ্যস্ত,—যাঁহার গৃহ পুষ্পমাল্য, চিত্র ও চন্দনে চিরানুরঞ্জিত,—যে গৃহশেখর নৃত্যশীল শুক ও ময়ূরের বিহারভূমি ও

গীতবাদিত্রশব্দে নিত্যমুখরিত ও যাহার কাঞ্চনভিত্তিসমূহ কারু-কার্য্যের আদর্শ,—সেই গৃহপতি ধূলিলুণ্ঠিত হইয়া ইঙ্গুদীমূলে পড়িয়াছিলেন, এ কথা স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়, ইহা অবিশ্বাস্য। আমি কোন্ মুখে রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিব? ভোগবিলাসের দ্রব্যে আমার কাজ নাই, আমি আজ হইতে জটাবল্কল পরিয়া ভূতলে শয়ন করিব ও ফলমূলাহার করিয়া জীবনযাপন করিব।"

এবার জটাবল্কলপরিহিত শোকবিমূঢ় রাজকুমার ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে যাইয়া রামচন্দ্রের অনুসন্ধান করিলেন।—এই সর্ব্বজ্ঞ ঋষিও প্রথমতঃ সন্দেহ করিয়া ভরতের মনঃপীড়া দিয়াছিলেন। একরাত্রি ভরদ্বাজের আশ্রমে আতিথ্যগ্রহণ করিয়া মুনির নির্দ্দেশানুসারে রাজকুমার চিত্রকূটাভিমুখে রওনা হইলেন। ভরদ্বাজ ভরতের শিবিরে আগমন করিয়া রাণীদিগকে চিনিতে চাহিলেন। ভরত এইভাবে মাতাদিগের পরিচয় দিলেন, "ভগবন্, ঐ যে শোক এবং অনশনে ক্ষীণদেহা সৌম্যমূর্ত্তি দেবতার ন্যায় দেখিতেছেন, ইনিই আমার অগ্রজ রামচন্দ্রের মাতা, উঁহার বামবাহু আশ্রয় করিয়া বিমনা অবস্থায় যিনি দাঁড়াইয়া আছেন, বনান্তরে শুষ্কপুষ্প-কর্ণিকার-তরুর ন্যায় শীর্ণাঙ্গী—ইনি লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জননী সুমিত্রা,—আর তাঁহার পার্শ্বে যিনি, তিনি অযোধ্যার রাজলক্ষ্মীকে বিদায় করিয়া আসিয়াছেন, তিনি পতিঘাতিনী ও সমস্ত অনর্থের মূল, বৃথা-প্রজ্ঞামানিনী ও রাজ্যকামুকা—এই দুর্ভাগ্যের মাতা।" বলিতে বলিতে ভরতের দুইটি চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল এবং ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় একবার জলভরা চক্ষে মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

চিত্রকূটের সন্নিহিত হইয়া ভরত জননীবৃন্দ ও সচিবসমূহে পরিবৃত হইয়া রথ ত্যাগ করিয়া পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

তখন রমণীয় চিত্রকূটে অর্ক ও কেতকী পুষ্প ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আম্র ও লোধ্রদল পক্ক হইয়া শাখাগ্রে দুলিতেছিল। চিত্রকূটের কোন অংশ ক্ষতবিক্ষত প্রস্তররাজিতে ধূসর, নিম্ন অধিত্যকাভূমি পুষ্পসম্ভারে প্রমোদ-উদ্যানের ন্যায় সুন্দর, কোথাও পর্ব্বতগাত্র হইতে একটিমাত্র শৈলশৃঙ্গ ঊর্দ্ধে উঠিয়া আকাশ চুম্বন করিয়া আছে—অদূরে মন্দাকিনী,—কোথাও পুলিনশালিনী, কোথাও জলরাশির ক্ষীণরেখা নীল তরুরেখার প্রান্তে বিলীয়মান। তরঙ্গরাজি সুন্দরীর পরিত্যক্ত বস্ত্রের ন্যায় বায়ুকর্ত্তৃক ঘন আন্দোলিত হইতেছিল, কোথায় পার্ব্বত্য ফুলরাশি স্রোতোবেগে ভাসিয়া যাইতেছিল। এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে রামচন্দ্র সীতাকে বলিলেন—"রাজ্যনাশ ও সুহৃদ্বিরহ আমার দৃষ্টির কোন বাধা জন্মাইতেছে না, আমি এই পার্ব্বত্য দৃশ্যাবলীর নির্ম্মল আনন্দ সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে পারিতেছি।"

এই কথা শেষ না হইতে হইতে সহসা বিপুল শব্দে নভঃপ্রদেশ আকুল হইয়া উঠিল, সৈন্যরেণুতে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইল, তুমুল শব্দে পশুপক্ষী চতুর্দ্দিকে পলাইতে লাগিল। রামচন্দ্র সন্ত্রস্ত হইয়া লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ, কোন রাজা বা রাজপুত্র মৃগয়ার জন্য এই বনে আসিয়াছেন কি? কিংবা কোন ভীষণ জন্তুর আগমনে এই সৌম্যনিকেতনের শান্তি এভাবে বিঘ্নিত হইতেছে?" লক্ষ্মণ দীর্ঘপুষ্পিত শালবৃক্ষের অগ্রে উঠিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া

পূর্ব্বদিকে সৈন্যশ্রেণী দেখিতে পাইলেন এবং বলিলেন, "অগ্নি নির্ব্বাণ করুন, সীতাকে গুহার মধ্যে লুকাইয়া রাখুন এবং অস্ত্র-শস্ত্রাদি লইয়া প্রস্তুত হউন।" "কাহার সৈন্য আসিতেছে, কিছু বুঝিতে পারিলে কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে লক্ষ্মণ বলিলেন, "অদূরে ঐ যে বিশাল বিটপী দেখা যাইতেছে, উহার পত্রান্তরে ভরতের কোবিদারচিহ্নিত রথধ্বজ দেখা যাইতেছে,—অভিষেক প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণমনোরথ হয় নাই, নিষ্কণ্টকে রাজ্যশ্রী লাভ করি-বার জন্য ভরত আমাদিগের বধসঙ্কল্পে অগ্রসর হইতেছে, আজ এই সমস্ত অনর্থের মূল ভরতকে আমি বধ করিব।"

রামচন্দ্র বলিলেন—"ভরত আমাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে। সকল অবস্থা অবগত হইয়া আমার প্রতি চিরস্নেহপরায়ণ, আমার প্রাণ হইতে প্রিয় ভরত স্নেহাক্রান্তহৃদয়ে পিতাকে প্রসন্ন করিয়া আমাদিগের উদ্দেশে আসিয়াছে, তুমি তাহার প্রতি অন্যায় সন্দেহ করিতেছ কেন? ভরত কখন ত আমাদিগের কোন অপ্রিয় কার্য্য করে নাই, তুমি তাহার প্রতি কেন ক্রূরবাক্য প্রয়োগ করিতেছ? যদি রাজ্যলোভে এরূপ করিয়া থাক, তবে ভরতকে কহিয়া আমি নিশ্চয়ই রাজ্য তোমাকে দেওয়া-ইব।" ধর্ম্মশীল ভ্রাতার এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

কিছু পরেই ভরত আসিয়া উপস্থিত হইলেন; অনশনক্লশ ও শোকের জীবন্তমূর্ত্তি দেবোপম ভরত রামকে তৃণের উপর উপবিষ্ট দেখিয়া বালকের ন্যায় উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন—"হেমছত্র

যাঁহার মস্তকের উপর শোভা পাইত, সেই রাজশ্রী-উজ্জ্বল শিরোদেশে আজ জটাভার কেন? আমার অগ্রজের দেহ চন্দন ও অগুরু দ্বারা মার্জ্জিত হইত, আজ সেই অঙ্গরাগবিরহিত কান্তি ধূলিধূসর। যিনি সমস্ত বিশ্বের প্রকৃতিপুঞ্জের আরাধনার বস্তু, তিনি বনে বনে ভিখারীর বেশে বেড়াইতেছেন,—আমার জন্যই তুমি এই সকল কষ্ট বহন করিতেছ, এই লোকগর্হিত নৃশংস জীবনে ধিক্!" বলিতে বলিতে উচ্চস্বরে কাঁদিয়া ভরত রামচন্দ্রের পাদমূলে নিপতিত হইলেন। এই দুই ত্যাগী মহাপুরুষের মিলনদৃশ্য বড় করুণ। ভরতের মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, তাঁহারও মাথায় জটাজূট, দেহে চীরবাস। তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্রজের পাদমূলে লুণ্ঠিত। রামচন্দ্র বিবর্ণ ও কৃশ ভরতকে কষ্টে চিনিতে পারিলেন, অতি আদরে হাত ধরিয়া উঠাইয়া মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক অঙ্কে টানিয়া লইলেন; বলিলেন—"বৎস, তোমার এ বেশ কেন? তোমার এ বেশে বনে আসা যোগ্য নহে।"

ভরত জ্যেষ্ঠের পাদতলে লুটাইয়া বলিলেন, —"আমার জননী মহাঘোর নরকে পতিত হইতেছেন, আপনি তাহাকে রক্ষা করুন, আমি আপনার ভাই,—আপনার শিষ্য,—দাসানুদাস, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আপনি রাজ্যে আসিয়া অভিষিক্ত হউন।" বহু কথা, বহু বিতণ্ডা চলিল;—ভরত বলিলেন, "আমি চতুর্দ্দশবৎসর বনবাসী হইব, এ প্রতিশ্রুতিপালন আমার কর্ত্তব্য।" কোনরূপে রামকে আনিতে না পারিয়া ভরত অনশনব্রত ধারণ করিয়া কুটীরদ্বারে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। রামচন্দ্র এই অবস্থায়

সাদরে উঠাইয়া নিজের পাদুকা তাঁহাকে প্রদান করিলেন। জটা-ভার শোভান্বিত করিয়া ভ্রাতৃপাদরজে বিভূষিত পাদুকা তাঁহার মুকুটের স্থানীয় হইল। সহস্র ভূষণে যে শোভা দিতে অসমর্থ, এই পাদুকা সেই অপূর্ব্ব রাজশ্রী ভরতকে প্রদান করিল। ভরত বিদায়কালে বলিলেন, "রাজ্যভার এই পাদুকায় নিবেদন করিয়া চতুর্দ্দশবৎসর তোমার প্রতীক্ষায় থাকিব, সেই সময়ান্তে তুমি না আসিলে অগ্নিতে জীবন বিসর্জ্জন করিব।" অযোধ্যার সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া ভরত বলিলেন, "অযোধ্যা আর অযোধ্যা নাই, আমি এই সিংহহীন গুহায় প্রবেশ করিতে পারিব না।" নন্দিগ্রামে রাজ-ধানী প্রতিষ্ঠিত হইল, উহা রাজধানী নহে—ঋষির আশ্রম। সচিব-বৃন্দ জটাবল্কলপরিহিত ফলমূলাহারী—রাজার পার্শ্বে কি বলিয়া মহার্ঘ পরিচ্ছদ পরিয়া বসিবেন, তাঁহারা সকলে কষায়বস্ত্র পরিতে আরম্ভ করিলেন। সেই কাষায়বস্ত্রপরিহিত সচিববৃন্দ-পরিবৃত, ব্রত ও অনশনে কৃশাঙ্গ, ত্যাগী রাজকুমার পাদুকার উপর ছত্র ধরিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর রাজ্যপালন করিয়াছিলেন।

ভরতের এই বিষণ্ণ মূর্ত্তিখানি রামের চিত্তে শেলের মত বিদ্ধ হইয়াছিল। যখন সীতাকে হারাইয়া তিনি উন্মত্তবেশে পম্পাতীরে ঘুরিতেছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন,—"এই পম্পাতীরের রমণীয় দৃশ্যাবলী সীতার বিরহে ও ভরতের দুঃখ স্মরণ করিয়া আমার রম-ণীয় বোধ হইতেছে না।" আর একদিন লঙ্কায় রামচন্দ্র সুগ্রীবকে বলিয়াছিলেন, "বন্ধু, ভরতের মত ভ্রাতা জগতে কোথায় পাইব?"

রামচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগত হইলে ভরত স্বয়ং তাঁহার পদে সেই

পাদুকাদ্বয় পরাইয়া কৃতার্থ হইলেন এবং রামের পদে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "দেব, তুমি এই অযোগ্য করে যে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়াছিলে, তাহা গ্রহণ কর। চতুর্দ্দশ বৎসরে রাজকোষে সঞ্চিত অর্থ দশগুণ বেশী হইয়াছে।"

রামায়ণে যদি কোন চরিত্র ঠিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে তাহা একমাত্র ভরতের চরিত্র। সীতা লক্ষ্মণকে যে কটূক্তি করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষমার্হ নহে। রামচন্দ্রের বালিবধ ইত্যাদি অনেক কার্য্যই সমর্থন করা যায় না। লক্ষ্মণের কথা অনেক সময় অতি রুক্ষ ও দুর্বিনীত হইয়াছে। কৌশল্যা দশরথকে বলিয়াছিলেন, "কোন কোন জলজন্তু যেরূপ স্বীয় সন্তানকে ভক্ষণ করে, তুমিও সেইরূপ করিয়াছ।" কিন্তু ভরতের চরিত্রে কোন খুঁত নাই। পাদুকার উপর হেমচ্ছত্রধর জটাবল্কলধারী এই রাজর্ষির চিত্র রামায়ণে এক অদ্বিতীয় সৌন্দর্য্যপাত করিতেছে। দশরথ সত্যই বলিয়াছিলেন—

"রামাদপি হি তং মন্যে ধর্ম্মতো বলবত্তরম্।"

কৈকেয়ীর সহস্রদোষ আমরা ক্ষমার্হ মনে করি, যখন মনে হয়, তিনি এরূপ সুপুত্রের গর্ভধারিণী। আমরা নিষাদাধিপতি গুহকের সঙ্গে একবাক্যে বলিতে পারি—

"ধন্যস্ত্বং ন ত্বয়া তুল্যং পশ্যামি জগতীতলে।
অযত্নাদাগতং রাজ্যং যস্ত্বং ত্যক্তুমিহেচ্ছসি॥"

অযত্নাগত রাজ্য তুমি প্রত্যাখ্যান করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তুমি ধন্য, জগতে তোমার তুল্য কাহাকেও দেখা যায় না।

লক্ষ্মণ।

বালকাণ্ডে লিখিত হইয়াছে, লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের "প্রাণৈবাপরঃ" —অপর প্রাণের ন্যায়। ভরত ছাড়া আমরা রামকে কল্পনা করিতে পারি, এমন কি, সীতা ছাড়া রামচিত্র কল্পনা করিবার সুবিধাও কবিগুরু দিয়াছেন, কিন্তু লক্ষ্মণ ছাড়া রামচিত্র একান্ত অসম্পূর্ণ।

লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি কতকটা মৌন এবং ছায়ার ন্যায় অনুগামী! লক্ষ্মণ রামের প্রতি ভালবাসা কথায় জানাইবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন না, নিতান্ত কোনরূপ অবস্থার সঙ্কটে না পড়িলে তিনি তাঁহার হৃদয়ের সুগভীর স্নেহের আভাস দিতে ইচ্ছুক হইতেন না; বাধ্য হইয়া দুই-এক স্থলে তিনি ইঙ্গিতমাত্রে তাঁহার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অপরিসীম রামপ্রেম মৌনভাবেই আমাদিগের নিকট সর্ব্বত্র ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ভরত, সীতা এবং রামচন্দ্রও মনের আবেগ সংবরণ করিতে জানিতেন না; কিন্তু লক্ষ্মণ স্নেহসম্বন্ধে সংযমী—সে স্নেহ পরিপূর্ণ, অথচ তাহা আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই; এই মৌন স্নেহচিত্র আমাদিগকে সর্ব্বত্যাগী কষ্টসহিষ্ণু ভ্রাতৃভক্তির অশেষ কথা জানাইতেছে।

লক্ষ্মণ আজন্ম রামচন্দ্রের ছায়ার ন্যায় অনুগামী।

"ন চ তেন বিনা নিদ্রাং লভতে পুরুষোত্তমঃ।
মৃষ্টমন্নমুপানীতমশ্নাতি ন হি তং বিনা॥"

রামের কাছে না শুইলে তাঁহার রাত্রে ঘুম হয় না, রামের প্রসাদ ভিন্ন কোন উপাদেয় খাদ্যে তাঁহার তৃপ্তি হয় না।

"যদা হি হয়মারূঢ়ো মৃগয়াং যাতি রাঘবঃ।
অথৈনং পৃষ্ঠতোঽভ্যেতি সধনুঃ পরিপালয়ন্॥"

রাম যখন অশ্বারোহণে মৃগয়ায় যাত্রা করেন, অমনি ধনুর্হস্তে তাঁহার শরীর রক্ষা করিয়া বিশ্বস্ত অনুচর তাঁহার পিছনে পিছনে যাইতে থাকেন। যে দিন বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম রাক্ষসবধকল্পে নিবিড় বনপথে যাইতেছেন, সে দিনও কাকপক্ষধর লক্ষ্মণ সঙ্গে সঙ্গে। শৈশবদৃশ্যাবলীর এই সকল চিত্রের মধ্যে আত্মহারা লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তির ছবি মৌনভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রামের অভিষেকসংবাদে সকলেই কত সন্তোষপ্রকাশের জন্য ব্যস্ত হইলেন, কিন্তু লক্ষ্মণের মুখে আহ্লাদসূচক কথা নাই, নীরবে রামের ছায়ার ন্যায় লক্ষ্মণ পশ্চাদ্বর্ত্তী। কিন্তু রাম স্বল্পভাষী ভ্রাতার হৃদয় জানিতেন, অভিষেকসংবাদে সুখী হইয়া সর্ব্বপ্রথমেই লক্ষ্মণের কণ্ঠলগ্ন হইয়া বলিলেন,—

"জীবিতঞ্চাপি রাজ্যঞ্চ ত্বদর্থমভিকাময়ে।"—

আমি জীবন ও রাজ্য তোমার জন্যই কামনা করি। ভ্রাতার এই রূপ দুই একটি কথাই লক্ষ্মণের অপূর্ব্ব স্নেহের একমাত্র পুরস্কার ও পরম পরিতৃপ্তি। আমরা কল্পনানয়নে দেখিতে পাই, রামের এই স্নিগ্ধ আদরে "সুবর্ণচ্ছবি" লক্ষ্মণের গণ্ডদ্বয় নীরব প্রফুল্লতায় রক্তিমাভ হইয়া উঠিয়াছে!

কিন্তু এই মৌন স্বল্পভাষী যুবক, রামের প্রতি কেহ অন্যায়

করিলে, তাহা ক্ষমা করিতে জানিতেন না। যে দিন কৈকেয়ী অভিষেকব্রতোজ্জ্বল প্রফুল্ল রামচন্দ্রকে মৃত্যুতুল্য বনবাসাজ্ঞা শুনাইলেন, রামের মূর্ত্তি সহসা বৈরাগ্যের শ্রীতে ভূষিত হইয়া উঠিল, তিনি ঋষিবৎ নির্লিপ্তভাবে গুরুতর বনবাসাজ্ঞা মাথায় তুলিয়া লইলেন, অভিষেকসম্ভারের সমস্ত আয়োজন যেন তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল, সেই দিন সেই উৎকট মুহূর্ত্তেও তাঁহার আর কোন সঙ্গী ছিল না, তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে চিরসুহৃৎ ভক্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, বাল্মীকি দুইটি ছত্রে সেই মৌন চিত্রটি আঁকিয়াছেন—

"তং বাষ্পপরিপূর্ণাক্ষঃ পৃষ্ঠতোঽনুজগাম হ।
লক্ষ্মণঃ পরমক্রুদ্ধঃ সুমিত্রানন্দবর্দ্ধনঃ॥"

লক্ষ্মণ—অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বাষ্পপূর্ণাক্ষে ভ্রাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন।

এই অন্যায় আদেশ তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। রামচন্দ্র যাঁহাদিগকে অকুণ্ঠিতচিত্তে ক্ষমা করিয়াছেন, লক্ষ্মণ তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। রামের বনবাস লইয়া তিনি কৌশল্যার সম্মুখে অনেক বাগ্বিতণ্ডা করিয়াছিলেন, ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি সমস্ত অযোধ্যাপুরী নষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি রামের কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রশংসা করেন নাই—এই গর্হিত আদেশপালন ধর্ম্মসঙ্গত নহে, ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই তেজস্বী যুবক যখন দেখিতে পাইলেন, রামচন্দ্র একান্তই বনবাসে যাইবেন, তখন কোথা হইতে এক অপূর্ব্ব কোমলতা তাঁহাকে অধিকার

করিয়া বসিল; তিনি বালকের ন্যায় রামের পদযুগে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন—

"ঐশ্বর্য্যঞ্চাপি লোকানাং কাময়ে ন ত্বয়া বিনা।"

—অমরত্ব কিংবা ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যও আমি তোমা ভিন্ন আকাঙ্ক্ষা করি না। রামের পাদপীড়নপূর্ব্বক—উহা অশ্রুসিক্ত করিয়া নব-বধূটির ন্যায় সেই ক্ষাত্রতেজোদ্দীপিত মূর্ত্তি ফুলসম সুকোমল হইয়া সঙ্গে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। এই ভিক্ষা স্নেহসূচক দীর্ঘ বক্তৃতায় অভিব্যক্ত হয় নাই, অতি অল্প কথায় তিনি রামের সঙ্গী হইবার জন্য অনুমতি চাহিলেন, কিন্তু সেই অল্প কথায় স্নেহ-গভীর আত্মত্যাগী হৃদয়ের ছায়া পড়িয়াছে। রাম হাতে ধরিয়া তাঁহাকে তুলিয়া লইলেন, "প্রাণসম প্রিয়", "বশ্য", "সখা" প্রভৃতি স্নেহমধুর সম্ভাষণে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া বনযাত্রা হইতে প্রতি-নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ দুই একটি দৃঢ়কথায় তাঁহার অটল সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিলেন, "আপনি শৈশব হইতে আমার নিকট প্রতিশ্রুত, আমি আপনার আজন্মসহচর, আজ তাহার ব্যতিক্রম করিতে চাহিতেছেন কেন?"

লক্ষ্মণ সঙ্গে চলিলেন। এই আত্মত্যাগী দেবতার জন্য কেহ বিলাপ করিল না। যে দিন বিশ্বামিত্র রামকে লইয়া যাইবার জন্য দশরথের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সে দিন—

"ঊনষোড়শবর্ষো মে রামো রাজীবলোচনঃ।"

বলিয়া বৃদ্ধ রাজা ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তৎকনিষ্ঠ আর একটি রাজীবলোচন যে দুরন্তরাক্ষসবধকল্পে ভ্রাতার অনুবর্ত্তী

হইয়া চলিলেন, তজ্জন্য কেহ আক্ষেপ করেন নাই। আজ রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বনে চলিয়াছেন, অযোধ্যার যত নয়নাশ্রু, তাহা রহিয়া রহিয়া রামসীতার জন্য বর্ষিত হইতেছে। সীতার পাদপদ্মের অলক্তকরাগ মুছিয়া যাইবে, তাহা কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হইবে,—মহার্ঘশয়নোচিত রামচন্দ্র বৃক্ষমূলে পাংশুশয্যায় শুইয়া মত্তমাতঙ্গের ন্যায় ধূলিলুণ্ঠিতদেহে প্রাতে গাত্রোত্থান করিবেন, যিনি বন্দিগণের সুশ্রাব্যগীতিমুখর গগনস্পর্শী প্রাসাদে বাস করিতে অভ্যস্ত—তিনি কেমন করিয়া চীরবাস পরিয়া বনে বনে তরুতল খুঁজিয়া বেড়াইবেন—এই আক্ষেপোক্তি দশরথ-কৌশল্যা হইতে আরম্ভ করিয়া অযোধ্যাবাসী প্রত্যেকের কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছিল। প্রজাগণ রথের চক্র ধরিয়া সুমন্ত্রকে বলিয়াছিল—

"সংযচ্ছ বাজিনাং রশ্মীন্ সূত যাহি শনৈঃ শনৈঃ।
মুখং দ্রক্ষ্যামো রামস্য দুর্দর্শনো ভবিষ্যতি॥"

'সারথি, অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া ধীরে ধীরে চল, আমরা রামের মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া লই, আর আমরা উহা সহজে দেখিতে পাইব না।' কিন্তু লক্ষ্মণের জন্য কেহ আক্ষেপ করেন নাই, এমন কি, সুমিত্রাও বিদায়কালে পুত্রের কণ্ঠলগ্ন হইয়া ক্রন্দন করেন নাই, তিনি দৃঢ় অথচ স্নেহার্দ্রকণ্ঠে লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন—

"রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম্॥"

'যাও বৎস, স্বচ্ছন্দমনে বনে যাও—রামকে দশরথের ন্যায় দেখিও, সীতাকে আমার ন্যায় মনে করিও এবং বনকে অযোধ্যা

বলিয়া গণ্য করিও।' মাতার চক্ষুর অশ্রুবিন্দু লক্ষ্মণ পাইলেন না, বরং সুমিত্রা তাঁহাকে যেন কর্ত্তব্যপালনের জন্য আগ্রহসহকারে ত্বরান্বিত করিয়া দিলেন—

"সুমিত্রা গচ্ছ গচ্ছেতি পুনঃপুনরুবাচ তম্।"

সুমিত্রা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ "যাও যাও" এই কথা বলিতে লাগিলেন।

মৌন সন্ন্যাসী আত্মীয় সুহৃদ্‌বর্গের উপেক্ষা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তিনি মনেও করেন নাই, রামচন্দ্রের জন্য যে শোকোচ্ছ্বাস, তাহার মধ্যেই তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি কাহারও নিকটে বিলাপ প্রত্যাশা করেন নাই, রামপ্রেমে তাঁহার নিজের সত্তা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

আরণ্যজীবনের যাহা কিছু কঠোরতা, তাহার সমধিক ভাগ লক্ষ্মণের উপর পড়িয়াছিল,—কিংবা তাহা তিনি আহ্লাদ সহকারে মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন। গিরিসানুদেশের পুষ্পিত বন্যতরুরাজি হইতে কুসুমচয়ন করিয়া রামচন্দ্র সীতার চূর্ণকুন্তলে পরাইতেন; গৈরিকরেণু দ্বারা সীতার সুন্দর ললাটে তিলক রচনা করিয়া দিতেন; পদ্ম তুলিয়া সীতার সহিত মন্দাকিনীনীরে অবগাহন করিতেন, কিংবা গোদাবরীতীরস্থ বেতসকুঞ্জে সীতার উৎসঙ্গে মস্তক রক্ষা করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেন; আর এদিকে মৌন সন্ন্যাসী খনিত্র দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিতেন, কখনও পরশুহস্তে শালশাখা কর্ত্তন করিতেন, কখনও অস্ত্রশস্ত্র এবং সীতার পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদিতে পূর্ণ বিপুল বংশ-

চিত্রকূটে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা

পেটিকা হস্তে লইয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাত্রা করিতেন, কখনও বা মহিষ ও বৃষের করীষ সংগ্রহ করিয়া অগ্নি জ্বালিবার ব্যবস্থা করিতেন। একদিন দেখিতে পাই, শীতকালের তুষার মলিন জ্যোৎস্নায় শেষরাত্রিতে যবগোধূমাচ্ছন্ন বনপন্থার নীল-শেষ নলিনী-শোভিত সরসীতে কলস লইয়া তিনি জল তুলিতেছেন। অন্য একদিন দেখিতে পাই, চিত্রকূটপর্ব্বতের পর্ণশালা হইতে সরসীতটে যাইবার পথটি চিহ্নিত করিবার জন্য তিনি পথে পথে উচ্চ তরুশাখায় চীরখণ্ড বদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন। কখনও বা তিনি কোমল দর্ভাঙ্কুর ও বৃক্ষপর্ণ দ্বারা রামের শয্যা প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, কখনও বা দেখিতে পাই তিনি কালিন্দী উত্তীর্ণ হইবার জন্য বৃহৎ কাষ্ঠগুলি শুষ্ক বন্য ও বেতসলতা দ্বারা সুসংবদ্ধ করিয়া মধ্যভাগে জম্বুশাখা দ্বারা সীতার উপবেশন জন্য সুখাসন রচনা করিতেছেন। এই সংযমী স্নেহবীর ভ্রাতৃসেবায় তাঁহার নিজসত্তা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। রামচন্দ্র পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন—"এই সুন্দর তরুরাজি-পূর্ণ প্রদেশে পর্ণশালারচনার জন্য একটি স্থান খুঁজিয়া বাহির করিয়া লও।" লক্ষ্মণ বলিলেন, "আপনি যে স্থানটি ভালবাসেন, তাহাই দেখাইয়া দিন, সেবকের উপর নির্ব্বাচনের ভার দিবেন না।" প্রভুসেবায় এরূপ আত্মহারা ভৃত্য,—এমন আর কোথায় দেখিয়াছেন। রামচন্দ্র স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলে লক্ষ্মণ ভূমির সমতা সম্পাদন করিয়া খনিত্রহস্তে মৃত্তিকাখননে প্রবৃত্ত হইলেন।

আর এক দিনের দৃশ্য মনে পড়ে,—গভীর অরণ্যে চারিদিকে

কৃষ্ণসর্প বিচরণ করিতেছে, গৃহহারা বিপন্ন পথিকত্রয় রাত্রিবাসের জন্য জঙ্গলের নিভৃতে বৃক্ষনিম্নে শুইয়া আছেন, সীতার সুন্দর মুখখানি অনশন ও পর্য্যটনে একটু হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে। রামচন্দ্রের এই দুঃখময়ী রজনীর কষ্ট অসহ্য হইল,—তিনি লক্ষ্মণকে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবার জন্য বারংবার পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, "এ কষ্ট আমার এবং সীতারই হউক, তুমি ফিরিয়া যাও, শোকের অবস্থায় সান্ত্বনাদান করিয়া আমার মাতাদিগকে পালন করিও।" লক্ষ্মণ স্বীয়-স্নেহ-সম্বন্ধে বেশী কথা কহিতে জানিতেন না, রামের এবংবিধ কাতরোক্তিতে দুঃখিত হইয়া বলিলেন—

"ন হি তাতং ন শত্রুঘ্নং ন সুমিত্রাং পরন্তপ।
দ্রষ্টু মিচ্ছেয়মদ্যাহং স্বর্গঞ্চাপি ত্বয়া বিনা॥"

'আমি পিতা, সুমিত্রা, শত্রুঘ্ন, এমন কি স্বর্গও তোমাকে ছাড়িয়া দেখিতে ইচ্ছা করি না।"

কবন্ধ মরিল, জটায়ু মরিলেন; আমরা দেখিতে পাই, লক্ষ্মণ নিঃশব্দে সমাধিস্থল খনন করিয়া কাষ্ঠ আহরণপূর্ব্বক কবন্ধ ও জটায়ুর সৎকার করিতেছেন। দিবারাত্র তাঁহার বিশ্রাম ছিল না—এই ভ্রাতৃসেবাই তাঁহার জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল। বনে আসিবার সময় তাহাই তিনি বলিয়া আসিয়াছিলেন—

"ভবাংস্ত সহ বৈদেহ্যা গিরিসানুষু রংস্যসে।
অহং সর্ব্বং করিষ্যামি জাগ্রতঃ স্বপতশ্চ তে।
ধনুরাদায় সগুণং খনিত্রপিটকাধরঃ॥"

"দেবী জানকীর সঙ্গে আপনি গিরিসানুদেশে বিহার করিবেন, জাগরিত বা নিদ্রিতই থাকুন, আপনার সকল কর্ম্ম আমিই করিয়া দিব। খনিত্র, পিটক এবং ধনু হস্তে আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিব।"

বনবাসের শেষ বৎসর বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল; রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। সীতার শোকে রাম ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া পড়িলেন, ভ্রাতার এই দারুণ কষ্ট দেখিয়া লক্ষ্মণও পাগলের মত সীতাকে ইতস্ততঃ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রামের অনুজ্ঞায় তিনি বারংবার গোদাবরীর তীরভূমি খুঁজিয়া আসিলেন। এইমাত্র গোদাবরীতীর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন, রাম তখনই আবার বলিলেন—

"শীঘ্রং লক্ষ্মণ জানীহি গত্বা গোদাবরীং নদীম্।
অপি গোদাবরীং সীতা পদ্মান্যানয়িতুং গতা॥"

পুনরায় গোদাবরীর তটদেশে যাইয়া লক্ষ্মণ সীতাকে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্ধান না পাইয়া ভয়ে ভয়ে রামের নিকট উপস্থিত হইয়া আর্ত্তস্বরে বলিলেন—

"কং নু সা দেশমাপন্না বৈদেহী ক্লেশনাশিনী।"

'কোন্ দেশে ক্লেশনাশিনী বৈদেহী গিয়াছেন—তাহা বুঝিতে পারিলাম না'—

"নৈতাং পশ্যামি তীর্থেষু ক্রোশতো ন শৃণোতি মে।"

'গোদাবরীর অবতরণস্থানসমূহের কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না—ডাকিলাম, কোন উত্তর পাইলাম না।'

লক্ষ্মণস্থ বচঃ শ্রুত্বা দীনঃ সন্তাপমোহিতঃ।
রামঃ সমভিচক্রাম স্বয়ং গোদাবরীং নদীম্॥"

লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া ম্রিয়মাণচিত্তে রাম স্বয়ং সেই গোদাবরীর অভিমুখে ছুটিয়া গেলেন।

ভ্রাতার এই উদ্দাম শোক দেখিয়া লক্ষ্মণ যেরূপ কষ্ট পাইতেছিলেন, তাহা অননুভবনীয়। কত করিয়া তিনি রামকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছেন, রাম কিছুতেই শান্ত হইতেছেন না। লক্ষ্মণের কণ্ঠলগ্ন হইয়া রাম বারংবার বলিতেছেন—

"হা লক্ষ্মণ মহাবাহো পশ্যসি ত্বং প্রিয়াং ক্বচিৎ॥"

'লক্ষ্মণ, তুমি কি সীতাকে কোথাও দেখিতে পাইতেছ?' এই শোকাকুল কণ্ঠের আর্ত্তিতে লক্ষ্মণের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিত, তাঁহার মুখ শুকাইয়া যাইত।

দনুনামক শাপগ্রস্ত যক্ষের নির্দ্দেশানুসারে রাম লক্ষ্মণের সহিত পম্পাতীরে সুগ্রীবের সন্ধানে গেলেন। রাম কখনও বেগে পথপর্য্যটন করেন, কখনও মূর্চ্ছিত হইয়া বসিয়া পড়েন, কখনও "সীতা সীতা" বলিয়া আকুলকণ্ঠে ডাকিতে থাকেন, কখনও "হা দেবি, একবার এস, তোমার শূন্য পর্ণশালার অবস্থা দেখিয়া যাও" এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিলুপ্তসংজ্ঞ হইয়া পড়েন, কখনও পম্পানীরবর্ত্তি-পদ্মকোষ-নিষ্ক্রান্ত-পবনস্পর্শে উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠেন,—

"নিশ্বাস ইব সীতায়া বাতি বায়ুর্মনোহরঃ।"

সজলনেত্রে চিরসুহৃৎ চিরসেবক লক্ষ্মণ রামকে এই অবস্থায় যখন

পম্পাতীরে লইয়া আসিলেন, তখন হনুমান্ সুগ্রীবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হনুমান্ সম্ভ্রম ও আদরের সহিত বলিলেন, "আপনারা পৃথিবীজয়ের শক্তিসম্পন্ন, আপনারা চীর ও বল্কল ধারণ করিয়াছেন কেন? আপনাদের বৃত্তায়িত মহাবাহু সর্ব্ব-ভূষণে ভূষিত হইবার যোগ্য, সে বাহু ভূষণহীন কেন?" এই আদরের কণ্ঠস্বর শুনিয়া লক্ষ্মণের চিররুদ্ধ দুঃখ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। যিনি চিরদিন মৌনভাবে স্নেহার্দ্র হৃদয় বহন করিয়া আসিয়াছেন, আজ তিনি স্নেহের ছন্দ ও ভাষা রোধ করিতে পারিলেন না। পরিচয় প্রদানের পর তিনি বলিলেন—"দনুর নির্দ্দেশে আজ আমরা সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছি। যে রাম শরণাগতদিগকে অগণিত বিত্ত অকুণ্ঠিতচিত্তে দান করিয়াছেন, সেই জগৎপূজ্য রাম আজ বানরাধিপতির শরণ পাইবার জন্য এখানে উপস্থিত। ত্রিলোক-বিশ্রুতকীর্ত্তি দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার গুরু রামচন্দ্র স্বয়ং বানরাধিপতির শরণ লইবার জন্য এখানে আসিয়াছেন। সর্ব্বলোক যাঁহার আশ্রয়লাভে কৃতার্থ হইত, যিনি প্রজাপুঞ্জের রক্ষক ও পালক ছিলেন, আজ তিনি আশ্রয়ভিক্ষা করিয়া সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত। তিনি শোকাভিভূত ও আর্ত্ত, সুগ্রীব অবশ্যই প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে শরণ দান করিবেন।"—বলিতে বলিতে লক্ষ্মণের চিরনিরুদ্ধ অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তিনি কাঁদিয়া মৌনী হইলেন। রামের দুরবস্থাদর্শনে লক্ষ্মণ একান্তরূপে অভিভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার দৃঢ়চরিত্র আর্দ্র ও করুণ হইয়া পড়িয়াছিল।

এই নিত্য দুঃখসহায় ভৃত্য, সখা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামের প্রাণ-প্রিয় ছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। অশোকবনে হনুমানের নিকট সীতা বলিয়াছিলেন, "ভ্রাতা লক্ষ্মণ আমা অপেক্ষা রামের নিয়ত প্রিয়তর।" রাবণের শেলে বিদ্ধ লক্ষ্মণ যেদিন যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেদিন আমরা দেখিতে পাই, আহত শাবককে ব্যাঘ্রী যেরূপ রক্ষা করে, রাম কনিষ্ঠকে সেইরূপ আগুলিয়া বসিয়া আছেন;—রাবণের অসংখ্য শর রামের পৃষ্ঠদেশ ছিন্ন ভিন্ন করিতেছিল, সে দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া রাম লক্ষ্মণের প্রতি সজল চক্ষু ন্যস্ত করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতেছিলেন। বানরসৈন্য লক্ষ্মণের রক্ষাভার গ্রহণ করিলে তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং রাবণ পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া চলিয়া গেলে মৃতকল্প ভ্রাতাকে অতি সুকোমল-ভাবে আলিঙ্গন করিয়া রাম বলিলেন—"তুমি যেরূপ আমাকে বনে অনুগমন করিয়াছিলে, আজ আমিও তেমনি তোমাকে যমালয়ে অনুগমন করিব,' তোমাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিতে পারিব না। সীতার মত স্ত্রী অনেক খুঁজিলে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তোমার মত ভাই, মন্ত্রী ও সহায় পাওয়া যাইবে না। দেশে দেশে স্ত্রী ও বন্ধু পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এমন দেশ দেখিতে পাই না, যেখানে তোমার মত ভাই জুটিবে। এখন উঠ, নয়ন উন্মীলন করিয়া আমায় একবার দেখ; আমি পর্ব্বতে বা বন-মধ্যে শোকার্ত্ত, প্রমত্ত বা বিষণ্ণ হইলে, তুমিই প্রবোধবাক্যে আমায় সান্ত্বনা দিতে, এখন কেন এইরূপ নীরব হইয়া আছ?"

রামের আজ্ঞাপালনে লক্ষ্মণ কোনকালে দ্বিরুক্তি করেন নাই,

ন্যায়সঙ্গত হউক বা না হউক, লক্ষ্মণ সর্ব্বদা মৌনভাবে তাহা পালন করিয়াছেন। রাম সীতাকে বিপুল সৈন্যসংঘের মধ্য দিয়া শিবিকা ত্যাগ করিয়া পদব্রজে আসিতে আজ্ঞা করিলেন। শত শত দৃষ্টির গোচরীভূত হইয়া সীতা লজ্জায় যেন মরিয়া যাইতেছিলেন, ব্রীড়াময়ীর সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছিল। লক্ষ্মণ এই দৃশ্য দেখিয়া ব্যথিত হইলেন, কিন্তু রামের কার্য্যের প্রতিবাদ করিলেন না। যখন সীতা অগ্নিতে প্রাণবিসর্জ্জন দিতে কৃতসংকল্পা হইয়া লক্ষ্মণকে চিতা প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন,—তখন লক্ষ্মণ রামের অভিপ্রায় বুঝিয়া সজলচক্ষে চিতা প্রস্তুত করিলেন, কিন্তু কোন প্রতিবাদ করিলেন না। ভ্রাতৃ-স্নেহে তিনি স্বীয়-অস্তিত্ব-শূন্য হইয়া গিয়াছিলেন। ভরতের, এমন কি সীতারও, মৃদু অথচ তেজোব্যঞ্জক ব্যক্তিত্ব তাঁহাদের সুগভীর ভালবাসার মধ্যেও আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, কিন্তু রামের প্রতি লক্ষ্মণের স্নেহ সম্পূর্ণরূপে আত্মহারা। ভরত রামচন্দ্রের জন্য যে সকল কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রাণে আঘাত দেয়,—তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে ঐরূপ আত্মত্যাগ আমাদের নিকট অপূর্ব্ব পদার্থ বলিয়া বোধ হয়; ভরত স্বর্গের দেবতার ন্যায়, তাঁহার ক্রিয়া-কলাপ ঠিক যেন পৃথিবীবাসীর নহে, উহা সর্ব্বদাই ভাবের এক উচ্চগ্রামে আমাদিগের মনোযোগ সবলে আকর্ষণ করিয়া রাখে। কিন্তু লক্ষ্মণের আত্মত্যাগ এত সহজভাবে হইয়া আসিয়াছে, উহা বায়ু ও জলের মত এত সহজপ্রাপ্য যে, অনেক সময় ভরতের আত্মত্যাগের পার্শ্বে লক্ষ্মণের খনিত্রদ্বারা মৃত্তিকাখনন প্রভৃতি

সেবাবৃত্তির মধ্যে আমরা তাঁহার সুগভীর প্রেমের গুরুত্ব অনুভব করিতে ভুলিয়া যাই। অত্যন্ত সহজে প্রাপ্ত বলিয়া যেন উহা উপেক্ষা পাইয়া থাকে। তথাপি ইহা স্থির যে, লক্ষ্মণ ভিন্ন রামকে আমরা একেবারেই কল্পনা করিতে পারি না। তিনি রামের প্রাণ ও দেহের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছিলেন। দীর্ঘ রজনীর পরে অকস্মাৎ তরুণ অরুণালোকে যেরূপ জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে,—ধরাবাসিগণ সেই স্বর্গভ্রষ্ট আলোকচ্ছটায় পুলকে উন্মত্ত হইয়া উঠে, ভরতের ভ্রাতৃপ্রীতি কতকটা সেইরূপ,—কৈকয়ীর ষড়্যন্ত্র ও রামবনবাসাদির পরে ভরতের অচিন্তিতপূর্ব্ব প্রীতি বিচ্ছুরিত হইয়া আমাদিগকে সহসা সেইরূপ চমৎকৃত করিয়া তুলে, আমরা ঠিক যেন ততটা প্রত্যাশা করি না। কিন্তু লক্ষ্মণের প্রেম আমাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় বায়ু-প্রবাহ, এই বিশাল অপরিসীম স্নেহতরঙ্গ আমাদিগকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে, অথচ প্রতিক্ষণে আমরা ইহা ভুলিয়া যাইতেছি। লক্ষ্মণ রামকে বলিয়াছিলেন—"জল হইতে উদ্ধৃত মীনের ন্যায় আপনাকে ছাড়িয়া আমি এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারিব না।" এই অসীম স্নেহের তিনি কোন মূল্য চান নাই, ইহা আপনিই আপনার পরম পরিতোষ, ইহা আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ, ইহা প্রত্যাশী নহে, ইহা দাতা। কখন বহুকৃচ্ছ্রসাধনে অবসন্ন লক্ষ্মণকে রাম একটি স্নেহের কথা বলিয়াছেন, কিংবা একবার আলিঙ্গন দিয়াছেন, লক্ষ্মণের নেত্র-প্রান্তে একটি পুলকাশ্রু ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তিনি রামের কাছে তাহা প্রত্যাশা করিয়া অপেক্ষা করেন নাই।

লক্ষ্মণের চরিত্রের একদিক্ মাত্র প্রদর্শিত হইল, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের আর একটা দিক্ আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, লক্ষ্মণ বিশেষ তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন ছিলেন না। তিনি অনুগত ভ্রাতা ছিলেন সত্য, কিন্তু হয় ত রাম ভিন্ন তাঁহার পক্ষে নিজেকে হারাইয়া ফেলিবার আশঙ্কা ছিল। চিরদিন রামের বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিয়াছেন, সহসা একাকী সংসারের পথ পর্য্যটন করা তাঁহার পক্ষে দুরূহ হইত, এইজন্যই তিনি রামগতপ্রাণ হইয়া বনগমন করিয়াছিলেন। এ কথা ত মানিবই না, বরং ভাল করিয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, লক্ষ্মণই রামায়ণে পুরুষকারের একমাত্র জীবন্ত চিত্র। তাঁহার বুদ্ধির সঙ্গে রামের বুদ্ধির যে সর্ব্বদাই ঐক্য হইয়াছে, তাহা নহে, পরন্তু যে স্থানে ঐক্য না হইত, সে স্থানে তিনি স্বীয় বুদ্ধিকে রামের প্রতিভার নিকট হতবল হইতে দেন নাই।

বনবাসাজ্ঞা তাঁহার নিকট অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া বোধ হইয়াছিল এবং রামের পিতৃ-আদেশ-পালন তিনি ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। রাম লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন, "তুমি কি এই কার্য্য দৈবশক্তির ফল বলিয়া স্বীকার করিবে না? আরব্ধ কার্য্য নষ্ট করিয়া যদি কোন অসংকল্পিত পথে কার্য্যপ্রবাহ প্রবর্ত্তিত হয়, তবে তাহা দৈবের কর্ম্ম বলিয়া মনে করিবে। দেখ, কৈকেয়ী চিরদিনই আমাকে ভরতের ন্যায় ভালবাসিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় গুণশালিনী মহৎকুলজাতা রাজপুত্রী আমাকে পীড়াদান করিবার জন্য ইতর ব্যক্তির ন্যায় এইরূপ প্রতিশ্রুতিতে রাজাকে কেনই বা

আবদ্ধ করিবেন? ইহা স্পষ্ট দৈবের কর্ম্ম, ইহাতে মানুষের কোন হাত নাই।" লক্ষ্মণ উত্তরে বলিলেন, "অতি দীন ও অশক্ত ব্যক্তিরাই দৈবের দোহাই দিয়া থাকে, পুরুষকার দ্বারা যাঁহারা দৈবের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন, তাঁহারা আপনার ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়েন না। মৃদু ব্যক্তিরাই সর্ব্বদা নির্যাতন প্রাপ্ত হন— "মৃদুর্হি পরিভূয়তে।" ধর্ম্ম ও সত্যের ভাণ করিয়া পিতা যে ঘোরতর অন্যায় করিতেছেন, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না? আপনি দেবতুল্য, ঋজু ও দান্ত এবং রিপুরাও আপনার প্রশংসা করিয়া থাকে। এমন পুত্রকে তিনি কি অপরাধে বনে তাড়াইয়া দিতেছেন? আপনি যে ধর্ম্ম পালন করিতে ব্যাকুল, ঐ ধর্ম্ম আমার নিকট নিতান্ত অধর্ম্ম বলিয়া মনে হয়। স্ত্রীর বশীভূত হইয়া নিরপরাধ পুত্রকে বনবাস দেওয়া—ইহাই কি সত্য, ইহাই কি ধর্ম্ম? আমি আজই বাহুবলে আপনার অভিষেক সম্পাদন করিব। দেখি, কাহার সাধ্য আমার শক্তি প্রতিরোধ করে? আজ পুরুষকারের অঙ্কুশ দিয়া উদ্দাম দৈবহস্তীকে আমি স্ববশে আনিব। যাহা আপনি দৈবসংজ্ঞায় অভিহিত করিতেছেন, তাহা আপনি অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তবে কি নিমিত্ত তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর দৈবের প্রশংসা করিতেছেন?" সাশ্রুনেত্র লক্ষ্মণ এই সকল উক্তির পর—

"হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয্যাসক্তমানসম্।"

বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। রাম তখন হস্তধারণ করিয়া তাঁহার ক্রোধপ্রশমনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এই গর্হিত-আদেশ-পালন

যে ধর্ম্মসঙ্গত, ইহা তিনি কোনক্রমেই লক্ষ্মণকে বুঝাইতে পারেন নাই। লঙ্কাকাণ্ডে মায়াসীতার মস্তক দর্শনে শোকাকুল রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণ বলিয়াছিলেন—"হর্ষ, কাম, দর্প, ক্রোধ, শান্তি ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, এই সমস্তই অর্থের আয়ত্ত। আমার এই মত, ইহাই ধর্ম্ম; কিন্তু আপনি সেই অর্থমূলক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সমূলে ধর্ম্মলোপ করিয়াছেন। আপনি পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বনবাসী হওয়াতেই আপনার প্রাণাধিকা পত্নীকে রাক্ষসেরা অপহরণ করিয়াছে।" এই প্রখরব্যক্তিত্বশালী যুবক শুধু স্নেহগুণেই একান্তরূপে ব্যক্তিত্বহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ভরতের চরিত্র রমণীজনোচিত কোমল মধুরতায় ভূষিত, উহা সাত্ত্বিক বৃত্তির উপর অধিষ্ঠিত। রামের মত বলশালী চরিত্র রামায়ণে আর নাই, কিন্তু সময়-বিশেষে রাম দুর্ব্বল ও মৃদুভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। রামচরিত্র বড় জটিল। কিন্তু লক্ষ্মণের চরিত্রে আদ্যন্ত পুরুষকারের মহিমা দৃষ্ট হয়। উহাতে ভরতের মত করুণরসের স্নিগ্ধতা ও স্ত্রীলোকসুলভ খেদমুখর কোমলতা নাই। উহা সতত দৃঢ়, পুরুষোচিত ও বিপদে নির্ভীক। লক্ষ্মণ অবস্থার কোন বিপর্য্যয়েই নমিত হইয়া পড়েন নাই। বিরাধরাক্ষসের হস্তে সীতাকে নিঃসহায়ভাবে পতিত দেখিয়া রামচন্দ্র "হায়, আজ মাতা কৈকেয়ীর আশা পূর্ণ হইল" বলিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণ ভ্রাতাকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় নিশ্বাসত্যাগ করিয়া বলিলেন—"ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রান্ত হইয়া আপনি কেন অনাথের ন্যায় পরিতাপ করিতেছেন? আসুন, আমরা রাক্ষসকে বধ করি।"

শেলবিদ্ধ লক্ষ্মণ পুনর্জীবন লাভ করিয়া যখন দেখিতে পাইলেন, রাম তাঁহার শোকে অধীর হইয়া সজলচক্ষে স্ত্রীলোকের মত বিলাপ করিতেছেন, তখন তিনি সেই কাতর অবস্থাতেই রামকে এরূপ পৌরুষহীন মোহপ্রাপ্তির জন্য তিরস্কার করিয়াছিলেন। বিরহের অবস্থায় রামের একান্ত বিহ্বলতা দেখিয়া তিনি ব্যথিতচিত্তে রামকে কত উপদেশ দিয়াছিলেন—তাহা একদিকে যেমন সুগভীর ভালবাসার ব্যঞ্জক,—অপর দিকে সেইরূপ তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তাসূচক। "আপনি উৎসাহশূন্য হইবেন না", "আপনার এরূপ দৌর্ব্বল্যপ্রদর্শন উচিত নহে", পুরুষকার অবলম্বন করুন" ইত্যাদিরূপ নানাবিধ স্নেহের গঞ্জনা করিয়া তিনি একদিন বলিয়াছিলেন—"দেবগণের অমৃতলাভের ন্যায় বহু তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া মহারাজ দশরথ আপনাকে লাভ করিয়াছিলেন, সে সকল কথা আমি ভরতের মুখে শুনিয়াছি—আপনি তপস্যার ফলস্বরূপ। যদি বিপদে পড়িয়া আপনার ন্যায় ধর্ম্মাত্মা সহ্য করিতে না পারেন, তবে অল্পসত্ব ইতর ব্যক্তিরা কিরূপে সহ্য করিবে?"

রামের প্রতি জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক, যে কেহ অন্যায় করিয়াছে, লক্ষ্মণ তাহা ক্ষমা করেন নাই, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দশরথের গুণরাশি তাঁহার সমস্তই বিদিত ছিল, ক্রোধের উত্তেজনায় তিনি যাহাই বলুন না কেন, দশরথ যে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন, এ কথাও তিনি পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি দশরথকে মনে মনে ক্ষমা

করেন নাই। সুমন্ত্র বিদায়কালে যখন লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমার, পিতৃসকাশে আপনার কিছু বক্তব্য আছে কি?" তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, "রাজাকে বলিও, রামকে তিনি কেন বনে পাঠাইলেন, নিরপরাধ জ্যেষ্ঠপুত্রকে কেন পরিত্যাগ করিলেন, তাহা আমি বহু চিন্তা করিয়াও বুঝিতে পারি নাই। আমি মহারাজের চরিত্রে পিতৃত্বের কোন নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি না। আমার ভ্রাতা, বন্ধু, ভর্ত্তা ও পিতা, সকলই রামচন্দ্র।"—

"অহং তাবন্মহারাজে পিতৃত্বং নোপলক্ষয়ে।
ভ্রাতা ভর্ত্তা চ বন্ধুশ্চ পিতা চ মম রাঘবঃ॥"

ভরতের প্রতি তাঁহার গভীর সন্দেহ ছিল। কৈকয়ীর পুত্র ভরত যে মাতার ভাবে অনুপ্রাণিত হইবেন, এ সম্বন্ধে তাঁহার অটল ধারণা ছিল, কেবল রামের ভর্ৎসনার ভয়ে তিনি ভরতের প্রতি কঠোরবাক্যপ্রয়োগে নিবৃত্ত থাকিতেন। কিন্তু যখন জটাবদ্ধকেশকলাপ অনশনকৃশ ভরত রামের চরণপ্রান্তে পড়িয়া ধূলিলুণ্ঠিত হইলেন, তখন লক্ষ্মণ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া সলজ্জ স্নেহপরিতাপে ম্রিয়মাণ হইলেন। একদিন শীতকালের রাত্রে বড় তুষার পড়িতেছিল, শীতাধিক্যে পক্ষিগণ কুলায়ে গুণ্ঠিত হইয়াছিল, ভরতের জন্য সেই সময় লক্ষ্মণের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তিনি রামকে বলিলেন—"এই তীব্র শীত সহ্য করিয়া ধর্ম্মাত্মা ভরত আপনার ভক্তির তপস্যা পালন করিতেছেন। রাজ্য, ভোগ, মান, বিলাস, সমস্ত ত্যাগ করিয়া নিয়তাহারী ভরত এই বিষম শীতকালের রাত্রিতে মৃত্তিকায় শয়ন করিতেছেন। পারিব্রজ্যের নিয়ম

পালন করিয়া প্রত্যহ শেষরাত্রিতে ভরত সরযূতে অবগাহন করিয়া থাকেন। চিরসুখোচিত রাজকুমার শেষরাত্রের তীব্র শীতে কিরূপে সরযূতে স্নান করেন।" এই লক্ষ্মণই পূর্ব্বে—

"ভরতস্য বধে দোষং নাহং পশ্যামি কঞ্চন।"

বলিয়া ক্রোধপ্রকাশ করিয়াছিলেন। যেদিন বুঝিতে পারিলেন, তিনি বনে বনে ঘুরিয়া রামের যেরূপ সেবায় নিরত, অযোধ্যার মহাসমৃদ্ধির মধ্যে বাস করিয়াও ভরত রামভক্তিতে সেইরূপ কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছেন, সেই দিন হইতে তাঁহার স্বর এইরূপ স্নেহার্দ্র ও বিনম্র হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তিনি কৈকেয়ীকে কখনই ক্ষমা করেন নাই, রামের নিকট একদিন বলিয়াছিলেন— "দশরথ যাঁহার স্বামী, সাধু ভরত যাঁহার পুত্র, সেই কৈকেয়ী এরূপ নিষ্ঠুর হইলেন কেন?"

লক্ষ্মণের ক্ষত্রিয়বৃত্তিটা একটু অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকাশ পাইত। তিনি রামের প্রতি অন্যায়কারীদিগের প্রসঙ্গে সহসা অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিতেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, কাহাকেও তিনি এই অপরাধে ক্ষমা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

শরৎকালে অসন ও সপ্তপর্ণের ফুলরাশি ফুটিয়া উঠিল, রক্তিমাভ কোবিদার বিকশিত হইল,—মাল্যবান্ পর্ব্বতের উপকণ্ঠে তরঙ্গিণীরা মন্দগতি হইল, কুসুমশোভী সপ্তচ্ছদ-বৃক্ষকে গীতশীল ষট্‌পদগণ ঘিরিয়া ধরিল, গিরিসানুদেশে বন্ধুজীবের শ্যামাভ ফল দেখা দিতে লাগিল। বর্ষার চারিটি মাস বিরহী রামচন্দ্রের নিকট শতবৎসরের ন্যায় দীর্ঘ বোধ হইয়াছিল। শরৎকালে নদীগুলি

শীর্ণ হইলে বানরবাহিনীর সীতাকে সন্ধান করা সহজ হইবে, সুতরাং—

"সুগ্রীবস্য নদীনাঞ্চ প্রসাদমভিকাঙ্ক্ষয়ন্।"

সুগ্রীব ও নদীকুলের প্রসাদ আকাঙ্ক্ষা করিয়া রামচন্দ্র শরৎ-কালের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সেই শরৎকাল উপস্থিত হইল, কিন্তু প্রতিশ্রুতির অনুযায়ী উদ্যোগের কোন চিহ্ন না পাইয়া রাম সুগ্রীবের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন,—গ্রাম্যসুখে রত মূর্খ সুগ্রীব উপকার পাইয়া প্রত্যুপকারে অবহেলা করিতেছে। লক্ষ্মণকে তিনি সুগ্রীবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন—বন্ধুকে স্বীয় কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া উদ্যোগে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য যে সকল কথা কহিয়া দিলেন, তন্মধ্যে ক্রোধসূচক কয়েকটি কথা ছিল—

"ন স সঙ্কুচিতঃ পন্থা যেন বালী হতো গতঃ।
সময়ে তিষ্ঠ সুগ্রীব মা বালিপথমন্বগাঃ॥"

'যে পথে বালী গিয়াছে, সে পথ সঙ্কুচিত হয় নাই; সুগ্রীব, যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহাতে সুপ্রতিষ্ঠ হও, বালীর পথ অনুসরণ করিও না।' কিন্তু লক্ষ্মণের চরিত্র জানিয়া রাম একটা "পুনশ্চ" জুড়িয়া লক্ষ্মণকে সাবধান করিয়া দিলেন—

"তাং প্রীতিমনুবর্ত্তস্ব পূর্ব্ববৃত্তঞ্চ সঙ্গতম্।
সামোপহিতয়া বাচা রুক্ষাণি পরিবর্জ্জয়ন্॥"

প্রীতির অনুসরণ ও পূর্ব্বসখ্য স্মরণ করিয়া রুক্ষতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সান্ত্বনাবাক্যে সুগ্রীবের সঙ্গে কথা কহিও।" এই সাবধা-নতার কারণ ছিল। কারণ কিছু পূর্ব্বেই লক্ষ্মণ বলিয়াছিলেন,

"আজ সেই মিথ্যাবাদীকে বিনাশ করিব, বালীর পুত্র অঙ্গদ এখন বানরগণকে লইয়া জানকীর অন্বেষণ করুন।"

লক্ষ্মণের তীক্ষ্ণ অন্যায়বোধ রামের কথায় প্রশমিত হয় নাই। তিনি সুগ্রীবকে ক্রুদ্ধকণ্ঠে ভর্ৎসনা করিয়া রোষস্ফুরিতাধরে ধনু লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ভয়ে বানরাধিপতি তাঁহার কণ্ঠবিলম্বিত বিচিত্র ক্রীড়ামাল্য ছেদনপূর্ব্বক তখনই রামচন্দ্রের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। এতাদৃশ তেজস্বী যুবককে তেজস্বিনী সীতা যে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন, সে কঠোর বাক্য তিনি কিরূপে সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে কৌতূহল হইতে পারে। মারীচ-রাক্ষস রামের স্বর অনুকরণ করিয়া বিপন্নকণ্ঠে "কোথা রে লক্ষ্মণ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সীতা ব্যাকুল হইয়া তখনই লক্ষ্মণকে রামের নিকট যাইতে আদেশ করিলেন। লক্ষ্মণ রামের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যাইতে অসম্মত হইলেন এবং মারীচ যে ঐরূপ স্বরবিকৃতি করিয়া কোন দুরভিসন্ধিসাধনের চেষ্টা পাইতেছে, তাহা সীতাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সীতা তখন স্বামীর বিপদাশঙ্কায় জ্ঞানশূন্যা, লক্ষ্মণকে সাশ্রুনেত্রে ও সক্রোধে বলিলেন, "তুমি ভরতের চর, প্রচ্ছন্ন জ্ঞাতিশত্রু, আমার লোভে রামের অনুবর্ত্তী হইয়াছ, রামের কোন অশুভ হইলে আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব।" এ কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ ক্ষণকাল স্তম্ভিত ও বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, ক্রোধে ও লজ্জায় তাঁহার গণ্ড আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—"দেবি, তুমি আমার নিকট দেবতা-স্বরূপা, তোমাকে আমার কিছু বলা উচিত নহে। স্ত্রী-লোকের

বুদ্ধি স্বভাবতঃই ভেদকরী; তাহারা বিমুক্তধর্ম্মা, ক্রূরা ও চপলা। তোমার কথা তপ্ত লৌহশেলের মত আমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, —আমি কোনক্রমেই তাহা সহ্য করিতে পারিতেছি না। তোমার আজ নিশ্চয়ই মৃত্যু উপস্থিত, চারিদিকে অশুভলক্ষণ দেখিতে পাইতেছি"—এই বলিয়া প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে সীতাকে বলিলেন, "বিশালাক্ষি, এখন সমগ্র বনদেবতারা তোমাকে রক্ষা করুন।" ক্রোধস্ফুরিতাধরে এই বলিয়া লক্ষ্মণ রামের সন্ধানে চলিয়া গেলেন।

লক্ষ্মণের পুরুষোচিত চরিত্র সর্ব্বত্র সতেজ, তাঁহার পৌরুষদৃপ্ত মহিমা সর্ব্বত্র অনাবিল,—শুভ্র শেফালিকার ন্যায় সুনির্ম্মল ও সুপবিত্র। সীতাকর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত অলঙ্কারগুলি সুগ্রীব সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন; সে সকল রাম এবং লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত করা হইলে লক্ষ্মণ বলিলেন, "আমি হার ও কেয়ূরের প্রতি লক্ষ্য করি নাই, সুতরাং তাহা চিনিতে পারিতেছি না। নিত্য পদ-বন্দনাকালে তাঁহার নূপুরযুগ্ম দর্শন করিয়াছি এবং তাহাই চিনিতে পারিতেছি।" কিষ্কিন্ধার গিরিগুহাস্থিত রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া গিরিবাসিনী রমণীগণের নূপুর ও কাঞ্চীর বিলাসমুখর নিস্বন শুনিয়া

"সৌমিত্রির্লজ্জিতোঽভবৎ।"

এই লজ্জা প্রকৃত পৌরুষের লক্ষণ, চরিত্রবান্ সাধুপুরুষেরাই এইরূপ লজ্জা দেখাইতে পারেন। যখন মদবিহ্বলাক্ষী নমিতাঙ্গযষ্টি তারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল,—তাহার বিশালশ্রোণীস্খলিত কাঞ্চীর হেমসূত্র লক্ষ্মণের সম্মুখে মৃদুতরঙ্গিত হইয়া উঠিল, তখন—

"অবাঙ্মুখোঽভবৎ মনুজপুত্রঃ।"

লক্ষ্মণ লজ্জায় অধোমুখ হইলেন। এইরূপ দুইএকটি ইঙ্গিতবাক্যে পরিব্যক্ত লক্ষ্মণের সাধুত্বের ছবি আমাদের চক্ষের নিকট উপস্থিত হয়। তখন প্রকৃতই তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজার্হ মনে হয়।

রামায়ণে লক্ষ্মণের মত পুরুষকারের উজ্জ্বল চিত্র আর দ্বিতীয় নাই। ইনি সতত নির্ভীক, বিপদে অকুণ্ঠিত, স্বীয় ক্ষুরধার তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি সত্ত্বেও ভ্রাতৃস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিতান্ত বিপদেও তাঁহার কণ্ঠস্বর স্ত্রীলোকের ন্যায় কোমল হইয়া পড়ে নাই। যখন তিনি কবন্ধের বিশাল-হস্তের সম্পূর্ণরূপ আয়ত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন রামের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এইমাত্র তিনি বলিয়াছিলেন—"দেখুন, আমি রাক্ষসের অধীন হইয়া পড়িতেছি, আপনি আমাকেই বলিস্বরূপ রাক্ষসের হস্তে প্রদান করিয়া পলায়ন করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি সীতাকে শীঘ্র ফিরিয়া পাইবেন। তাঁহাকে লাভ করিয়া পৈতৃক রাজ্যে পুনরধিষ্ঠিত হইয়া আমাকে স্মরণ রাখিবেন।" এই কথায় বিলাপের ছন্দ নাই। ইহাতে রামের প্রতি অসীম প্রীতি ও স্বীয় আত্মোৎসর্গের অতুল্য ধৈর্য্য সূচিত হইয়াছে।

ক্ষাত্রতেজের এই জ্বলন্ত মূর্ত্তি, এই মৌন ভ্রাতৃভক্তির আদর্শ, ভারতে চিরদিন পূজা পাইয়া আসিয়াছেন। "রাম-সীতা" এই কথা অপেক্ষাও বোধ হয় "রাম-লক্ষ্মণ" এই কথা এতদ্দেশে বেশী পরিচিত। সৌভ্রাত্রের কথা মনে হইলে "লক্ষ্মণ" অপেক্ষা প্রশংসার্হ উপমান আমরা কল্পনা করিতে পারি না। ভরত ভ্রাতৃ-ভক্তির পল্লব,—সুকোমল ভাবের সমৃদ্ধ উদাহরণ। কিন্তু লক্ষ্মণ

ভ্রাতৃভক্তির অনুরঞ্জন, জীবিকার সংস্থান।) আজ আমরা স্বেচ্ছায় আমাদের গৃহগুলিকে লক্ষ্মণ-শূন্য করিতেছি। আজ বহুস্থানে সহধর্ম্মিণীর স্থলে স্বার্থরূপিণী, অলঙ্কারপেটিকার যক্ষীগণ আমাদিগকে ঘিরিয়া গৃহে একাধিপত্য স্থাপন করিতেছে; যাঁহারা এক উদরে স্থান পাইয়াছিলেন, তাঁহারা আজ এক গৃহে স্থান পাইতেছেন না। হায়, কি দৈববিড়ম্বনা, যাঁহাদিগকে বিশ্বনিয়ন্তা মাতৃগর্ভ হইতে পরম সুহৃদ্রূপে গড়িয়া দিয়া আমাদিগকে প্রকৃত সৌহার্দ্দ শিখাইবেন, তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া পঞ্জাব ও পুণা হইতে আমরা সুহৃৎ সংগ্রহ করিব, এ কথা কি বিশ্বাস্য? আজ আমাদের রাম বনবাসী, লক্ষ্মণ প্রাসাদশীর্ষ হইতে সেই দৃশ্য উপভোগ করেন; আজ লক্ষ্মণের অন্ন জুটিতেছে না, রাম স্বর্ণ থালে উপাদেয় আহার করিতেছেন। আজ আমাদের কষ্ট, দৈন্য, বনবাসের দুঃখ, সমস্তই দ্বিগুণতর পীড়াদায়ক,—লক্ষ্মণগণকে আমাদের দুঃখের সহায় ও চিরসঙ্গী মনে ভাবিতে ভুলিয়া যাইতেছি। হে ভ্রাতৃবৎসল, মহর্ষি বাল্মীকি তোমাকে আঁকিয়া গিয়াছেন—চিত্রহিসাবে নহে; হিন্দুর গৃহ-দেবতাস্বরূপ তুমি এ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলে। আবার তুমি হিন্দুর ঘরে ফিরিয়া এস,—সেই প্রিয়-প্রসঙ্গ-মুখরিত এক গৃহে একত্র বসিয়া আহার করি, স্বর্গ হইতে আমাদের মাতারা সেই দৃশ্য দেখিয়া আশীষ বর্ষণ করিবেন। আমাদের দক্ষিণবাহু অভিনববলদৃপ্ত হইয়া উঠিবে—আমরা এ দুর্দ্দিনের অন্ত দেখিতে পাইব।

কৌশল্যা।

ভরদ্বাজমুনি দশরথের মহিষীবৃন্দের পরিচয় জানিতে ইচ্ছুক হইলে ভরত অঙ্গুলীদ্বারা কৌশল্যাকে দেখাইয়া বলিলেন, "ভগবন্, ঐ যে দীনা, অনশনকৃশা, দেবতার ন্যায় সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি দেখিতে-ছেন, উনিই আমার জ্যেষ্ঠা অম্বা কৌশল্যা।"

এই যে দীনহীনা ব্রতোপবাসক্লিষ্টা দেবীর চিত্র দেখিলাম, ইহাই কৌশল্যার চিরন্তন মূর্ত্তি। ইনি দশরথ রাজার অগ্রমহিষী হইয়াও স্বামীর আদরে বঞ্চিতা। রামচন্দ্রের বনবাসসংবাদে ইঁহার মনে রুদ্ধ কষ্টের বেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তিনি স্বামীর অনাদরের কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন—

"ন দৃষ্টপূর্ব্বং কল্যাণং সুখং বা পতিপৌরুষে।"

'স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠসুখ স্বামীর অনুরাগ, আমি তাহা লাভ করিতে পারি নাই।'

'স্বামী প্রতিকূল, এজন্য আমি কৈকেয়ীর পরিবারবর্গকর্ত্তৃক নিতান্ত নিগৃহীত হইয়া আসিতেছি।'—

"অতো দুঃখতরং কিন্নু প্রমদানাং ভবিষ্যতি।"

'সপত্নীর এরূপ লাঞ্ছনা হইতে স্ত্রীলোকের আর বেশী কি কষ্ট হইতে পারে।

'যে আমার সেবা করে, কৈকেয়ীর ভয়ে সে একান্ত শঙ্কিত হয়। আমি কৈকেয়ীর কিঙ্করীবর্গের সমান, অথবা উহাদের অপেক্ষাও অধম হইয়া আছি।'

একমাত্র রামের ন্যায় পুত্র লাভ করিয়া তিনি জীবনে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। এই পুত্র সহজে তিনি লাভ করেন নাই,—পুত্র-কামনা করিয়া বহু তপস্যা ও নানাপ্রকার শারীরিক কৃচ্ছ্র-সাধন করিয়াছিলেন। আমরা রামায়ণের আদিকাণ্ডে দেখিতে পাই, পুত্রকামনায় তিনি একদা স্বয়ং যজ্ঞের অশ্বের পরিচর্য্যা করিয়া সারারাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই ব্রতনিরতা ক্ষৌমবাসা সাধ্বী চিরনম্রমধুরপ্রকৃতিসম্পন্না। ভগ্নীবৎ স্নিগ্ধ ব্যবহার দ্বারা তিনি কৈকেয়ীর নিষ্ঠুরতার শোধ দিয়াছিলেন; ভরত কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "কৌশল্যা চিরদিনই তোমাকে ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করিয়া আসিয়াছেন, তুমি তাঁহার প্রতি এরূপ বজ্রাঘাত কেন করিলে?" ক্ষমাশীলা কৌশল্যা কৈকেয়ীর শত অত্যাচার ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অত্যাচার—স্বামীর চিত্তে একাধি-পত্যস্থাপন-সত্ত্বেও তাঁহাকে ভগ্নীর মত ভালবাসিতেন। জ্যেষ্ঠা মহিষীর এই ক্ষমা ও উদার স্নিগ্ধতার তুলনা কোথায়? দশরথ অনেক সময়েই কৈকেয়ীর গৃহে বিশ্রাম করিতেন, তাহাও আমরা ভরতের কথাতেই জানিতে পারি।—

"রাজা ভবতি ভূয়িষ্ঠমিহাম্বায়া নিবেশনে।"

সুতরাং কৌশল্যাকে আমরা যখনই দেখিতে পাই, তখনই তাঁহাকে ব্রত ও পূজার্চ্চনাদিতে রত দেখি, স্বামি-কর্ত্তৃক নিগৃহীতা কেবল এক স্থানেই শান্তি পাইতে পারেন। জগতে তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান নাই, কিন্তু যিনি অনাথের আশ্রয়, যাঁহার স্নেহ-কোমল বাহু ব্যথিতকে আদরে ক্রোড়ে লইয়া শান্তিদান করে,

সেই পরমদেবতাকে কৌশল্যা আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাই সংসারের দুঃখ সহ্য করিয়া তাঁহার চরিত্র কঠোর কিংবা কটু হইয়া যায় নাই, উহা যেন আরও অমৃতরসে ভরপূর হইয়া উঠিয়াছিল। রামায়ণে দেবসেবানিরতা কৌশল্যাকে দেখিয়া মনে হয়, যেন তিনি সর্ব্বদা সংসারের তাড়না ভুলিবার জন্য ভগবানের আশ্রয়-ভিক্ষা করিয়া কালাতিপাত করিতেন।

এই দুঃখিনীর একমাত্র সুখ—রামের মত পুত্রলাভ। যে দিন রামচন্দ্র তাঁহাকে স্বীয় অভিষেকের সংবাদ দিলেন, সে দিন তিনি দেবতাদিগের প্রীতিতে একান্তরূপ আস্থাস্থাপন করিলেন। ভাবিলেন, তাঁহার পূজা-অর্চ্চনা সমস্তই এতদিনে সার্থক হইল। তিনি, রামচন্দ্রের শত শত গুণের মধ্যে যে মহাগুণে তিনি পিতৃস্নেহ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, সেই গুণ স্মরণেই একান্ত প্রীত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন—

"কল্যাণে বত নক্ষত্রে ময়া জাতোঽসি পুত্রক।
যেন ত্বয়া দশরথো গুণৈরারাধিতঃ পিতা॥"

'তুমি অতি শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাই তুমি স্বগুণে দশরথ-রাজার প্রীতিলাভ করিতে পারিয়াছ।' দশরথ রাজার স্নেহলাভ যে কি দুর্লভ ভাগ্যের ফল, সাধ্বী তাহা আজীবন তপস্যা করিয়া জানিয়াছিলেন। শুভাভিষেকস্মরণে রাণী গলদশ্রু বস্ত্রাঞ্চলাগ্রে মার্জ্জনা করিয়া রামচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

রামের অভিষেক-উৎসব; এতদিনে দুঃখিনী মাতা আজ আনন্দের আহ্বানে আমন্ত্রিত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি মহার্ঘ

বস্ত্রালঙ্কারে শোভিত হইয়া হর্ষগর্ব্বস্ফুরিতাধরে এই প্রসঙ্গে প্রগল্‌ভা রমণীর ন্যায় আচরণ করিলেন না। মন্থরা-দাসী শশাঙ্কসঙ্কাশ-প্রাসাদ-শীর্ষে দাঁড়াইয়া মনে মনে ভাবিল—

"রামমাতা ধনং কিন্নু জনেভ্যঃ সম্প্রযচ্ছতি।"

কৌশল্যা দরিদ্র, ব্রাহ্মণ ও যাচকদিগকে ধনদান করিতেছিলেন। রাম দেখিলেন, তিনি পবিত্র পট্টবস্ত্র পরিয়া অগ্নিতে আহুতি দিতে-ছেন ও একমনে বিষ্ণুপূজায় রত রহিয়াছেন। ধর্ম্মিষ্ঠা কৌশল্যা দেবসেবা করিয়া সফলকামা হইয়াছেন, সেই দেবসেবায় তিনি আরও আগ্রহসহকারে নিযুক্ত হইলেন।

এই স্থানে রামচন্দ্র মাতাকে নিষ্ঠুর বনবাসসংবাদ শুনাইলেন; সে সংবাদ পুত্রসম্বল জননীর হৃদয় বিদীর্ণ করিল।

("সা নিকৃত্তেব শালস্য যষ্টিঃ পরশুনা বনে।
পপাত সহসা দেবী দেবতেব দিবশ্চ্যুতা॥")

অরণ্যে কুঠারাঘাতে কর্ত্তিত শালযষ্টির ন্যায়—স্বর্গচ্যুত দেবতার ন্যায় দেবী কৌশল্যা সহসা ভূতলে পড়িয়া গেলেন;—পড়িয়া গেলেন, কিন্তু দশরথের মত প্রাণত্যাগ করিলেন না।

দশরথ স্বকৃত পাপের ফলে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, রামকে বনে পাঠাইয়া তাঁহার গভীর শোক হইয়াছিল, কিন্তু বিনা অপ-রাধে এই কার্য্য করার জন্য তাঁহার তদপেক্ষা গভীরতর মনস্তাপ ঘটিয়াছিল। তিনি শোকে মরিলেন, কি লজ্জায় মরিলেন, চির-সুখাভ্যস্ত কুমারকে জটা ও চীরবাস পরিহিত দেখিয়া সেই কষ্টই তাঁহার অসহনীয় হইল কিম্বা যিনি কোন অপরাধে অপরাধী

নহেন, তাঁহাকে অপরাধিনীর বাক্যে এই নির্ব্বাসনদণ্ড দেওয়ার লজ্জা তাঁহাকে অভিভূত করিল, নিশ্চয় করিয়া বলা সুকঠিন। আজন্মতপস্বিনী কৌশল্যার পুত্রবিরহে গভীর শোক হইল, কিন্তু দশরথের মত অনুতপ্ত হইবার তাঁহার কোন কারণ ছিল না। বিশেষতঃ দশরথ চিরসুখাভ্যস্ত, গার্হস্থ্যজীবনে স্নেহের অভিশাপ তিনি এই প্রথমবার পাইলেন, বৃদ্ধবয়সে তাহা সহ্য করিবার শক্তি হইল না। কৌশল্যা চিরদুঃখিনী, চিরস্নেহবঞ্চিতা, দেবতায় বিশ্বাসপরায়ণা। এই দুঃখ পূর্ব্ববর্ত্তী দুঃখরাশির প্রকারভেদ মাত্র, তিনি স্নেহ-জনিত কষ্ট অনেক সহিয়াছিলেন, তাহা সহিতে সহিতে ধর্ম্মশীলার অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা জন্মিয়াছিল; তিনি এই মহাদুঃখের সময় যে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছেন, তাহা আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া তুলে।

বনগমনসম্বন্ধে তিনি রামচন্দ্রকে বলিলেন, "তুমি পিতৃসত্য-রক্ষণার্থ বনে যাওয়া স্থির করিয়াছ, কিন্তু মাতার নিকট কি তোমার কোন ঋণ নাই। আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি এখানে থাকিয়া এই বৃদ্ধকালে আমার পরিচর্য্যা কর, তাহাতে তুমি ধর্ম্মে পতিত হইবে না। পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে যাইয়া মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা ধর্ম্মসঙ্গত হইবে না" শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন, "আমি পূর্ব্বেই প্রতিশ্রুত হইয়াছি, বিশেষ পিতা তোমার এবং আমার উভয়েরই প্রত্যক্ষ দেবতা, পিতৃ আদেশে ঋষি কণ্ডু গোহত্যা করিয়াছিলেন, জামদগ্ন্য স্বীয় মাতা রেণুকার শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ সগরের পুত্রগণ পিতৃ-আদেশে দুরূহ

ব্রত অবলম্বন করিয়া অপূর্ব্বরূপে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, পিতৃ-আদেশ আমি লঙ্ঘন করিতে পারিব না। তিনি কাম কিংবা মোহ বশতঃ যদি এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা আমার বিচার্য্য নহে,—তাঁহার প্রতিশ্রুতিপালন আমার অবশ্য-কর্ত্তব্য।" কৌশল্যা বলিলেন, "দেখ, বনের গাভীগুলিও তাহা-দের বৎসের অনুসরণ করিয়া থাকে, তোমাকে ছাড়িয়া আমি কিরূপে বাঁচিব? তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া চল, তোমার মুখ দেখিয়া তৃণ খাইয়া জীবনধারণ করাও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।" রাম বলিলেন, "পিতা তোমারও প্রত্যক্ষদেবতা, তাঁহার পরিচর্য্যাই তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত, তুমি সংযতাহারী হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে এই চতুর্দ্দশ বৎসর অতিবাহিত কর, এই-সময়-অন্তে শীঘ্র আমি ফিরিয়া আসিয়া তোমার শ্রীচরণবন্দনা করিব।" লক্ষ্মণ ঘোর বাগ্বিতণ্ডা উত্থাপিত করিয়া রামচন্দ্রকে এই অন্যায়-আদেশ-প্রতি-পালন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন; সজল নেত্রপ্রান্তের অশ্রু অঞ্চলাগ্রে মুছিতে মুছিতে কৌশল্যা সকলই শুনিতেছিলেন—তাঁহার পার্শ্বে ধর্ম্মাবতার সৌম্যমূর্ত্তি মাতৃদুঃখে বিষণ্ণ রামচন্দ্র ধর্ম্মের জন্য, পবিত্র প্রতিশ্রুতিপালনের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিবার অটল সঙ্কল্প স্নেহবশীভূত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে জ্ঞাপন করিতেছিলেন, এবং ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণের হস্তধারণপূর্ব্বক তাঁহার উত্তে-জনাপ্রশমনার্থ অনুনয় করিয়া কত কি বলিতেছিলেন;—দেবীরূপিণী কৌশল্যা দেবরূপী পুত্রের অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব দেখিয়া অপূর্ব্বভাবে সহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন;—ধর্ম্মের কথা কৌশল্যার হৃদয়ে ব্যর্থ

হইবার নহে। সহসা পুত্রশোকার্ত্তা মহিষী ধীরগম্ভীর মূর্ত্তিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং রামের বনগমন অনুমোদন করিয়া অশ্রু-গদ্গদকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন—

"গচ্ছ পুত্র ত্বমেকাগ্রো ভদ্রন্তেঽস্তু সদা বিভো।
পুনস্ত্বয়ি নিবৃত্তে তু ভবিষ্যামি গতক্লমা॥
পিতুরানৃণ্যতাং প্রাপ্তে স্বপিষ্যে পরমং সুখম্।
গচ্ছেদানীং মহাবাহো ক্ষেমেণ পুনরাগতঃ।
নন্দয়িষ্যসি মাং পুত্র সাম্না শ্লক্ষ্ণেন চারুণা॥"

"পুত্র, তুমি একাগ্রমনে বনগমন কর, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি ফিরিয়া আসিলে আমার সমস্ত দুঃখ অপনোদিত হইবে। তুমি এই চতুর্দ্দশবৎসর ব্রতপালনপূর্ব্বক পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্ত হইলে আমি পরমসুখে নিদ্রা যাইব। বৎস, এখন প্রস্থান কর, নির্ব্বিঘ্নে পুনরাগত হইয়া হৃদয়হারী নির্ম্মল সান্ত্বনাবাক্যে আমাকে আনন্দিত করিও।" সেই করুণ শোকধ্বনি, ধর্ম্মপূর্ণ সঙ্কল্প ও ক্রোধের নানাকথায় মুখরিত প্রকোষ্ঠে কৌশল্যাদেবীর এই চিত্র সহসা মহত্ত্বগৌরবে আপূরিত হইয়া উঠিল। কৌশল্যাদেবী যে দেবতা-দিগকে রামের অভিষেকের জন্য পূজা করিতেছিলেন, তাঁহা-দিগকেই বনে রামের শুভসম্পাদনের জন্য প্রার্থনা করিয়া পুনরায় পূজা করিতে লাগিলেন। কৃতাঞ্জলি হইয়া রামের বনবাসে শুভকামনা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে ধর্ম্ম, তোমাকে আমার বালক আশ্রয় করিয়াছে, তুমি ইহাকে রক্ষা করিও। হে দেবগণ, চৈত্য ও আয়তন সমূহে রাম তোমাদিগকে নিত্য পূজা

করিয়াছে, তোমরা ইহাকে রক্ষা করিও। হে বিশ্বামিত্রপ্রদত্ত দেবপ্রভাব অস্ত্রসকল, তোমরা রামকে রক্ষা করিও। পিতৃমাতৃ-সেবা দ্বারা যে পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছে, সেই সকল পুণ্য যেন বনাশ্রিত রামকে রক্ষা করে।" অশ্রুপূর্ণচক্ষে ধর্ম্মশীলা কৌশল্যা একটি একটি করিয়া সমস্ত দেবতার নিকট রামচন্দ্রের মঙ্গলকামনা করিলেন। পুত্রের মস্তকে শুভাশীষপ্রদায়ী হস্ত অর্পণ করিয়া বলিলেন—"আমার মুনিবেশধারী ফলমূলোপজীবী কুমার যেন রাক্ষস ও দানবদিগের হস্ত হইতে রক্ষিত হয়; দংশ, মশক, বৃশ্চিক, কীট ও সরীসৃপেরা যেন ইহার শরীর স্পর্শ না করে; সিংহ, ব্যাঘ্র, মহাকায় হস্তী, বরাহ, শৃঙ্গী ও মহিষেরা এবং নরখাদক রাক্ষসগণ যেন ধর্ম্মাশ্রিত পিতৃসত্যপালনরত ত্যাগী বালকের দ্রোহাচরণ না করে। হে পুত্র, তোমার পথ সুখকর হউক, তোমার পরাক্রম সতত সিদ্ধ হউক,—তুমি বনে গমন কর, আমি অনুমতি দিতেছি।"—বলিতে বলিতে ধর্ম্মশীলা রাণী গৌরবদৃপ্ত হইয়া পূজার উপকরণ লইয়া ধ্যানস্থ হইলেন, তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস এতটুকুও শিথিল হইল না। যে পবিত্র যজ্ঞাগ্নি অভিষেকের শুভ-কামনায় প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি পুত্রের বন-প্রস্থানকল্পে মঙ্গলভিক্ষা করিয়া পুনরায় ঘৃতাহুতি দিতে লাগিলেন এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পুনরায় প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "বৃত্রনাশ-কালে ভগবান্ ইন্দ্রকে যে মঙ্গল আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই মঙ্গল রামচন্দ্রকে আশ্রয় করুন; দেবগণ অমৃতলাভোদ্দেশে কঠোর তপঃসাধন করিবার পর যে মঙ্গল তাঁহাদিগকে আশ্রয়

করিয়াছিলেন, রামচন্দ্রকে সেই মঙ্গল আশ্রয় করুন; স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল আক্রমণ করিবার সময় বামনরূপী বিষ্ণুকে যে মঙ্গল আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই মঙ্গল বনবাসী রামচন্দ্রকে আশ্রয় করুন।” সহসা ধর্ম্মপ্রাণা কৌশল্যা ধর্ম্মের অপূর্ব্ব ও গম্ভীর শান্তি লাভ করিলেন। তিনি স্থির ও স্নেহগদ্গদ কণ্ঠে রামচন্দ্রকে বলিলেন, “পুত্র, তুমি সুখে বনগমন কর, রোগশূন্য শরীরে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিও। এই চতুর্দ্দশবৎসর নিবিড় কৃষ্ণা-রজনীর ন্যায় কাটিয়া যাইবে, অযোধ্যার রাজপথে তুমি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উদিত হইবে, আমি তোমাকে লাভ করিয়া সুখী হইব। পিতাকে ঋণ হইতে উদ্ধার করিয়া, সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিয়া তুমি পুনঃপ্রত্যাগত হইবে, আমি সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় জীবন ধারণ করিয়া রহিলাম।”

তৎপরে যখন রামচন্দ্র শেষ-বিদায়-গ্রহণের জন্য রাজসকাশে উপস্থিত হন, তখন সমস্ত মহিষীবর্গ ও সচিবমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা কৈকেয়ীকে নিন্দা করিয়া ও দশরথের অন্যায় প্রতিশ্রুতির উপর কটাক্ষপাত করিয়া ঘোর বাগ্বিতণ্ডা উপস্থিত করিলেন, কত জনে কত কথা বলিতে লাগিলেন,—রাজকুমার-দ্বয় ও সীতার হস্তে কৈকেয়ী চীরবাস প্রদান করিলেন; সেই অভিষেকব্রতোজ্জ্বল রাজকুমার রাজপরিচ্ছদ খুলিয়া জটাবল্কলধারী হইয়া দাঁড়াইলেন, এই মর্ম্মবিদারক দৃশ্য বৃদ্ধ সচিব সিদ্ধার্থ, সুমন্ত্র এবং কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের চক্ষে অসহ্য হইল—তাঁহারা কৈকেয়ীর তীব্র নিন্দা করিতে লাগিলেন, সেই ঘোর তর্ক ও বাগ্বিতণ্ডা-পূর্ণ

গৃহের একপ্রান্তে অশ্রুমুখী কৌশল্যা উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি কোন কথা বলেন নাই। তাঁহার দিকে চাহিয়া রাম রাজাকে বলিলেন—

"ইয়ং ধার্ম্মিক কৌশল্যা মম মাতা যশস্বিনী।
বৃদ্ধা চাক্ষুদ্রশীলা চ ন চ ত্বাং দেব গর্হতে॥
ময়া বিহীনাং বরদ প্রপন্নাং শোকসাগরম্।
অদৃষ্টপূর্ব্বব্যসনাং ভূয়ঃ সংমন্তুমর্হসি॥"

"আমার উদারস্বভাবা যশস্বিনী বৃদ্ধা মাতা আপনার কোনরূপ নিন্দাবাদ করিতেছেন না। আমার বিয়োগে ইনি শোকসাগরে পতিত হইবেন, ইনি এরূপ দুঃখ আর পান নাই, আপনি ইঁহাকে অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করিবেন।"

এই দেবী দশরথের অনাদৃতা ছিলেন; কিন্তু দশরথ কি ইঁহার প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন নাই? কৌশল্যা তাঁহার কিরূপ আদরণীয়া, দশরথ তাহা জানিতেন। কৈকেয়ীর নিকট তিনি বলিয়াছিলেন—

'আমি রামকে বনে পাঠাইলে কৌশল্যা আমাকে কি বলিবেন? এরূপ অপ্রিয় কার্য্য করিয়া আমি তাঁহাকে কি উত্তর দিব?'

"যদা যদা চ কৌশল্যা দাসীবচ্চ সখীব চ।
ভার্য্যাবদ্ভগিনীবচ্চ মাতৃবচ্চোপতিষ্ঠতে॥
সততং প্রিয়কামা মে প্রিয়পুত্রা প্রিয়ংবদা।
ন ময়া সৎকৃতা দেবী সৎকারার্হা কৃতে তব॥"

"কৌশল্যা দাসীর ন্যায়, সখীর ন্যায়, স্ত্রীর ন্যায়, ভগিনীর ন্যায় এবং মাতার ন্যায় আমার অনুবৃত্তি করিয়া থাকেন। তিনি

আমার নিয়ত হিতৈষিণী এবং প্রিয়ভাষিণী ও প্রিয় পুত্রের জননী। তিনি সর্ব্বতোভাবে সমাদরের যোগ্যা, আমি তোমার জন্য তাঁহাকে আদর করিতে পারি নাই।" কৈকেয়ী ক্রুদ্ধা হইয়া বলিয়াছিলেন—

"সহ কৌশলায়া নিত্যং রন্তুমিচ্ছসি দুর্ম্মতে।"

কিন্তু অযোধ্যা ছাড়িয়া রামচন্দ্র যখন চলিয়া গেলেন, যখন মৌন-ভাবে কৌশল্যা দশরথের সঙ্গে সঙ্গে রামের রথের অনুবর্ত্তিনী হইয়া বিসংজ্ঞ হইয়া পড়িলেন, তখন হইতে দশরথের জীবনের শেষ কয়েকটি দিবসে কৌশল্যার প্রতি তাঁহার আদর ও স্নেহ অসীম হইয়া উঠিয়াছিল। দশরথ পথে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন, কিন্তু জ্ঞানলাভ করিয়া বলিলেন, "আমাকে মহারাণী কৌশল্যার গৃহে লইয়া চল, আমি অন্যত্র শান্তি পাইব না।" অর্দ্ধরাত্রে শোকাবেগে আচ্ছন্ন হইয়া কৌশল্যাকে তিনি বলিলেন, —"দেবি, রামের রথের ধূলির দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে আমি দৃষ্টিহারা হইয়াছি, আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, তুমি আমাকে হস্তদ্বারা স্পর্শ কর।"

নিভৃত প্রকোষ্ঠে দশরথকে পাইয়া কৌশল্যা তাঁহাকে কটূক্তি করিয়াছিলেন। মাতৃপ্রাণের এই নিদারুণ বেদনা, সপত্নীর বশীভূত স্বামীর এই ব্যবহার লোক-সমক্ষে তিনি মৌনভাবে সহিয়াছিলেন, কিন্তু আজ সেই কষ্ট তিনি আর সহিতে পারিলেন না,—কাঁদিতে কাঁদিতে দশরথকে বলিলেন,—"পৃথিবীর সর্ব্বত্র তুমি যশস্বী, প্রিয়বাদী ও বদান্য বলিয়া কীর্ত্তিত। কি বলিয়া তুমি পুত্রদ্বয় ও সীতাকে ত্যাগ করিলে?—সুকুমারী চিরসুখোচিতা

জানকী কিরূপে শীতাতপ সহিবেন ? সূপকারগণের প্রস্তুত বিবিধ উপাদেয় খাদ্য যিনি আহার করিতে অভ্যস্ত, তিনি বনের কষায় ফল খাইয়া কিরূপে জীবনধারণ করিবেন ? রামচন্দ্রের সুকেশান্ত পদ্ম-বর্ণ ও পদ্মগন্ধিনিশ্বাসযুক্ত মুখ আমি জীবনে আর কি দেখিতে পাইব ?" এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে কৌশল্যা অধীর হইয়া স্বামীর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিলেন,—"জলজন্তুরা যেরূপ স্বীয় সন্তানকে ত্যাগ করে, তুমি সেইরূপ করিয়াছ। তুমি রাজ্যনাশ ও পৌরজনের সর্ব্বনাশ করিলে। মন্ত্রীরা একেবারে নিশ্চেষ্ট ও বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন, আমিও পুত্রের সহিত উৎসন্ন হইলাম।—

"গতিরেকা পতির্নার্য্যা দ্বিতীয়া গতিরাত্মজঃ।
তৃতীয়া জ্ঞাতয়ো রাজন্ চতুর্থী নৈব বিদ্যতে ॥"

কৌশল্যার মুখে এই নিদারুণ বাক্য শুনিয়া দশরথ মুহূর্ত্তকাল দুঃখিতভাবে মৌন হইয়া রহিলেন, তাঁহার যেন সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়া আসিল। জ্ঞানলাভান্তে তিনি সাশ্রুনেত্রে তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পার্শ্বে কৌশল্যাকে দেখিয়া পুনরায় চিন্তিত ও মৌনী হইলেন। তিনি স্বীয় পূর্ব্বাপরাধ স্মরণ করিয়া শোকে দগ্ধ হইতে লাগিলেন এবং অশ্রুপূর্ণচক্ষে অধোমুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া কম্পিত-দেহে কৌশল্যার প্রসাদভিক্ষা করিয়া বলিলেন, "দেবি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও, তুমি স্নেহশীলা ও শত্রুগণের প্রতিও ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া থাক। স্বামী গুণবান্ বা নিগুর্ণ হউন, স্ত্রীলোকের নিত্য গুরু। আমি দুঃখসাগরে পতিত হইয়াছি এবং তোমার স্বামী, এই মনে করিয়া আমার প্রতি অপ্রিয়কথাপ্রয়োগে

বিরত হও।" রাজা বদ্ধাঞ্জলি, তাঁহার অশ্রু ও করুণ দৈন্ত দর্শনে কৌশল্যার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, তাঁহার চক্ষু হইতে অবিরল জলধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি রাজার অঞ্জলিবদ্ধ কমলকর ধারণ করিয়া স্বীয় মস্তকে রাখিলেন এবং ত্রস্ত হইয়া ভীতকণ্ঠে বলিলেন,—"দেব, আমি তোমার পদতলে আশ্রিতা,—প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি আমার নিকট কৃতাঞ্জলি হইলে সেই পাপে আমার ইহকাল-পরকাল দুইই যাইবে, আমি তোমার ক্ষমার যোগ্যা হইব না। চিরারাধ্য স্বামী যাহাকে এইরূপে প্রসন্ন করিতে চান, সে কুলস্ত্রীর মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছে,—সে আর কুলস্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিতে পারে না। ধর্ম্ম কি, আমি তাহা জানি,—তুমি সত্যের অবতারস্বরূপ, তাহাও বুঝিতেছি। পুত্র-শোকে বিহ্বল হইয়া আমি তোমার প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি—আমার প্রতি প্রসন্ন হও। শোকে ধৈর্য্য নষ্ট হয়, শোকে ধর্ম্মজ্ঞান অন্তর্দ্ধান করে, শোকে সর্ব্বনাশ হয়, শোকের মত রিপু নাই। পঞ্চরাত্রি অতীত হইল রাম অযোধ্যা হইতে গিয়াছে, এই পঞ্চ রাত্রি আমার নিকট পঞ্চ বৎসরের মত দীর্ঘ বোধ হইয়াছে।" এই সময়ে সূর্য্যদেব মন্দরশ্মি হইয়া নভঃপ্রান্তে বিলীন হইলেন এবং ধীরে ধীরে রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল—দশরথ কৌশল্যার কথায় আশ্বাসিত হইয়া নিদ্রিত হইলেন।

এই দাম্পত্যচিত্রে কৌশল্যার অপূর্ব্ব স্বামিভক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। দৃশ্যটি সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইল, মূলকাব্যের এই অংশটি করুণ-রসের উৎস-স্বরূপ।

পররাত্রে দশরথের জীবন শেষ হয়, তখন কৌশল্যা পুত্রশোকে আকুল হইয়া নিদ্রায় আক্রান্তা, তিনি পতির মৃত্যু জানিতে পারেন নাই। পরদিন প্রত্যূষে সেই দুঃখময় রাজপ্রাসাদের চিরপ্রথানুসারে বন্দিগণ গান আরম্ভ করিল, বীণার মধুর নিক্কণে প্রবুদ্ধ হইয়া শাখাবিহারী ও পিঞ্জরাবদ্ধ বিহগকুল কাকলি করিয়া উঠিল, প্রসুপ্তা কৌশল্যার মুখে বিবর্ণতা ও শোক অঙ্কিত হইয়াছিল,—

"নিষ্প্রভা চ বিবর্ণা চ সন্না শোকেন সন্নতা।
ন ব্যরাজত কৌশল্যা তারেব তিমিরাবৃতা॥"

গত ভীষণ রজনীর দুর্ঘটনার চিত্র উদ্ঘাটন করিয়া যখন উষাদেবী দর্শন দিলেন, তখন মৃত স্বামীকে দেখিয়া মহিষীগণ আকুলিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বাষ্পপূর্ণচক্ষে কৌশল্যা স্বামীর মস্তক ধারণ করিয়া কৈকেয়ীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—

"সকামা ভব কৈকেয়ি ভুঙ্ক্ষ রাজ্যমকণ্টকম্।"

"রাম বনবাসী হইয়াছেন, রাজা ছাড়িয়া গেলেন, এখন আমি আর কি লইয়া থাকিব?

—ইদং শরীরমালিঙ্গ্য প্রবেক্ষ্যামি হতাশনম্।"

'এই প্রিয়দেহ আলিঙ্গন করিয়া আমি অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিব।'" ইহার পরে ভরত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দুর্ঘটনার কোন সংবাদ জানিতেন না; কৈকেয়ীর মুখে সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহাকে শোকার্ত্তকণ্ঠে ভর্ৎসনা করিয়া বিলাপ করিতেছিলেন, অপর প্রকোষ্ঠ হইতে কৌশল্যা তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুমিত্রার দ্বারা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভরত

কৌশল্যার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, "তোমার মাতা রাজ্যকামনায় আমার পুত্রকে চীর ও বল্কল পরাইয়া বনে পাঠাইয়া দিয়াছেন, রাজা স্বর্গগত হইয়াছেন, আমি এখানে কোনরূপেই থাকিতে পারিতেছি না, তুমি ধনধান্যশালিনী অযোধ্যাপুরী অধিকার কর, আমাকে বনে রামের নিকট পাঠাইয়া দাও।" ভরত নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "আর্য্যে, আপনি কেন না জানিয়া আমার প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন,—রামের আমি চির-অনুরাগী, আমাকে সন্দেহ করিবেন না।" এই বলিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে ভরত নানাপ্রকার শপথ করিতে লাগিলেন। রামের প্রতি যদি তাঁহার বিদ্বেষবুদ্ধি থাকে, তবে মহাপাতকীদের সঙ্গে যেন অনন্ত নরকে তাঁহার স্থান হয়, ইহাই বিবিধপ্রকারে বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—বলিতে বলিতে অশ্রুধারায় অভিষিক্ত হইয়া পরিশ্রান্ত ভরত শোকোচ্ছ্বাসে মৌনী হইয়া রহিলেন। কৌশল্যা বলিলেন—"বৎস তুমি শপথ করিয়া কেন আমাকে মর্ম্মবেদনা প্রদান করিতেছ ? ভাগ্যক্রমে তোমার স্বভাব ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় নাই, আমার দুঃখবেগ এখন আরও প্রবল হইয়া উঠিল।" এই বলিয়া কৌশল্যা ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে সস্নেহে ক্রোড়ে লইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।

ভরত অযোধ্যার সমস্ত পৌরজনে পরিবৃত হইয়া রামকে আনিতে গেলেন; শোককর্শিতা কৌশল্যা সঙ্গে গিয়াছিলেন। শৃঙ্গবেরপুরীতে ভরত রামের তৃণশয্যা দেখিয়া শোকে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, তিনি অনেক ক্ষণ

কথা কহিতে পারেন নাই। ভরত ভূলুণ্ঠিত হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিলেন,—কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর করিতে পারিতেছিলেন না,—কৌশল্যা ভরতকে তদবস্থ দেখিয়া দীন ও আর্ত্ত স্বরে এবং স্নিগ্ধসম্ভাষণে তাঁহাকে বলিলেন,—

"পুত্র ব্যাধির্ন তে কচ্চিচ্ছরীরং প্রতিবাধতে।
ত্বাং দৃষ্টা পুত্র জীবামি রামে সভ্রাতৃকে গতে॥"

'পুত্র, তোমার শরীরে ত কোন ব্যাধি উপস্থিত হয় নাই। রাম ভ্রাতার সহিত বনবাসী হইয়াছেন, এখন তোমার মুখখানি দেখিয়াই আমি জীবনধারণ করিতেছি।'

প্রকৃত পক্ষেও রামের বনগমনের পরে ভরত কৌশল্যারই যেন গর্ভজাত পুত্রের স্থানীয় হইয়াছিলেন,—কৈকেয়ী তাঁহার বিমাতার ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। চিত্রকূটপর্ব্বতে রামের সঙ্গে মিলন সংঘটিত হইল। কৌশল্যা সীতার মুখের উজ্জ্বল শ্রী আতপক্লিষ্ট দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অশ্রুপূর্ণাক্ষী সীতা শ্বশ্রূমাতাকে প্রণাম করিয়া নীরবে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, কৌশল্যা বলিলেন—"যিনি মিথিলাধিপতির কন্যা, মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ এবং রামচন্দ্রের স্ত্রী, তিনি বিজনবনে কেন এত দুঃখ পাইতেছেন? বৎসে, আতপসন্তপ্ত পদ্মের ন্যায়, ধূলি-মলিন কাঞ্চনের ন্যায় তোমার মুখের ছটা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তোমার এ মলিন মুখ দেখিয়া আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে।"

রাম ইঙ্গুদীফল দিয়া পিতৃপিণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন,—ভূতলে দক্ষিণাগ্র দর্ভের উপর প্রদত্ত সেই ইঙ্গুদীফলের পিণ্ড দেখিয়া

কৌশল্যা বিলাপ করিয়া বলিলেন—"রাম এই ইঙ্গুদীফলে পিতৃপিণ্ড দান করিয়াছেন, এ দৃশ্য আমার সহ্য হয় না—"

"চতুরান্তাং মহীং ভুক্তা মহেন্দ্রসদৃশো ভুবি।
কথমিঙ্গুদিপিণ্যাকং স ভুঙ্‌ক্তে বসুধাধিপঃ॥
অতো দুঃখতরং লোকে ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাতি মে।
যত্র রামঃ পিতুর্দদ্যাদিঙ্গুদীক্ষোদমৃদ্ধিমান্॥"

"ইন্দ্রতুল্যপরাক্রান্ত মহারাজ দশরথ সসাগরা পৃথিবী ভোগ করিয়া এই ইঙ্গুদীফল কিরূপে ভক্ষণ করিবেন? রামচন্দ্র ইঙ্গুদীফলের পিণ্ড পিতাকে প্রদান করিলেন, ইহা হইতে আমার অধিকতর দুঃখ আর কিছুই নাই।" সামান্য বিষয় লইয়া এই সকল বিলাপ-পূর্ণ উক্তির একদিকে পুত্রের বনবাসে জননীর দারুণ দুঃখ, অপরদিকে স্বামিবিয়োগে সাধ্বীর সুগভীর মর্ম্মবেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই কৌশল্যাচিত্র হিন্দুস্থানের আদর্শ-জননীর চিত্র—আদর্শ স্ত্রীচরিত্র। প্রতি পল্লী-গৃহের হিন্দুবালক এখনও এই স্নেহ ও আত্ম-ত্যাগ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইতেছেন। এখনও শত শত স্নেহময়ী কৌশল্যা হিন্দুস্থানের প্রতি তরুপল্লবচ্ছায়ায় স্বীয় কোমল বাহুবন্ধনে আশ্রিত শিশুগণকে পালন করিতেছেন ও তাহাদের শুভকামনায় কঠোর ব্রত-উপবাস ও দেবারাধনা করিয়া নিরন্তর স্নেহার্থ আত্ম-বিসর্জ্জন করিতেছেন। এখনও বঙ্গদেশের কবি "কে এসে যায় ফিরে ফিরে আকুল নয়ননীরে" প্রভৃতি সুমিষ্ট বন্দনাগীতে সেই স্নেহপ্রতিমার অর্চ্চনা করিতেছেন। কিন্তু কৌশল্যার মত কয়জন

জননী এখন ধর্ম্মব্রতে আত্মসুখবিসর্জ্জনকারী বল্কলধারী পুত্রকে বলিতে পারেন—

"ন শক্যতে বারয়িতুং গচ্ছেদানীং রঘূত্তম।
শীঘ্রঞ্চ বিনিবর্ত্তস্ব বর্ত্তস্ব চ সতাং ক্রমে॥
যং পালয়সি ধর্ম্মং ত্বং প্রীত্যা চ নিয়মেন চ।
স বৈ রাঘবশার্দ্দূল ধর্ম্মস্ত্বামভিরক্ষতু॥"

'বৎস, তোমাকে আমি কিছুতেই নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিলাম না, এক্ষণে তুমি প্রস্থান কর, কিন্তু শীঘ্রই ফিরিয়া আসিও এবং সৎপথে প্রতিষ্ঠিত থাকিও। তুমি প্রীতির সহিত—নিয়মের সহিত যে ধর্ম্মপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, সেই ধর্ম্ম তোমায় রক্ষা করুন।" আমাদের চিরপূজার্হা শচীমাতাও বুক বাঁধিয়া এমন কথা বলিতে পারেন নাই।

সীতা।

রাম কৈকেয়ীর নিকট স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"বিদ্ধি মামৃষিভিস্তুল্যং বিমলং ধর্ম্মমাস্থিতম্।"

তিনি বনবাসাজ্ঞা অবিকৃতমুখে অবনতশিরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মুখে শান্তির শ্রী বিলীন হয় নাই। কিন্তু "ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ" করিয়া যে দুঃখ হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন, কৌশল্যার নিকট আসিবার সময় তাহা প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তিনি পরিশ্রান্ত হস্তীর ন্যায় গভীর নিশ্বাসপাত করিতে লাগিলেন,—"নিশ্বসন্নিব কুঞ্জরঃ।" মাতার নিকট মর্ম্মচ্ছেদী সংবাদ বলিবার সময় তাঁহার কণ্ঠ শঙ্কান্বিত ও কম্পিত হইয়া উঠিতেছিল, তাঁহার কথার সূচনা পরিতাপব্যঞ্জক—

"দেবি নূনং ন জানীষে মহদ্ভয়মুপস্থিতম্।"

মাতার অশ্রু ও শোকের উচ্ছ্বাস তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া সহ্য করিয়াছিলেন ; অপ্রতিহত অঙ্গীকারের শ্রী তাঁহার কথাগুলিতে এক অপূর্ব্ব নৈতিক-মহিমা প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু সীতার সন্নিহিত হইয়া তাঁহার হৃদয়বেগ প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি তাহা রোধ করিতে পারিলেন না। চিরানুরক্তা স্ত্রীকে সদ্যোযৌবনের অতৃপ্তকামনায় দারুণ দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিয়া যাইবেন, এ কথা বলিতে যাইয়া তাঁহার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। সীতা অভিষেকসম্ভারের প্রতীক্ষায় ফুল্লমনে রহিয়াছেন, অকস্মাৎ

বজ্রাঘাতের ন্যায় নিদারুণ সংবাদে কুসুমকোমলা রমণীর প্রাণকে কিরূপে চকিত ও ব্যথিত করিয়া তুলিবেন, ভাবিয়া তিনি যেন দিশাহারা হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মুখশ্রী মলিন হইয়া গেল। সীতা তাঁহাকে দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন, কি যেন দারুণ অনর্থ ঘটিয়াছে। "অদ্য শতশলাকাযুক্ত জলফেনশুভ্র রাজছত্র তোমার মাথার উপর শোভা পাইতেছে না। কুঞ্জর, অশ্বারোহী ও বন্দিগণ তোমার অগ্রে অগ্রে আইসে নাই, তোমার মুখ বিষণ্ণ, কি ভাবনায় তুমি ক্লিন্ন ও আকুল হইয়া পড়িয়াছ, তোমার বর্ণ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।" কোথায় রামচন্দ্রের সেই স্বভাবসৌম্য প্রশান্ত ভাব! রমণীর অঞ্চলপার্শ্ববর্ত্তী হইয়া তিনি এরূপ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন কেন? তিনি সীতার মহৎ পিতৃকুলের সংযম ও তাঁহার সর্ব্বজনপ্রশংসিত চরিত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে আসন্ন পরীক্ষার উপযোগিনী করিতে চেষ্টা পাইলেন; তিনি বনে গেলে সীতা কি ভাবে রাজগৃহে জীবন-যাপন করিবেন, তৎসম্বন্ধে নানা-নৈতিক-উপদেশ-সংবলিত একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। কিন্তু তাঁহার আশঙ্কা বৃথা—সীতা সে সকল কথা উপহাস করিয়া বলিলেন, "তুমি বনে গেলে তোমার অগ্রে কুশাঙ্কুর ও কণ্টকাকীর্ণ পথে পাদচারণ করিয়া আমি বনে যাইব।" যাঁহারা রামের বনগমনের কথা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই কত আক্ষেপ করিয়াছেন। রাম সীতার মুখে সেইরূপ কত আক্ষেপ শুনিবার প্রত্যাশা করিয়া আসিয়াছিলেন এবং তাহার প্রশমনার্থ কত উপদেশ মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছিলেন।

কিন্তু সীতা একটি আক্ষেপের কথা বলিলেন না, একবার দশরথকে স্ত্রৈণ বলিলেন না, কৈকেয়ীর প্রতি কটাক্ষনিক্ষেপ করিলেন না, এমন কি, রামচন্দ্র যে জটাবল্কল পরিবেন, ইহা শুনিয়াও শোকে বিদীর্ণ হইয়া পড়িলেন না। পরন্তু তিনি স্বীয় যৌবনকল্পনার মাধুরী দিয়া বনবাসকে এক সুরম্যচিত্রে আঁকিয়া ফেলিলেন, রাজত্বের সুখ অতি তুচ্ছ মনে করিলেন। সাধুপুষ্পিত পদ্মিনীসঙ্কুল সরোবর, ফেননির্ম্মলহাসিনী নদীর প্রবাহ, বনাস্তলীন শৈলখণ্ড, এই সকল দেখিয়া স্বামীর পার্শ্বে সোহাগিনী ভ্রমণ করিবেন, এই সুখের আশায় যেন আকুল হইয়া উঠিলেন। সীতা স্বামীর সঙ্গে গিরিনির্ঝর দেখিয়া ও বনের মুক্তবায়ু সেবন করিয়া বেড়াইবেন, এই আনন্দের উৎসাহে রামের বনগমনের ক্লেশ ভাসিয়া গেল, রামচন্দ্র প্রায় হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। "এই সুরম্য অযোধ্যার সমৃদ্ধ সৌধমালার ছায়া হইতে প্রিয়তম স্বামীর পাদচ্ছায়াই আমার নিকট অধিকতর গণ্য" সীতা দৃঢ়ভাবে ইহাই বলিলেন। এই আনন্দ শুধু অনভিজ্ঞতার ফল, রামচন্দ্র ভাবিলেন, সীতার নিকট বনবাসের কষ্ট বুঝাইয়া বলিলে তিনি নিবৃত্ত হইবেন। কিন্তু যাহা তিনি অনভিজ্ঞ আনন্দের জল্পনা মনে করিয়াছিলেন— তাহা সাধ্বীর অটল পণ। রামচন্দ্র বনের কষ্ট, তাঁহাকে সহস্র-প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। সীতা কি কষ্টকে ভয় করেন? ইহা তীর্থোন্মুখী রমণীর বৃথা ঔৎসুক্য নহে, স্বামীর সঙ্গ ছাড়িয়া সাধ্বী থাকিতে পারিবেন না—এই তাঁহার স্থির সঙ্কল্প। রাম তখন বনের ভীষণতার একটি চিত্র সীতার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন; কৃষ্ণ সর্প,

বনতরুর কণ্টকপূর্ণ ব্যাকুল শাখাগ্র, ফলমূল-জীবিকা এবং অনশন, পঙ্কিল সরোবর, ব্যাঘ্র, সিংহ ও রাক্ষসগণের উৎপাত প্রভৃতি শত শত বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া সীতার ভীতি উৎপাদনের চেষ্টা পাইলেন। সীতা ঘৃণার সহিত সে সকল উপেক্ষা করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কি আমাকে তুচ্ছ শয্যাসঙ্গিনী মনে করিয়াছ,—

"দ্যুমৎসেনসুতং বীরং সত্যব্রতমনুব্রতাম্।
সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি॥"

দ্যুমৎসেন-পুত্র সত্যব্রতের অনুব্রতা সাবিত্রীর ন্যায় আমাকে জানিও" এবং পরে বলিলেন,—"আমি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া তোমার সঙ্গে বনে পর্য্যটন করিব। যাহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত, তাহারাই প্রবাসে কষ্ট পায়, আমরা কেন কষ্ট পাইতে যাইব?" রাম তথাপি নানারূপ ভয়ের আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার প্রয়াসী হইলেন। সীতা ক্রোধাবিষ্টা হইয়া বলিলেন—"নিজের স্ত্রীকে পার্শ্বে রাখিতে ভয় পায়, এরূপ নারীপ্রকৃতি পুরুষের হস্তে কেন আমাকে পিতা সমর্পণ করিয়াছেন?" ইহা হইতেও তিনি অধিকতর কুকথা রামকে বলিয়াছিলেন:—

"শৈলূষ ইব মাং রাম পরেভ্যো দাতুমিচ্ছসি।"

স্ত্রীজনসুলভ অনেক কমনীয় কথার সংঘটনও এস্থানে দৃষ্ট হয়—"তোমার সঙ্গে থাকিলে, তোমার শ্রীমুখ দেখিলে, আমার সকল জ্বালা দূর হইবে, পথের কুশকণ্টক রাজগৃহের তূলাজিন অপেক্ষাও আমি কোমলতর মনে করিব।" এইরূপ নানা বিনয় ও প্রেমসূচক কথা বলিয়া সীতা স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া কাঁদিতে

লাগিলেন; তাঁহার পদ্মদলের ন্যায় দুটি চক্ষু জলভারে আচ্ছন্ন হইল; তিনি স্বামীর সঙ্গে যাইতে না পারিলে প্রাণত্যাগ করিবেন, এই সঙ্কল্প জানাইয়া ব্রততীর ন্যায় রামের অঙ্গে হেলিয়া পড়িয়া বিমনা হইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। সাধ্বীর এই অশ্রুতপূর্ব্ব দৃঢ়তা দর্শনে রাম বাহুদ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—

"ন দেবি তব দুঃখেন স্বর্গমপ্যভিরোচয়ে।"

এবং তাঁহাকে সঙ্গে যাইতে অনুমতি দিয়া বলিলেন, "তোমার ধনরত্ন যাহা কিছু আছে,—তাহা বিতরণ করিয়া প্রস্তুত হও।" রমণীর অলঙ্কার-পেটিকা শত শত অদৃশ্য ও মৌন যক্ষে রক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু সীতা কেমন হৃষ্টমনে হার-কেয়ূর সখীগণকে বিলাইয়া দিতেছেন, তাহা দেখিবার যোগ্য। বশিষ্ঠপুত্র সুযজ্ঞের পত্নীকে তিনি হেমসূত্র, কাঞ্চী ও নানা মহার্ঘ দ্রব্য প্রদান করিলেন। সখী-গণকে স্বীয় পর্য্যঙ্ক, হেমখচিত আস্তরণ এবং নানা অলঙ্কার প্রদান করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে নিরাভরণা সুন্দরী বনবাসের জন্য প্রস্তুত হইলেন। যখন রাম পিতামাতা ও সুহৃদ্‌গণের সমক্ষে জটাবল্কল পরিধান করিলেন, তখন সীতার পরিধানের জন্য কৈকেয়ী তাঁহার হস্তে চীরবাস প্রদান করিলে, সীতা সজলনেত্রে ভীতকণ্ঠে রামের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "চীরবাস কেমন করিয়া পরিতে হয়, আমি জানি না, আমাকে শিখাইয়া দাও।" সুমন্ত্র যে দিন রথ লইয়া গঙ্গাতীর হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সে দিন তিনি সীতাকে বলিয়াছিলেন—"অযোধ্যায় কোন সংবাদ কি আপনার দিবার আছে?" সীতা তখন কিছু বলিতে পারেন নাই, দুটি

চক্ষু হইতে তাঁহার অজস্র অশ্রুবিন্দু পতিত হইয়াছিল। এই সকল অবস্থায় সীতার মূর্ত্তি লজ্জাবতী লতাটির ন্যায়, কিন্তু এই বিনয়নম্রা মধুরভাষিণীর চরিত্রে যে প্রখরতেজ ও দৃঢ়সঙ্কল্প বিদ্যমান, তাহার পুর্ব্বাভাস ইতিপূর্ব্বেই আমরা পাইয়াছি।

তার পর রাজকুমারদ্বয় ও রাজবধূ বনে যাইতেছেন। যিনি রাজান্তঃপুরীর অবরোধে সযত্নে রক্ষিতা, যাঁহার গৃহশিখরে শুক ও ময়ূর নৃত্য করিত ও হেমপর্য্যঙ্কে সুকোমলচর্ম্মাচ্ছাদনশোভী আস্তরণ বিরাজিত থাকিত, নিদ্রিত হইলে যাঁহার রূপমাধুরী শুধু স্বর্ণদীপরাশি নির্নিমেষনেত্রে চাহিয়া দেখিত, আজ তিনি সকলের দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী, পদব্রজে কণ্টকাকীর্ণ পথে চলিতেছেন, পদ্মপ্রসূনের মত পাদযুগ্ম,—তাহাতে অলক্তকরাগ মলিন হয় নাই, সেই পাদযুগ্ম লীলানূপুরশব্দে এখনও বনপ্রদেশ মুখরিত করিয়া চলিতেছে, চিত্রকূটের প্রান্তবর্ত্তিনী হইয়া সীতা শ্বাপদসঙ্কুল গহনে কৃষ্ণা রজনীতে ভীতা হইলেন, রামের বাহু-আশ্রিতা সীতার ভীত ও চকিত পাদক্ষেপ ক্রমশঃ মন্থর হইয়া আসিল। পরিশ্রান্ত হইয়া যখন ইঙ্গুদীমূলে তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন, তখন তৃণশয্যাশায়িনীর সুন্দর বর্ণ আতপক্লিষ্ট ও অনশনজনিত মুখশ্রীর বিষণ্ণতা দেখিয়া রামচন্দ্র অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। কিন্তু কষ্ট স্থায়ী হয় না,—প্রভাতে চিত্রকূটের শৃঙ্গে বনতরুর পুষ্পসমৃদ্ধি দেখাইয়া রামচন্দ্র সীতাকে আদর করিতে লাগিলেন,—সীতা সেই আদরে ও সোহাগে পুনরায় ফুল্লা হইয়া উঠিলেন, পদ্ম উত্তোলন করিয়া সীতা মন্দাকিনীসলিলে স্নান করিলেন, তটিনীর মন্দমারুত-চালিত-তরঙ্গধ্বনি তাঁহার

নিকট সখীর আহ্বানের ন্যায় মৃদুমনোরম বোধ হইতে লাগিল,—তিনি স্বামীর পার্শ্বে স্বভাবের রম্যশোভা দর্শন করিয়া অযোধ্যার সুখ অকিঞ্চিৎকর মনে করিলেন।

বনবাসের ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত হইল, রাজবধূ বন-দেবতার মত বন্যফুল পরিয়া রামের মনে হর্ষ উৎপাদন করিতেন; কেবল একদিন রামের জ্যানিনাদকম্পিত শান্ত বনভূমির চাঞ্চল্য দেখিয়া সাধ্বী রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "তুমি অহেতুবৈর ত্যাগ কর; তুমি পারিব্রজ্য অবলম্বন করিয়া বনে আসিয়াছ, এখানে রাক্ষসদিগের সঙ্গে শত্রুতা করা সময়োচিত নহে; তোমার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে পাছে নিষ্ঠুরতা বর্ত্তে, আমার এই আশঙ্কা।—

"কদর্যাকলুষা বুদ্ধির্জায়তে শস্ত্রসেবনাৎ।
পুনর্গত্বা ত্বযোধ্যায়াং ক্ষত্রধর্ম্মং চরিষ্যসি॥"

অস্ত্র-চর্চ্চায় বুদ্ধি কলুষিত হয়, তুমি অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইয়া ক্ষত্র-ধর্ম্ম আচরণ করিও।

কখনও ঋষিকন্যা অনসূয়ার নিকট বসিয়া সীতা কথাবার্ত্তায় নিযুক্তা থাকিতেন, কখনও গদ্গদনাদী গোদাবরীতীরে স্বীয় অঙ্কে ন্যস্তমস্তক মৃগয়াশ্রান্ত শ্রীরামচন্দ্রের মুখে ব্যজন করিতেন, কখন সুকেশী তাঁহার কর্ণান্তলম্বিত চূর্ণকুন্তল কর্ণিকারপুষ্পদামে সাজাইয়া দিতেন,—অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী বনলক্ষ্মীর বেশে এইভাবে স্বামীর সঙ্গে সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

সুতীক্ষ্ণঋষির সঙ্গে দেখা করিয়া রাম অগস্ত্যাশ্রমে গমন করি-লেন। তখন শীতকাল আসিয়া পড়িয়াছে—তুষারমিশ্র জ্যোৎস্না ও

মৃদু-সূর্য্য, নিষ্পত্র তরু ও যবগোধূমাকীর্ণ প্রান্তর বনের বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে, বিরাধরাক্ষসের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সীতা স্বামীর সঙ্গে ক্রমশঃ দাক্ষিণাত্যের নিম্নপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তীব্র বন্যপিপ্পলীর গন্ধে বন্যবায়ু আকুলিত হইতেছিল; শালিধান্যসকলের খর্জ্জূরপুষ্পগুচ্ছতুল্য পূর্ণতণ্ডুল শীর্ষসমূহ আনম্র হইয়া স্বর্ণবর্ণে শোভা পাইতেছিল। বনোন্মত্তা মৈথিলী নদীপুলিনের হিমাচ্ছন্ন প্রান্তরে, কাশকুসুমশোভিত বনান্তে মুক্তবেণী পৃষ্ঠে দোলাইয়া ফলপুষ্পের সন্ধানে বেড়াইতে থাকিতেন, কখন বা তাপসকুমারীগণের নিকট স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেন, "আমার স্বামী পরস্ত্রীমাত্রকেই মাতৃবৎ গণ্য করেন।" ধর্ম্মপ্রাণ স্বামীর গুণকীর্ত্তন করিতে তাঁহার কণ্ঠ আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইয়া সীতা একেবারে সঙ্গিনীশূন্যা হইয়া পড়িলেন, সেখানে নিকটে কোন ঋষির আশ্রম ছিল না। এই স্থানে সূর্পনখার নাসাকর্ণচ্ছেদ ও রামের শরে খরদূষণাদি চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষস নিহত হইল। দণ্ডকারণ্যের রাক্ষসগণের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব মনুষ্যভয়ের সঞ্চার হইল। অকম্পন রাবণের নিকট বলিয়াছিল,—"ভয়প্রাপ্ত রাক্ষসগণ যে স্থানেই পলাইয়া যায়, সেই স্থানেই তাহারা সম্মুখে ধনুষ্পাণি রামের করাল মূর্ত্তি দেখিতে পায়।" মারীচ রাবণকে বলিয়াছিল—"বৃক্ষের পত্রে পত্রে আমি পাশহস্তযমসদৃশ রামমূর্ত্তি দেখিতে পাই।" স্বীয় অধিকারস্থ জনস্থানের এই অবস্থা শুনিয়া রাবণ সেই মুহূর্ত্তে সীতাহরণোদ্দেশ্যে দণ্ডকারণ্যাভিমুখে প্রস্থান করিল।

সীতা লক্ষ্মণকে তীব্র গঞ্জনা করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন। মায়াবী মারীচ মৃত্যুকালে রামের কণ্ঠধ্বনির অবিকল অনুকরণ করিয়াছিল; সেই আর্ত্ত কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া সীতা পাগলিনী হইলেন। লক্ষ্মণ রাক্ষসদিগের ছলনার বৃত্তান্ত বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, সুতরাং সীতার কথায় আশ্রম ছাড়িয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। স্বামীর বিপদাশঙ্কাতুরা সীতা লক্ষ্মণের মৌন এবং দৃঢ়সঙ্কল্প কোন গূঢ় ও কুৎসিত অভিপ্রায়ের ছদ্মবেশ বলিয়া মনে করিলেন; তখনও সীতার কর্ণে "কোথায় সীতা, কোথায় লক্ষ্মণ" এই আর্ত্ত কণ্ঠের স্বর ধ্বনিত হইতেছিল; উন্মত্তা মৈথিলী লক্ষ্মণকে "প্রচ্ছন্নচারী ভরতের দূত, কুঅভিপ্রায়ে ভ্রাতৃজায়ার পশ্চাৎ অনুবর্ত্তী" প্রভৃতি কঠোর বাক্য বলিতে লাগিলেন। "আমি রাম ভিন্ন অন্য কোন পুরুষকে স্পর্শ করিব না, অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিব।" এই সকল দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ একবার উর্দ্ধদিকে চাহিয়া দেবতাদিগের উপর সীতার রক্ষার ভার অর্পণ করিলেন এবং রোষস্ফুরিত অধরে আশ্রম ত্যাগ করিয়া রামের সন্ধানে চলিয়া গেলেন। তখন কাষায়বস্ত্রপরিহিত, শিখী, ছত্রী ও উপানহী পরিব্রাজক "ব্রহ্ম" নাম কীর্ত্তন করিয়া সীতার সম্মুখে উপস্থিত হইল। রাবণ সীতাকে সম্বোধন করিয়া যে সকল কথা কহিল, তাহা ঠিক ঋষিজনোচিত নহে। কিন্তু সরলপ্রকৃতি সীতা অতর্কিত ছিলেন। তিনি ব্রহ্মশাপের ভয়ে রাবণের নিকট আত্মপরিচয় দিলেন এবং অতিথিবোধে তাঁহাকে আশ্রমে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"একশ্চ দণ্ডকারণ্যে কিমর্থং চরসি দ্বিজ।"

রাবণ বাক্যের আড়ম্বর না করিয়া একেবারেই স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল—"আমি রাক্ষসরাজ রাবণ, ত্রিকূটশীর্ষে লঙ্কা আমার রাজধানী, তথায় নানা স্থান হইতে আমি ষোড়শ শত সুন্দরী সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি, তোমাকে তাহাদের 'অগ্রমহিষী'রূপে বরণ করিয়া লইব। দশরথ রাজা মন্দবীর্য্য জ্যেষ্ঠপুত্রকে সিংহাসন হইতে তাড়িত করিয়া প্রিয় কনিষ্ঠপুত্র ভরতকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, তাহাকে ভজনা করায় কোন লাভ নাই। ত্রিকূটশীর্ষস্থিতা বনমালিনী লঙ্কার সুপুষ্পিত তরুচ্ছায়ায় আমার সঙ্গে বাস করিয়া তুমি রামকে আর মনেও স্থান দিবে না।" সীতাকে আমরা তাপসপত্নীগণের নিকট একটি সুকুমারী ব্রততীর ন্যায় দেখিয়াছি। তাঁহার সলজ্জ সুন্দর মুখখানি আতপতাপে ঈষৎ ম্লান হইয়াছিল, কিন্তু সেই লজ্জিত ও মৃদু ভঙ্গীর মধ্যে যে প্রখর তেজ লুক্কায়িত ছিল, তাহার পূর্ব্বাভাস আমরা সীতার বনবাস-সঙ্কল্পে দেখিয়াছি। কিন্তু এবার সেই তেজের পূর্ণবিকাশ দৃষ্ট হইল। রাবণ অমিততেজা মহাবীর—তাহার ভয়ে পঞ্চবটীর তরুপত্র নিষ্কম্প হইয়া গিয়াছে, পার্শ্বে গোদাবরীর স্রোত মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে, অস্তচূড়াবলম্বী সূর্য্যও যেন রাবণের ভয়ে দিগ্বলয়ের প্রান্তে লুকাইয়া পড়িয়াছেন, এই ভয়ানক অসুর যখন পরিব্রাজকবেশ ত্যাগ করিয়া সহসা রক্তমাল্য পরিয়া তাহার ঐশ্বর্য্য ও শক্তির গর্ব্ব করিতে লাগিল,—তখন সীতা লুক্রেশিয়ার ন্যায় কিংবা ছিন্নলতার ন্যায় ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন না। বিনি লতিকার ন্যায়

কোমল, চীরবাস পরিতে যাইয়া যিনি সাশ্রুনেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, যিনি মৃদুভাষায় নিজের মনের কথা ব্যক্ত করিয়া রামের কর্ণে অমৃতনিষেক করিতেন, সেই তন্বঙ্গী পুষ্পালঙ্কারশোভিনী সীতা সহসা বিদ্যুল্লতার ন্যায় তেজস্বিনী হইয়া উঠিলেন। যাহার ভয়ে জগৎ ভীত, সতী তাহার ভীতিদায়ক হইয়া উঠিলেন। কে তাঁহার ফুল্লকুসুমকোমলরূপে এই বিজয়শ্রী, এই তেজ প্রদান করিল? কে তাঁহার ভাষায় এই ক্রুদ্ধ অগ্নির ন্যায় জ্বালাময় কথা বিচ্ছুরিত করিয়া দিল?—"আমার স্বামী মহাগিরির ন্যায় অটল, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত, আমার স্বামী জগৎপূজ্যচরিত্র-শালী, জগদ্ভীতিদায়ক-তেজোদৃপ্ত, আমার স্বামী সত্যপ্রতিজ্ঞ, পৃথু-কীর্ত্তি; রাক্ষস, তুমি বস্ত্রদ্বারা অগ্নি আহরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, জিহ্বা দ্বারা ক্ষুর লেহন করিতে চাহিতেছ, কৈলাস-পর্ব্বত হস্তদ্বারা উত্তোলন করিতে চেষ্টা পাইতেছ। রামের স্ত্রীকে স্পর্শ কর, এমন শক্তি তোমার নাই। সিংহে ও শৃগালে, স্বর্ণে ও সীসকে যে প্রভেদ, রামের সঙ্গে তোমার তদপেক্ষা অধিক প্রভেদ। ইন্দ্রের শচীকে হরণ করিয়াও তোমার রক্ষা পাইবার সুযোগ থাকিতে পারে, কিন্তু আমাকে স্পর্শ করিলে নিশ্চয় তোমার মৃত্যু।" বক্র কেশ-কলাপ সীতার তেজোদৃপ্ত মুখের চতুর্দ্দিকে তরঙ্গিত হইয়া পড়িয়াছে, ঈষৎ গ্রীবা হেলাইয়া,—ফুল্লকমলপ্রভ রক্তিম বদনমণ্ডল উন্নমিত করিয়া সীতা যখন রাবণকে তীব্রভাষায় ভর্ৎসনা করিলেন, তখন আমরা সতীর মূর্ত্তি দেখিলাম। ভারতের শ্মশানের প্রধূমিত অগ্নি-চ্ছায়ায় স্বামীর পার্শ্বে বনফুলসুন্দর স্থিরপ্রতিজ্ঞ বদনে বিচ্ছুরিত যে

সতীত্বের শ্রী আমাদের চক্ষে রহিয়াছে, শ্মশানের অগ্নি যে শ্রী ভস্মীভূত করিতে পারে নাই, ভারতের প্রত্যেক গ্রাম—প্রত্যেক নদী-পুলিনকে এক অশরীরী পুণ্যপ্রবাহে চিরতীর্থ করিয়া রাখিয়াছে, মরণে যে গরিমা সীমন্ত উদ্ভাসিত করিয়া হিন্দুরমণীর সিন্দূরবিন্দুকে অক্ষয় সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়াছে—আজি জীবনে সীতার সেই চির-নমস্ত সতীমূর্ত্তি আমরা দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম।

রাবণ এই মূর্ত্তির জন্য প্রস্তুত ছিল না;—সে যতগুলি রমণীর কেশাকর্ষণ করিয়া সর্ব্বনাশিনী লঙ্কাপুরীতে লইয়া আসিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেই কত কাতরোক্তি ও বিনয় করিয়া তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি ভিক্ষা করিয়াছে,—স্ত্রীলোকের করুণ কণ্ঠধ্বনি শুনিতে রাবণ অভ্যস্ত। কিন্তু এই অলৌকিক রূপলতায় তাদৃশ মৃদুতা কিছুমাত্র নাই,—পলাশদলসুন্দর চক্ষে একটি অশ্রু নাই। রাবণের ভীতিকর প্রভাব জীবনে এই প্রথমবার প্রতিহত হইল। যে জীবনকে ভয় করে, সে জীবননাশককে ভয় করিবে, কিন্তু সীতা স্বীয় নিঃসহায় অবস্থা স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "বন্ধনই কর বা বধই কর, আমার এ দেহ এখন অসাড়;—রাক্ষস, এ দেহ বা এ জীবন রক্ষা করা আমার আর উচিত নয়।"

"ললাটে ভ্রুকুটিং কৃত্বা রাবণঃ প্রত্যুবাচ হ।"

সীতার দর্পিত উক্তি শুনিয়া বিস্মিত রাবণ ললাট-ভ্রুকুটি-কুঞ্চিত করিয়া বলিল—সে কুবেরকে জয় করিয়া পুষ্পকরথ আনিয়াছে,—জগতের প্রকৃতিপুঞ্জ তাহাকে মৃত্যুর তুল্য ভয় করে,—

"অঙ্গুল্যা ন সমো রামো মম যুদ্ধে স মানুষঃ।"

রাম আমার অঙ্গুলীর সমানও নহে,—কিন্তু বাগ্বিতণ্ডায় বৃথা সময় নষ্ট করা যুক্তিযুক্ত মনে না করিয়া সে বামহস্তে সীতার কেশমুষ্টি ও দক্ষিণ হস্তে তাঁহার উরুদেশ ধারণ করিয়া তাঁহাকে রথের উপর লইয়া গেল। সহসা সেই পঞ্চবটীর বনশ্রী যেন মলিন হইয়া গেল, তরুগুলি যেন নীরবে কাঁদিতে লাগিল, পক্ষীগুলি অবসন্ন হইয়া উড়িতে পারিল না,—বনলক্ষ্মীকে রাবণ লইয়া গেল, সেই বিপুল অম্বুগোদপ্রদেশের বনরাজি হতশ্রী হইয়া পড়িল। সীতার আর্ত্ত চীৎকারধ্বনি শুনিয়া সেই নির্জ্জনে শুধু এক মহাজন লগুড় লইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কেশকলাপ হংসপক্ষের ন্যায় শুভ্র হইয়া গিয়াছে, দণ্ডকারণ্যে বহুবৎসর বাস করিয়া বার্দ্ধক্যে তিনি শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন,—তিনি পরের কলহ মাথায় লইয়া রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলেন। ধন্য জটায়ু, আজ এই হিন্দুস্থানে এমন কে আছেন—যিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তোমার মত প্রাণ দিতে পারেন ?

সীতা আর্ত্তনাদ করিয়া বলিলেন,—"রাম, তুমি দেখিলে না, বনের মৃগপক্ষীও আমাকে রক্ষা করিতে ছুটিতেছে।" যে কর্ণিকারপুষ্প সংগ্রহের জন্য তিনি বনে বনে ছুটিতেন, সেই কর্ণিকারবন লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

"ক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ।"

হংসসারসময়ী আবর্ত্তশোভিনী গোদাবরীকে ডাকিয়া বলিলেন,—

"ক্ষিপ্রং রামায় শংস ত্বং সীতাং হরতি রাবণঃ।"

দিগঙ্গনাদিগকে স্তুতি করিয়া বলিলেন,—

"ক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ।"

রথ ক্রমশঃ লঙ্কার সন্নিহিত হইল, সীতা স্বীয় অলঙ্কারগুলি দেহ হইতে ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন—তাঁহার চরণের নূপুর বিদ্যুতের মত, বক্ষোলম্বিত শুভ্র মুক্তাহার ক্ষীণ গঙ্গারেখার ন্যায়, আকাশ হইতে পতিত হইল, রাবণের পার্শ্বে তাঁহার মুখখানি দিবসে উদিত চন্দ্রের ন্যায় মলিন দেখাইতে লাগিল, সীতার রক্তকৌষেয় বস্ত্রের একার্দ্ধ রাবণের রথের পার্শ্বে উড়িতেছিল। সেই শোকবিমূঢ়া সতীর দুরবস্থা দেখিয়া সমস্ত জগৎ যেন ক্রুদ্ধ হইয়া মৌনভাবে প্রকাশ করিল —"যে সংসারে রাবণ সীতাকে হরণ করিতে পারে, সেখানে ধর্ম্মের জয় নাই,—সেখানে পুণ্য নাই।"

রাবণ সীতাকে লঙ্কাপুরীতে লইয়া আসিল। লঙ্কায় জগতের বিলাসসম্ভার সমস্ত সংগৃহীত, চক্ষুকর্ণের পরিতৃপ্তির জন্য যাহা কিছু কল্পনায় উপস্থিত হইতে পারে, লঙ্কায় তাহার সমস্ত সাম্মিলিত; এই ঐশ্বর্য্যময়ী পুরী সীতাকে দেখাইয়া রাবণ বলিল,—"তুমি আমার প্রতি প্রীত হও, এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য তোমার পদপ্রান্তে,—তোমার অশ্রুক্লিন্ন মুখপঙ্কজ আমাকে পীড়াদান করিতেছে। তোমার সুন্দর মুখ কেন শোকার্ত্ত হইয়া থাকিবে? তোমার স্নিগ্ধ পল্লব-কোমল পাদযুগের তলে আমার মস্তক রাখিতেছি, রাবণ এমন-ভাবে এপর্য্যন্ত কোন রমণীর প্রেম ভিক্ষা করে নাই। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" সীতা এ সকল কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তিনি বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন, রাবণের প্রতি বারংবার রোষ-দীপ্ত বিরক্ত চক্ষে চাহিয়া সীতা আরক্তগণ্ডে ও স্ফুরিত অধরে

তাহাকে বলিলেন—"যজ্ঞমধ্যস্থিত ব্রাহ্মণের মন্ত্রপূত স্রুগ্‌ভাণ্ডমণ্ডিত বেদী স্পর্শ করিবে, চণ্ডালের কি সাধ্য? রাক্ষস, তুমি নিজের মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করিতেছ।" রাবণের দিকে ঘৃণায় পৃষ্ঠ ফিরাইয়া সীতা মৌনী হইয়া রহিলেন, অনবদ্যাঙ্গীর সমস্ত শরীর হইতে ঘৃণা ও অলৌকিক দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। রাবণ অনন্যোপায় হইয়া রাক্ষসীদিগকে বলিল—"ইহাকে অশোকবনে লইয়া যাও, বলে হউক, ছলে হউক, মিষ্টবাক্যে হউক, ভয়প্রদর্শনে হউক, ইহাকে আমার বশীভূত করিয়া দাও।"

সেই অশোকবনের পুষ্পস্তবকনম্র শাখা যেন ভূমিচুম্বন করিতে চাহিতেছে,—অদূরে বিশাল চৈত্যপ্রাসাদ; তাহার সহস্র স্ফটিক-স্তম্ভের প্রত্যেকটির উপরে এক একটি ব্যাঘ্রের প্রতিমূর্ত্তি। নানা-বিচিত্র-প্রতিমূর্ত্তি-শোভিত উপবন। চম্পক, উদ্দালক, সিন্ধুবার ও কোবিদার বৃক্ষ অজস্র পুষ্পসঞ্চয়ে সেই বনটি সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সুন্দর সুন্দর মণিখচিত সোপানপংক্তিতে সংবদ্ধ কৃত্রিম সরোবর তটান্তশোভী বন্যতরুর পুষ্পপাতে ঈষৎ কম্পিত। এই রমণীয় উদ্যানে সীতার আবাসস্থান স্থির হইল। এই আরণ্য-দৃশ্যের পার্শ্বে বিষণ্নমলিনশ্রী সীতাদেবীর যে মূর্ত্তি বাল্মীকি আঁকিয়াছেন, তাহা একান্ত নীরব মাধুর্য্যে, উৎকট রাক্ষসীগণের সাহচর্য্যে অটল সতীত্বগর্ব্বে এবং করুণ শোকাশ্রু দ্বারা আমাদিগের চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট করে।

তাঁহার সহচারিণীগণ কোন দুঃস্বপ্নদৃষ্ট যমালয়ের চরের ন্যায়,—তাহারা বিভীষিকার জীবন্ত মূর্ত্তি—কেহ একাক্ষী, কেহ লম্বিতোষ্ঠী,

কেহ শঙ্কুকর্ণা, কেহ স্ফীতনাসা, কেহ বা "ললাটোচ্ছ্বাসনাসিকা"—তাহাদের পিঙ্গলচক্ষু অবিরত সীতাকে ভীতিপ্রদান করিতেছে। বিনতানাম্নী রাক্ষসী বলিতেছে—"সীতে, তোমার স্বামিস্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছ, আর প্রয়োজন নাই, এখন 'রাবণং ভজ ভর্ত্তারম্.' সম্মত না হইলে—

"সর্ব্বাস্ত্বাং ভক্ষয়িষ্যামহে বয়ম্।"

লম্বিতস্তনী বিকটা রাক্ষসী মুষ্টি দেখাইয়া সীতাকে তর্জ্জন করিতেছে, আর বলিতেছে—"ইন্দ্রের সাধ্য নাই, এ পুরী হইতে তোমাকে রক্ষা করে,—স্ত্রীলোকের যৌবন অস্থায়ী—যত দিন যৌবন আছে, মদিরেক্ষণে, তত দিন সুখভোগ করিয়া লও,—রাবণের সঙ্গে সুরম্য উদ্যান, উপবন ও পর্ব্বতে বিচরণ কর। অস্বীকৃতা হইলে—

"উৎপাট্য বা তে হৃদয়ং ভক্ষয়িষ্যামি মৈথিলি।"

ক্রূরদর্শনা চণ্ডোদরী এ সময়ে "ভ্রাময়ন্তীং মহচ্ছূলং" বিপুল শূল সীতার সম্মুখে ঘুরাইয়া বলিল—"এই ত্রাসোৎকম্পপয়োধরা হরিণশাবাক্ষীকে দেখিয়া আমার বড় লোভ হইতেছে—ইহার যকৃৎ, প্লীহা ও ক্রোড়দেশ আমি উৎপাটন করিয়া ভক্ষণ করি।" প্রঘসা রাক্ষসীও এই কথার অনুমোদন করিল এবং অজামুখী বলিল, "মদ্য লইয়া আইস; আমরা সকলে ইহাকে ভাগ করিয়া খাই।" তৎপরে শূর্পনখা তাণ্ডবনৃত্য করিয়া বলিল—"ঠিক কথা,—'সুরা চানীয়তাং ক্ষিপ্রম্।"

এই বিভীষিকাপূর্ণ রাজ্যে উপবাসকৃশা মৈথিলী এই সকল

তর্জ্জন শুনিয়া "ধৈর্য্যমুৎসৃজ্য রোদিতি।"—নেত্রদুটি জলভারে আকুল হইল; সুন্দরী ধৈর্য্যহীনা হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সীতার সুন্দর মুখ অশ্রুকলঙ্কিত, যিনি ভূষণ পরিলে শিল্পীর শ্রম সার্থক হয়, তিনি ভূষণহীনা, যিনি চিরসুখাভ্যস্তা, তিনি চির-দুঃখিনী—

"সুখার্হা দুঃখসন্তপ্তা, মণ্ডনার্হা অমণ্ডিতা।"

একখানি ক্লিন্ন কৌষেয়বাস তাঁহার উপবাসকৃশ শ্রীঅঙ্গ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। পৌর্ণমাসী জ্যোৎস্নার ন্যায় তিনি সমস্ত জগতের ইষ্টরূপিণী। শোকজালে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে,—ধূমাচ্ছন্ন অগ্নিশিখার ন্যায় তাঁহার রূপ প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ পাইতেছে না, সন্দিগ্ধ স্মৃতির ন্যায় সে রূপ অস্পষ্ট। অশোক-বৃক্ষে রক্ষিত নিঃসংজ্ঞদেহে ধ্যানময়ী কি চিন্তা করিতেছেন? লঙ্কার এই বিষম তেজোবিক্রম, এই অসামান্য ঐশ্বর্য্য,—শত যোজন দূরে জটাবল্কলধারী ভ্রাতৃমাত্রসহায় রামচন্দ্র এই দুর্গম স্থানে আসিবেন কিরূপে? রাক্ষসীরা একবাক্যে বলিতেছে, তাহা অসম্ভব হইতেও অসম্ভব। রাবণ তাঁহাকে দ্বাদশমাস সময় দিয়াছিল, তাহার দশমাস অতীত হইয়া গিয়াছে, আর দুইমাস পরে পাচকগণ রাবণের প্রাতরাশের (Break-fast) জন্য তাঁহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে। সীতা এই নিঃসহায় রাক্ষসপুরীতে স্বগণের মুখ দেখিতে পান না, কেবল রাক্ষসীরা তাঁহাকে নানাবিধ অশ্রাব্য বিদ্রূপ ও তাড়না করিতেছে। এদিকে রাবণ প্রায়ই সে স্থানে আসিয়া কখন ভয় দেখাইতেছে, কখন মধুরভাষায় বলি-

তেছে—"তোমার সুন্দর অঙ্গের যেখানেই আমার চক্ষু পতিত হয়, সেখানেই উহা আবদ্ধ হইয়া থাকে,—তোমার মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী আমি দেখি নাই; তোমার চারু দন্ত এবং মনোহারী নয়নদ্বয় আমাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। তোমার ক্লিন্ন কৌষেয়বাস-খানি আমার চক্ষুর পীড়াদায়ক, লঙ্কার সমস্ত ঐশ্বর্য্য তোমার পদ-তলে, বিলাসিনি, তুমি প্রসন্ন হও।" কিন্তু এই অনশনকৃশা, শোকাশ্রুপূরিতনেত্রা, ক্লিন্ন-কৌষেয়বসনা তাপসী ক্রোধরক্তিম-মুখে বলিলেন, "আমার প্রতি যে দুষ্টচক্ষে চাহিতেছ, তাহা এখনও কেন উৎপাটিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল না! দশরথ রাজার পুত্রবধূ পুণ্যশ্লোক রামচন্দ্রের ধর্ম্মপত্নীর প্রতি যে জিহ্বায় এই সকল পাপ কথা বলিলে,—তাহা এখনও বিদীর্ণ হইল না কেন? তোমার কালরূপী রামচন্দ্র আসিতেছেন, এই অপ্রমেয়-ঐশ্বর্য্য-শালিনী লঙ্কা অচিরে চির-অন্ধকারে লীন হইবে।" এই বলিয়া স্ফুরিতাধরা সীতা সঘৃণ উপেক্ষার সহিত রাবণের দিকে পৃষ্ঠ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন,—তাঁহার পৃষ্ঠলম্বিত একমাত্র বেণী রাক্ষসকুল-সংহারক মহাসর্পের ন্যায় অকুণ্ঠিত হইয়া রহিল।

রাবণ ক্রোধান্ধ হইয়া সীতাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল, তখন স্খলিতহেমসূত্রা, মদবিহ্বলিতাঙ্গী, ধান্যমালিনীনাম্নী রাবণের স্ত্রী তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া গৃহে লইয়া গেল।

ইহার পরে সীতার উপর রাক্ষসীগণের যেরূপ তীব্র শাসন চলিল, তাহা অনুভব করা যাইতে পারে। কিন্তু সকল অত্যাচার-উৎপীড়ন সহিতে হইবে বলিয়া কে এই ক্লিন্নদেহা কোমল ব্রততীকে

এই অসাধারণ ব্রততেজোমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিল? কে এই ফুলসম রমণীকে শূলসম কাঠিন্য প্রদান করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল? কে এই অনশন, এই ছিন্নবাস, এই ভূশয্যাক্লিষ্ট নবনীতকোমল দেহের ভিতর এই অপূর্ব্ব অলৌকিক বিদ্যুতের শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল? কোন্ স্বর্গীয় আশা অসম্ভব রামাগমন ও রাক্ষসধ্বংসের পূর্ব্বাভাস তাঁহার কর্ণে গুঞ্জিত করিয়া অশান্তির মধ্যে তাঁহাকে কথঞ্চিৎ শান্তিকণা প্রদান করিয়াছিল? কে এই বিলাস-ঐশ্বর্য্যকে ঘৃণা ও উপেক্ষা করিতে শিখাইয়া সীতাকে পবিত্র যজ্ঞাগ্নির ন্যায় সমুদ্দীপ্ত করিয়া আমাদের অন্তঃপুরের আদর্শ করিয়া রাখিয়াছে? এই সকল প্রশ্নের এক কথায় উত্তর দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে আমাদের ভ্রমের আশঙ্কা নাই। এই দৈন্যের মধ্যে এই আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য, এই কোমলতার মধ্যে এই অসম্ভব দৃঢ়তা যদ্দ্বারা সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহার নাম বিশ্বাস। বিশ্বাস-ব্রতের ফল অবশ্যম্ভাবী, সীতা সেই বলে যেন দূর ভবিষ্যতের গর্ভ বিদারণ করিয়া পুণ্যের জয় প্রত্যক্ষ করিয়া এত তেজস্বিনী হইয়াছিলেন।

কিন্তু অসামান্যবিপৎসঙ্কুল অবস্থার নিপীড়ন সহ্য করিয়া ধৈর্য্যরক্ষা করা সকলসময় সম্ভবপর হয় না। কখন কখন সীতা ভূতলে পড়িয়া অজস্র কাঁদিতে থাকিতেন; তিনি দুঃখের সীমা দেখিতে না পাইয়া কত কি ভাবিতেন। কখন মনে হইত, রাবণ-কথিত দুইমাস চলিয়া গিয়াছে, সূপকারগণ তাঁহার দেহ খণ্ডখণ্ড করিয়া রাবণের ভোজনের উপযোগী করিতেছে। কখন মনে হইত,

চতুর্দ্দশ বৎসর ত পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, রাম হয় ত অযোধ্যায় ফিরিয়া গিয়াছেন ; বিশালনেত্রা রমণীগণের সঙ্গে তিনি আনন্দে কালাতিপাত করিতেছেন। এই কথা ভাবিতে তাঁহার হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিত। তিনি বিশুষ্কমুখী হইয়া নিরাশ্রয়ভাবে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকিতেন, তখন তাঁহার সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইয়াও যেন প্রকাশ পাইত না—

"পদ্মিনী পঙ্কদিগ্ধেব বিভাতি ন বিভাতি চ।"

কখন মনে হইত, রামচন্দ্র হয় ত তাঁহার জন্য শোকাকুল হন নাই—তাঁহার হৃদয় যোগীর ন্যায়—সংসারের সুখদুঃখের উর্দ্ধে, তিনি পূজা ও ভালবাসা আকর্ষণ করেন, তিনি নিজে কাহারও জন্য কখন ব্যাকুল হন নাই—এই ভাবিতে তাঁহার হৃদয় দুরুদুরু করিয়া উঠিত, তিনি আপনাকে একান্ত নিরাশ্রয় মনে করিতেন। কখন বা রাক্ষসীগণের তাড়না অসহ্য হইলে তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বলিতেন—"রাক্ষসিগণ, তোমরা অধিক কেন বল, আমাকে ছিন্নভিন্ন বা বিদীর্ণ করিয়া ফেল, অথবা অগ্নিতে দগ্ধ কর, আমি কিছুতেই রাবণের বশীভূত হইব না।" এই ভাবে তিনি একদিন দুঃখের প্রান্তসীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, অশোকের একটি শাখা অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া তিনি ভাবিতেছিলেন, -তাঁহার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় কে তাঁহাকে শিংশপাবৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে চিরমধুর রামনাম শুনাইল, সেই নাম শুনিয়া অকস্মাৎ তাঁহার চিত্ত মথিত হইয়া চক্ষের প্রান্তে অশ্রুকণা দেখা দিল। তিনি সজলচক্ষে বক্র কেশরাশির ভার এক হস্তে

অপসৃত করিয়া ঊৰ্দ্ধমুখে চিরেপ্সিত-দয়িত-নাম-কীৰ্ত্তনকারীকে দেখিতে লাগিলেন। অনাবৃষ্টিসন্তপ্ত পৃথিবী যেরূপ জলবিন্দুর জন্য উৎকণ্ঠিতভাবে প্রত্যাশা করে, মধুর রামকথা শুনিবার জন্য তিনি সেইরূপ ব্যগ্র হইয়া অপেক্ষা করিলেন।

হনুমান্ কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, "হে ক্লিন্নকৌষেয়বাসিনি, আপনি কে, অশোকের শাখা অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়াছেন? আপনার পদ্মপলাশচক্ষু জলভারে আকুলিত হইয়াছে কেন? আপনি কি বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতী,—স্বামীর সঙ্গে কলহ করিয়া এখানে আসিয়াছেন, কিংবা চন্দ্রহীনা হইয়া চন্দ্রের রমণী পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন? আপনি যক্ষ, রক্ষ, বসু, ইহাদের কাহার রমণী? আপনি ভূমিস্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন, আপনার অশ্রু-জল দেখা যাইতেছে, এজন্য আমার আপনাকে দেবতা বলিয়াও বোধ হইতেছে না। যদি আপনি রামের পত্নী সীতা হন, দুরাত্মা রাবণ যদি জনস্থান হইতে আনিয়া আপনার এ দুর্দ্দশা করিয়া থাকে, তবে সে কথা বলিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।" সীতা সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিয়া হনুমান্‌কে সমীপবর্ত্তী হইতে আজ্ঞা করিলে দূত নিম্নে অবতরণ করিলেন। তখন হনুমান্‌কে দেখিয়া তিনি শঙ্কিত হইলেন,—সহসা মনে হইল, এ ত ছদ্মবেশধারী রাবণ নহে? যিনি দয়িতের সংবাদপ্রাপ্তির আশায় ক্ষণপূর্ব্বে উৎফুল্লা হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি সহসা ভয়বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন, ভয়ে অশোকের শাখা হইতে বাহুলতা স্খলিত হইয়া পড়িল, তিনি মৃত্তিকার উপর বসিয়া পড়িলেন—

"যথা যথা সমীপং স হনুমানুপসর্পতি।
তথা তথা রাবণং সা তং সীতা পরিশঙ্কতে॥"

কিন্তু এই সন্দেহ দূর করা হনুমানের পক্ষে সহজ হইল। রামের সংবাদ পাইয়া সীতার মুখ প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল, কৃশাঙ্গীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, তিনি একটি কথা নানা ইঙ্গিতে হনুমানের নিকট বারংবার জানিতে চাহিলেন—রাম তাঁহার জন্য শোকাতুর হইয়াছেন কি না? হনুমান্ তাঁহাকে জানাইলেন, "যিনি গিরির ন্যায় অটল, তিনি শোকে উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার গাম্ভীর্য্য চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দিবারাত্রি তাঁহার শান্তি নাই,—কুসুমতরু দেখিলে উন্মত্তভাবে তিনি আপনার জন্য কুসুম তুলিতে যান,—পদ্মপ্রসূনগন্ধি মন্দমারুতের স্পর্শে মনে করেন, ইহা আপনার মৃদু নিশ্বাস, স্ত্রীলোকের প্রিয় কোন সামগ্রী দেখিলে তিনি উন্মত্ত হইয়া আপনার কথা বলিতে থাকেন, জাগরণে আপনার কথা ভিন্ন আর কিছু বলেন না, আবার সুপ্ত হইলেও—

"সীতেতি মধুরাং বাণীং ব্যাহরন্ প্রতিবুধ্যতে।"

তিনি প্রায়ই উপবাসে দিনযাপন করেন—

"ন মাংসং রাঘবো ভুঙ্‌ক্তে ন চৈব মধু সেবতে।"

এই কথা শুনিতে শুনিতে সীতা আর সহ্য করিতে পারিলেন না, সাশ্রুচক্ষে বলিয়া উঠিলেন,—

"অমৃতং বিষসংপৃক্তং ত্বয়া বানরভাষিতম্।"

তৎপরে হনুমান্ রামের করভূষণ অঙ্গুরীয় অভিজ্ঞানস্বরূপে সীতাকে প্রদান করিলেন—

"গৃহীত্বা প্রেক্ষমাণা সা ভর্ত্তুঃ করবিভূষিতম্।
ভর্ত্তারমিব সম্প্রাপ্তা সা সীতা মুদিতাভবৎ॥"

তখন সেই চারুমুখীর বহুদিনের দুঃখ ঘুচিয়া যে আনন্দরেখায় গণ্ডদ্বয় উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমরা চিত্রিত করিতে পারিব না,—সেই অঙ্গুরীর সুখস্পর্শে বহুদিনের স্মৃতি, বহু সুখ দুঃখ, সেই গন্ধমাদনাদি গোদাবরীপুলিনের রামসঙ্গ, কত আদর ও স্নেহের কথা মনে পড়িল, তাঁহার কৃষ্ণপক্ষ্মান্ত চক্ষুর কোণ হইতে অজস্র অশ্রুবিন্দু পতিত হইতে লাগিল। হনুমান্ সীতাকে পৃষ্ঠে করিয়া রামের নিকট লইয়া যাইতে চাহিলে সীতা স্বীকৃতা হইলেন না। "রাক্ষসেরা পশ্চাৎ অনুসরণ করিলে আমি সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া যাইব, আর স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমি পরপুরুষ স্পর্শ করিব না।"

আর একদিনের চিত্র মনে পড়ে,—রাক্ষসগণ নিহত হইয়াছে, সীতাকে বিভীষণ রামের নিকট লইয়া যাইতে আসিলেন। নানা রত্ন ও বিচিত্র বস্ত্র দেখিয়া পাংশুগুণ্ঠিতসর্ব্বাঙ্গী সীতা বলিলেন—

"অস্নাতা দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভর্ত্তারং রাক্ষসেশ্বর।"

হনুমান্ সীতার সঙ্গিনী রাক্ষসদিগকে তাড়না করিতে গেলে ক্ষমা-শীলা সীতা বারণ করিয়া বলিলেন, "প্রভুর নিয়োগে ইহারা যাহা করিয়াছে, তজ্জন্য ইহারা দণ্ডার্হ নহে।"

তাহার পর বিশাল সৈন্যসংঘের সম্মুখে রাম সীতাকে অতি কঠোর কথা বলিলেন, লজ্জায় লজ্জাবতী যেন মরিয়া গেলেন, কিন্তু তেজস্বিনীর মহিমা স্ফুরিত হইয়া উঠিল;—রামের কঠোর উক্তি প্রাকৃতজনোচিত, ইহা বলিতে সাধ্বীর কণ্ঠ দ্বিধা কম্পিত

হইল না—তিনি পতির পদে অশেষ প্রণতি জানাইয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং উদ্যত অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া অধোমুখে স্থিত স্বামীকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক জলন্ত চিতায় প্রবেশ করিলেন।

তৎপরে কষিতস্বুবর্ণপ্রতিমার ন্যায় এই দেবীকে উঠাইয়া অগ্নি রামের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন,—যিনি আজন্মশুদ্ধা, তাঁহাকে আর আমি কি শুদ্ধ করিব!"

উত্তরকাণ্ডের শেষ দৃশ্যটি হৃদয়বিদারক,—বনে বিসর্জ্জন দেও-য়ার জন্য লক্ষ্মণ সীতাকে লইয়া গিয়াছেন, তীররুহ বৃক্ষমালায় সুশোভিত সুন্দর গঙ্গার পুলিনে আসিয়া লক্ষ্মণ বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণের কান্না দেখিয়া সীতা বিস্মিতা হইলেন, এই সুন্দর গঙ্গার উপকূলে আসিয়া লক্ষ্মণের কোন্ মনোব্যথা জাগিয়া উঠিল বুঝিতে পারিলেন না,—"তুমি দুই রাত্রি রামচন্দ্রের মুখারবিন্দ দেখ নাই, সেই ক্ষোভে কি কাঁদিতেছ?"—অতর্কিত সীতা এই প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু শেষে যখন লক্ষ্মণ তাঁহার পাদমূলে নিপতিত হইয়া বলিলেন, "আজ আমার মৃত্যু হইলেই মঙ্গল হইত" এবং কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে মর্ম্মচ্ছেদী বিসর্জ্জনের সংবাদ জানাইলেন,—তখন স্থির বিগ্রহের ন্যায় সীতা দাঁড়াইয়া রহিলেন, হয়ত গঙ্গানীরসিক্ত তীরতরুর পুষ্পসারসমৃদ্ধ গন্ধবহ তখন সীতার ললাটের স্বেদ ও চক্ষের অশ্রু মুছিবার জন্য তাঁহাকে ধীরে ধীরে স্পর্শ করিতেছিল—গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া পাষাণ প্রতিমার ন্যায় তিনি দুঃসহ সংবাদ সহ্য করিলেন, পরমুহূর্ত্তে বিকল হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন—"লক্ষ্মণ, রামচন্দ্রের সঙ্গে যে বনবাস আনন্দে

সহিয়াছিলাম, আজ রাম ছাড়া সেই বনবাস কেমন করিয়া সহিব?" তাঁহার কপোলে অজস্র অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, সীতা সেই অশ্রু মার্জ্জনা না করিয়া বলিলেন, "ঋষিগণ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তোমার কেন বনবাস হইয়াছে— আমি কি উত্তর দিব? প্রভু, তুমি আমাকে নির্দ্দোষ জানিয়াও আমায় এই বিপদ-সমুদ্রে ফেলিলে, আজ এই গঙ্গাগর্ভই আমার শান্তির একমাত্র স্থান, কিন্তু আমি তোমার সন্তান ধারণ করিতেছি—এ অবস্থায় আত্মহত্যা উচিত নহে।"

গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া সীতা নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন, এবং শেষে বলিলেন—

"পতির্হি দেবতানার্য্যাঃ পতির্বন্ধুঃ পতির্গুরুঃ।
প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মাদ্ভর্ত্তুঃ কার্য্যং বিশেষতঃ॥"

পতিই নারীগণের দেবতা, বন্ধু ও গুরু, তাঁহার কার্য্য আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়।" অশ্রুরুদ্ধ গদ্গদকণ্ঠে লক্ষ্মণকে বলিলেন— "লক্ষ্মণ এই দুঃখিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাও, রাজার আদেশ পালন কর।'

ইহার অনেক দিন পরে একদা সমস্ত সভাসদ-পরিবৃত মহারাজ রামচন্দ্র সীতাকে পরীক্ষার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন,— সে দিন, ক্লিন্ন কৌষেয়বসনা করুণাময়ী দুঃখিনী সীতা যুক্ত-করে বলিলেন, "হে মাতঃ বসুন্ধরে, যদি আমি কায়মনোবাক্যে পতিকে অর্চ্চনা করিয়া থাকি, তবে আমাকে তোমার গর্ভে স্থান দাও।"

সীতার কাহিনী, দুঃখ পবিত্রতা এবং ত্যাগের কাহিনী। এই

সতীচিত্র বাল্মীকি চিরজীবন্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহার বিশাল আলেখ্য হিন্দুস্থানের প্রতি গৃহে গৃহে এখনও সুশোভিত। অলক্ষিতভাবে সীতার পত্নীত্ব হিন্দুস্থানের পত্নীকুলের মধ্যে অপূর্ব্ব সতীত্ব-বুদ্ধির সঞ্চার করিয়া আমাদের গৃহস্থালীকে পবিত্র করিয়া রাখিয়াছে। নূতন সভ্যতার স্রোতে নূতন বিলাস-কলা-ময় চিত্র দেখিয়া যেন সেই স্থায়ী ও অমর আলেখ্যের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাহীন না হই! এস মাতা! তুমি সহস্র সহস্র বৎসর গৃহ-লক্ষ্মীর ন্যায় হিন্দুর গৃহে, যে পুণ্যশক্তির সঞ্চার করিয়াছ—তাহার পুনরুদ্দীপন কর, আবার ঘরে ঘরে তোমার জন্য মঙ্গলঘট প্রতিষ্ঠিত হউক। তুমি ভারতবাসিনীদিগের লজ্জা, বিনয় ও দৈন্যে, তুমি তাঁহাদিগের কঠোর সহিষ্ণুতায়, প্রাণের প্রতি উপেক্ষায় ও পবিত্র আত্মসমর্পণের মধ্যে বিরাজ কর, তোমার সুকোমল অলক্তক-রাগ-রঞ্জিত পাদযুগের নূপুর-মুখর সঞ্চালনে গৃহে গৃহে স্বর্গীয় সতীত্বের বার্ত্তা ধ্বনিত হউক। তুমি আমাদের আদর্শ নহ, তুমি আমাদের প্রাপ্ত,—তুমি কবির সৃষ্টি নহ, তুমি ভগবানের দান। আমাদিগের নানা দুঃখ ও বিড়ম্বনার মধ্যে তোমারই প্রতিচ্ছায়া অলক্ষ্যে ভাসিয়া বেড়ায় ও তাহাতেই সমস্ত দৈন্য ঘুচিয়া আমাদের স্বল্প খাদ্য ও ছিন্ন কন্থার নিদ্রা পরম পরিতৃপ্তিকর হইয়া উঠে।

হনুমান্‌।

যৌথ-পরিবারে পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং পত্নীর যেরূপ স্থান, ভৃত্য বা সচিবেরও সেইরূপই একটি স্থান; এই বিচিত্র প্রীতির সম্বন্ধ ত্যাগের ভাবে মহিমান্বিত হইয়া গৃহধর্ম্মকে কিরূপ অখণ্ড সৌন্দর্য্য প্রদান করিতে পারে,—রামায়ণকাব্যে তাহা উৎকৃষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

হনুমান্‌ প্রথমতঃ সুগ্রীবের সচিবরূপে রামলক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হন। ইনি সচিবোচিত সদ্‌গুণাবলীতে ভূষিত; ইঁহার প্রথম আলাপ শ্রবণ করিয়াই রাম মুগ্ধচিত্তে লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন—'এ ব্যক্তিকে ব্যাকরণশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী বলিয়া বোধ হয়, ইঁহার বহুকথার মধ্যে একটিও অপশব্দ শ্রুত হইল না',—

"বহু ব্যাহরতানেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্‌।"

"ঋক্‌, যজু ও সামবেদে পারদর্শী না হইলে এভাবে কেহ কথা কহিতে পারে না। ইহার মুখ, চক্ষু ও ভ্রূ দোষশূন্য এবং কণ্ঠোচ্চারিত বাণী হৃদয়হর্ষিণী।" অশোকবনে সীতার সঙ্গে পরিচয়ের প্রাক্কালে ইনি তাঁহার সহিত সংস্কৃতভাষায় কথোপকথন করিবেন কি না—মনে মনে বিতর্ক করিয়াছিলেন। সমুদ্রের তীরে জাম্ববান্‌ ইঁহাকে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের বরণীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইনি শাস্ত্রদর্শী ও সুপণ্ডিত ছিলেন।

কিন্তু শুধু পাণ্ডিত্যই সচিবের প্রধান গুণ নহে,—অটল প্রভুভক্তিও তাঁহার অত্যাবশ্যক গুণ।

সুগ্রীব বালির ভয়ে জগৎ ভ্রমণ করিতেছিলেন। কোথায় প্রখরসৌরকরমণ্ডিত যবদ্বীপ, কোথায় রক্তিমাভ দুরতিক্রম্য লোহিতসাগরের খর্জ্জুর ও গুবাকতরুপূর্ণ বেলাভূমি, কোথায় বা দক্ষিণসমুদ্রের সীমান্তস্থিত স্থির অভ্রাবলীর ন্যায় পুষ্পিতক পর্ব্বত—পৃথিবীর নানা দিগ্‌দেশে ভীতচিত্তে সুগ্রীব পর্য্যটন করিতেছিলেন। তখন যে কয়েকটি বিশ্বস্ত অনুচর সর্ব্বদা তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী ছিলেন, তন্মধ্যে হনুমান্ সর্ব্বপ্রধান। সুগ্রীবের প্রতি অটল ভক্তির তিনি নানারূপে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এস্থলে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে।

সমুদ্রোপকূলে উপস্থিত হইয়া বানরসৈন্য এক সময়ে একান্ত হতাশ হইয়া পড়িল; সীতার সন্ধান পাওয়া গেল না—সুগ্রীবের নির্দ্দিষ্ট একমাসকাল অতীত হইয়া গিয়াছে—অতঃপর সুগ্রীবের আদেশে তাহাদের শিরশ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী, এই শঙ্কায় বানরবাহিনী আকুল হইয়া উঠিল;—তাহারা পরিশ্রান্ত, ক্ষুৎপিপাসাতুর, নিরাশাগ্রস্ত এবং মৃত্যুদণ্ডের ভয়ে ভীত। পিপাসার তাড়নায় ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে তাহারা একস্থলে পদ্মরেণুরক্তাঙ্গ-চক্রবাক-দর্শনে এবং জলভারার্দ্র-শীতলবায়ু-স্পর্শে কোন জলাশয় অদূরবর্ত্তী বিবেচনায় অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রাণের ভয় বিসর্জ্জন দিয়া তাহারা বহুক্রোশব্যাপী এক গভীর অন্ধকারগুহার মধ্যে জলান্বেষণে ঘুরিতে ঘুরিতে সহসা পৃথিবীনিম্নে এক সাধুপুষ্পিত বাপীবহুল

মনোরম রাজ্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারিত হইলে, তাহারা প্রাণের আশঙ্কায় পুনরায় বিকল হইয়া পড়িল। তখন যুবরাজ অঙ্গদ ও সেনাপতি তার সমস্ত বানরবৃন্দকে সুগ্রীবের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। তাঁহারা বলিলেন—"কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিয়া গেলে ক্রূরপ্রকৃতি সুগ্রীবের হস্তে আমাদের মৃত্যু নিশ্চিত, এস আমরা এই সুরক্ষিত সুন্দর অধিত্যকায় সুখে বাস করি, আর স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার প্রয়োজন নাই।" সমস্ত বানরসৈন্য এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিল—"সুগ্রীব উগ্রস্বভাব এবং রাম স্ত্রৈণ। নির্দ্দিষ্টকাল অতীত হইয়াছে, এখন রামের প্রীতির জন্য সুগ্রীব অবশ্যই আমাদিগকে হত্যা করিবে।" হনুমান্‌ সুগ্রীবকে ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করাতে অঙ্গদ উত্তেজিত-কণ্ঠে বলিলেন—"যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠের জীবদ্দশাতেই জননীসমা তৎপত্নীকে গ্রহণ করে, সে অতি জঘন্য; বালি এই দুরাচারকে রক্ষকরূপে দ্বারে নিয়োগ করিয়া বিলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ দুষ্ট প্রস্তরদ্বারা গর্ত্তের মুখ আচ্ছাদন করিয়া আইসে, সুতরাং তাহাকে আর কিরূপে ধর্ম্মজ্ঞ বলিব? সুগ্রীব পাপী, কৃতঘ্ন ও চপল, সে স্বয়ং আমাকে যৌবরাজ্য প্রদান করে নাই, বীর রামই আমার যৌবরাজ্যের কারণ। রামের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া সে প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়াছিল—লক্ষ্মণের ভয়ে জানকীর অন্বেষণার্থ আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছে, তাঁহার আবার ধর্ম্মজ্ঞান কি? সে স্মৃতিশাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘন করিয়াছে—এখন জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে কেহ আর তাহাকে বিশ্বাস করিবে না।

সে গুণবান্ বা নির্গুণ হউক, আমাকে সে হত্যা করিবে—আমি শত্রুপুত্র।”

অঙ্গদের এই সকল কথায় বানরগণ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল, তাহারা ক্রমাগত বালির প্রশংসা ও সুগ্রীবের নিন্দাবাদ করিতে লাগিল।

এই উত্তেজিত সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে হনুমান্ অটলসঙ্কল্পারূঢ়। তিনি দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—“যুবরাজ, আপনি মনে করিবেন না, এই বানরমণ্ডলী লইয়া এই স্থানে আপনি রাজত্ব করিতে পারিবেন। বানরগণ চঞ্চলস্বভাব, তাহারা এখানে স্ত্রীপুত্রহীন হইয়া কখনই আপনার আজ্ঞাধীন থাকিবে না। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, এই জাম্ববান্, সুহোত্র, নীল এবং আমি,—আমাদিগকে আপনি সামদানাদি রাজগুণে কিংবা উৎকট দণ্ড দ্বারাও সুগ্রীব হইতে ভেদ করিতে পারিবেন না। আপনি তারের বাক্যে এই গর্ত্তে অবস্থান নিরাপদ্ মনে করিতেছেন, কিন্তু লক্ষ্মণের বাণে ইহার বিদারণ অতি অকিঞ্চিৎকর।”

বিপৎকালে এই ধৈর্য্য ও তেজ প্রকাশ করিয়া হনুমান্ বানরমণ্ডলীকে আত্মকলহ ও গৃহবিচ্ছেদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

হনুমান্ সুগ্রীবের শুধু আজ্ঞাপালনকারী ভৃত্য ছিলেন না, সতত তাঁহাকে সুমন্ত্রণা দ্বারা তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রবুদ্ধ করিয়া দিতেন। জগদ্ভ্রমণক্লান্ত সুগ্রীবকে ইনিই, মাতঙ্গমুনির আশ্রমসন্নিকটে ঋষ্যমূকপর্ব্বতে প্রবেশ বালির নিষিদ্ধ, ইহা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। বালিবধের পরে যখন বর্ষাক্ষয়ে শরৎকালের সূচনায়

গিরিনদীসমূহ মন্থরগতি হইল—তাহাদের পুলিনদেশ ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল, সেই সিকতাভূমিশোভী শ্যাম সপ্তচ্ছদতরুর তরুণ পল্লব এবং অসন ও কোবিদারবৃক্ষের কুসুমিত সৌন্দর্য্য গগনালম্বিত হইয়া গিরিসানুদেশে চিত্রপটের ন্যায় অঙ্কিত হইল, সেই সুখশরৎকালে কিষ্কিন্ধাপুরী রমণীগণের সমতালপদাক্ষর তন্ত্রীগীতে বিলাসের পর্য্যঙ্কে সুখস্বপ্নে বিভোর ছিল,—সুগ্রীবের শুভ্র প্রাসাদশেখর কাঞ্চীর নিস্বন এবং স্খলিত হেমসূত্রের হিল্লোলে স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। তখন কিষ্কিন্ধার গিরিগুহার একটি স্থানে ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যায় কর্ত্তব্যের স্থিরচক্ষু জাগ্রত ছিল—তাহা বিলাসের মোহে ক্ষণেকের জন্যও আচ্ছন্ন হয় নাই, তাহা সতত প্রভুর হিতপন্থার প্রতি স্থিরলক্ষ্য ছিল। লক্ষ্মণের কিষ্কিন্ধাপ্রবেশের বহু-পূর্ব্বে, শরৎকাল পড়িতে না পড়িতে, হনুমান্‌ সুগ্রীবকে রামের সঙ্গে তাঁহার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। সমস্ত বানরবাহিনীকে রামকার্য্যে সমবেত করিবার জন্য আদেশ বাহির করিয়া লইয়াছিলেন। সে আদেশ এই—

"ত্রিপঞ্চরাত্রাদূর্দ্ধং যঃ প্রাপ্নুয়াদিহ বানরঃ।
তস্য প্রাণান্তিকো দণ্ডো নাত্র কার্য্যা বিচারণা।"

'যে বানর পঞ্চদশ দিবসের পরে কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে—ইহাতে আর বিচারবিবেচনা নাই।'

ইহার পরে রোষস্ফুরিতাধরে লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধায় প্রবেশ করিলেন। বিলাসী সুগ্রীব বিপৎ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি না করিয়া ক্রূরকটাক্ষে অঙ্গদের দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন—

"ন মে দুর্ব্যাহৃতং কিঞ্চিন্নাপি মে দুরনুষ্ঠিতম্।
লক্ষ্মণো রাঘবভ্রাতা ক্রুদ্ধঃ কিমিতি চিন্তয়ে॥
ন খল্বস্তি মম ত্রাসো লক্ষ্মণান্নাপি রাঘবাৎ।
মিত্রং ত্বস্থানকুপিতং জনয়ত্যেব সম্ভ্রমম্॥
সর্ব্বথা সুকরং মিত্রং দুষ্করং প্রতিপালনম্॥"

"আমি কোনরূপ অন্যায় আচরণ বা দুর্ব্যবহার করি নাই; রামচন্দ্রের ভাই লক্ষ্মণ কেন ক্রোধ করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। লক্ষ্মণ হইতেই কি, রাম হইতেই কি আমার ত ভয় করিবার কিছু নাই; তবে বিনা কারণে মিত্র ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এইমাত্র আশঙ্কা। মিত্রলাভ অতি সুলভ, কিন্তু মৈত্রী রক্ষা করাই কঠিন।"

তখন বড় বিভ্রাট দেখিয়া হনুমান্ কামবশীভূত সুগ্রীবকে অদূরস্থ পুষ্পিত-সপ্তচ্ছদ-বৃক্ষ দেখাইয়া শরৎকালের আবির্ভাব বুঝাইয়া দিলেন—"রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ আর্ত্ত, তাঁহারা কষ্ট পাইতেছেন, আপনি প্রতিশ্রুতিপালনে তৎপর হন নাই,—তাঁহারা দুঃখে পড়িয়া ক্রোধের কথা বলিলে তাহা আপনার গণনীয় নহে। আপনি পরিবারবর্গের ও নিজের যদি কুশল চান, লক্ষ্মণের পদে পতিত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করুন, নতুবা তাঁহার শরে কিষ্কিন্ধা বিনষ্ট হইবে।" হনুমানের বাক্যে আতঙ্কিত হইয়া সুগ্রীব স্বীয়-কণ্ঠ-বিলম্বিত ক্রীড়ামাল্য ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং লক্ষ্মণকে প্রসন্ন করিতে যত্নবান্ হইলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, হনুমান্ সুগ্রীবকে শুভমন্ত্রণা দ্বারা অন্যায়পথ হইতে সাবধানে রক্ষা করিতেন,—শুধু আদেশ শ্রবণ ও

প্রতিপালন করিয়া যাইতেন না। এদিকে সুগ্রীবের বিরুদ্ধে কোন ষড়্‌যন্ত্র হইলে একাকী তিনি একশতের মত দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া তাহা নিবারণ করিতেন—সুগ্রীবের বিপৎকালে তাঁহার সমস্ত ক্লেশের সমধিকভাগ নিজে বহন করিতেন,—কিষ্কিন্ধার বিলাস-হিল্লোল তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে প্রবাহিত হইয়া যাইত, তিনি স্বীয় কর্ত্তব্যে বদ্ধলক্ষ্য চক্ষু ক্ষণেকের জন্যও বিলাসমোহাচ্ছন্ন হইতে দিতেন না।

সুগ্রীবের এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ভৃত্য, শাস্ত্রদর্শী শুভাকাঙ্ক্ষী সচিব, রামচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পরেই তাঁহার গুণমুগ্ধ ও একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়েন।

রামলক্ষ্মণকে প্রথম দর্শন করিয়াই তাঁহার যে হৃদয়োচ্ছ্বাস হইয়াছিল, তাহা তাঁহার প্রথম আলাপেই প্রকাশ পাইতেছে—

"বিশাল চক্ষুর দৃষ্টিতে পম্পাতীরবর্ত্তী বৃক্ষরাজি দেখিতে দেখিতে যাইতেছেন—আপনারা কে? আপনাদের বাহু আয়ত, সুবৃত্ত ও পরিঘোপম;—আপনারা দুইজনে সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ। আপনাদের সুলক্ষণ দেহ সর্ব্বভূষণধারণযোগ্য—আপনারা ভূষণহীন কেন?"

রাম-সুগ্রীবের মৈত্রী স্থাপিত হইল। সুগ্রীব যখন সমস্ত সৈন্য সীতার অন্বেষণে প্রেরণ করেন, তখন রাম হনুমান্‌কে স্বীয়-নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কটি অভিজ্ঞানস্বরূপ সীতার জন্য দিয়াছিলেন, তাঁহার মন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল—এ কার্য্যে হনুমান্‌ই সফলতা লাভ করিবেন।

নানাদিগ্দেশ ঘুরিয়া সৈন্যবৃন্দ সীতার কোন খোঁজই পাইল না; বন্ধুর পর্ণপুষ্পহীন এক গিরিগুহা অতিক্রম করিয়া তাহারা সমুদ্রের তীরে উপনীত হইল। এই সময়ে তাহারা অনশনে প্রাণত্যাগ সঙ্কল্প করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল,—সহসা জটায়ুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সম্পাতি তাহাদিগকে সীতার সন্ধান বলিয়া দিল—সীতা দূর সমুদ্রের পারে লঙ্কাপুরীতে আছেন, বানরগণের মধ্যে কেহ সেইখানে না গেলে সীতার সংবাদ পাওয়া অসম্ভব।

সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া তাহারা বিস্ময়ে, ভয়বিহ্বলচক্ষে অপার জলরাশি দেখিতে লাগিল। মেঘের সঙ্গে চূর্ণতরঙ্গ মিশিয়া গিয়াছে—সীমাহীন বিশাল সরিৎপতির তাণ্ডব-নর্ত্তন দূর-পাটল-আকাশস্পর্শী,—উন্মাদনময় ফেনিল আবর্ত্তরাশি। তাহারা ভয়-ব্যথিত হইয়া পড়িল,—কে এই অবধিশূন্য মহাসাগর উত্তীর্ণ হইবে? শরভ, মৈন্দ, দ্বিবিদ প্রভৃতি সেনাপতিগণ একে একে দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং অস্ফুটবাক্ অনন্ত জলরাশির কলকল্লোল শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। অঙ্গদ দাঁড়াইয়া বলিলেন—"পরপারে যাইতে পারি, কিন্তু ফিরিয়া আসিতে পারিব কি না, সন্দেহ।" নৈরাশ্যবিহ্বল ভয়গ্রস্ত বানরবাহিনী সমুদ্রোপকূলে সমবেত হইয়া যে যাহার পরাক্রমের ইয়ত্তা করিতে লাগিল, কিন্তু সেই অনিলোদ্ধূত ভ্রান্ত ঊর্ম্মিসঙ্কুল বিপুল জলাশয় উত্তীর্ণ হইবার সাধ্য কাহারও নাই—ইহাই বিদিত হইল। বানরসৈন্যের মধ্যে হনুমান্ মৌনভাবে একস্থানে উপবিষ্ট ছিলেন,—বানরগণের নানা আশঙ্কা ও বিক্রমসূচক আলাপ তিনি নিঃশব্দে শুনিতেছিলেন—

নিজে কোন কথাই বলেন নাই; জাম্ববান্‌ তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—

"বীর বানরলোকস্য সর্ব্বশাস্ত্রবিদাং বর।
তূষ্ণীমেকান্তমাশ্রিত্য হনুমন্‌ কিং ন জল্পসি ॥"

"বানরগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের শ্রেষ্ঠ হনুমন্‌, তুমি একান্ত মৌনভাব অবলম্বন করিয়াছ কেন? এই বিষণ্ণ সৈন্যদিগকে আর কে উৎসাহ দিয়া কথা বলিবে—তুমি ভিন্ন এ কার্য্যের ভার আর কে লইতে পারে?"

হনুমান্‌ শুধু আহ্বানের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, এ কার্য্য যে তাঁহারই,—তিনি তাহা জানিতেন। জাম্ববানের কথার উত্তর না দিয়া তিনি সচল হিমাচলের ন্যায় সুদৃঢ়ভাবে সমুত্থান করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অসীম সাহস ও স্বীয়শক্তিতে বিপুল আস্থা তাঁহার ললাটে একটি প্রদীপ্ত শিখা অঙ্কিত করিয়া দিল।

কি ভাবে তিনি সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা কবিকল্পনায় জড়িত হইয়া আমাদের চক্ষে অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বহুক্রোশ-ব্যাপী সমুদ্র তিনি বহু কৃচ্ছ্র ও বিপদ্‌ সহ্য করিয়া উত্তীর্ণ হইয়া-ছিলেন—তিনি পথে বিশ্রামের জন্য মৈনাকপর্ব্বতের রম্য একটি শৃঙ্গ সম্মুখে প্রসারিত দেখিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রভুকার্য্য সম্পাদন না করিয়া বিশ্রাম করিতে তিনি ইচ্ছা করেন নাই; তিনি বলিয়াছিলেন—

"যথা রাঘবনির্ম্মুক্তঃ শরঃ শ্বসনবিক্রমঃ।
গচ্ছেৎ তদ্বৎ গমিষ্যামি লঙ্কাং রাবণপালিতাম্‌ ॥"

প্রকৃতই তিনি রামকরনির্ম্মুক্ত শরের ন্যায় লঙ্কাভিমুখে ছুটিয়াছিলেন। রামের ইচ্ছার মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহের ন্যায় আশুগতি হনুমান্ লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইলেন!

লঙ্কায় পৌঁছিয়া হনুমান্ সরল, খর্জ্জুর ও কর্ণিকারবৃক্ষপূর্ণ বেলাভূমির অদূরে রক্তবর্ণ প্রাচীরের ঊর্দ্ধে সপ্ততল হর্ম্ম্যরাজির উচ্চশীর্ষ দেখিতে পাইলেন। পর্ব্বতশীর্ষস্থিত দুর্গম লঙ্কাপুরীর অতুল বৈভব ও বিক্রম এবং দুর্গাদির সংস্থান দেখিয়া হনুমান্ ভীত হইলেন। যে উৎসাহে তিনি পুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে উৎসাহ যেন সহসা দমিয়া গেল, সুরক্ষিত লঙ্কার প্রভাব দেখিয়া তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন—তাঁহার মুখে সহসা আশঙ্কার কথা উচ্চারিত হইল—

"ন হি যুদ্ধেন বৈ লঙ্কা শক্যা জেতুং সুরৈরপি।
ইমান্তুবিষমাং লঙ্কাং দুর্গাং রাবণপালিতাম্।
প্রাপ্যাপি সুমহাবাহুঃ কিং করিষ্যতি রাঘবঃ॥"

'এই লঙ্কা দেবগণও যুদ্ধে জয় করিতে পারেন না। রাবণরক্ষিত এই দুর্গম, ভীষণ লঙ্কাপুরীতে রামচন্দ্র উপস্থিত হইয়াই বা কি করিবেন!' যাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস—

"ন হি রামসমঃ কশ্চিদ্‌বিদ্যতে ত্রিদশেষপি।"

—'দেবগণের মধ্যেও কেহ রামের তুল্য নহেন', তাঁহার অটল বিশ্বাসের মূলে যেন একটা আঘাত পড়িল। লঙ্কার বহির্দ্দেশে সুগন্ধি নীপ, প্রিয়ঙ্গু ও করবীতরু যেখানে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শোভিত ছিল, হনুমান্ সেই দিকে চাহিয়া একবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

রাত্রিকালে রাবণের শয্যাগৃহে যখন তাহাকে নিদ্রিতাবস্থায় তিনি চোরের ন্যায় সন্তর্পণে দেখিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার নির্ভীক চিত্তে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। হস্তিদন্তনির্ম্মিত উজ্জ্বলস্বর্ণমণ্ডিত খট্টায় মহার্ঘ আস্তরণ বিস্তারিত, তাহার এক পার্শ্বে শুভ্র চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় একটি ছত্র—তন্নিম্নে মহাবলশালী উগ্রমূর্ত্তি রাবণ প্রসুপ্ত —তাহাকে দেখিয়া—

"* * * পরমোদ্বিগ্নঃ সোঽপাসর্পৎ সুভীতবৎ।"

উদ্বিগ্নভাবে হনুমান্‌ ভীতচিত্তে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলেন। অশোকবনে সীতার সম্মুখে উপস্থিত রাবণকে দেখিয়াও তাঁহার মনে এইরূপ ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল—

"স তথাপ্যুগ্রতেজাঃ সন্‌ নির্ধূতস্তস্য তেজসা।
পত্রে গুহ্যান্তরে সক্তো মতিমান্‌ সংবৃতোঽভবৎ॥"

উগ্রমূর্ত্তি রাবণের তেজে তাড়িত হইয়া তিনি শিংশপাবৃক্ষের শাখাপল্লবে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। কোন মহাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রাক্কালে, উদ্দেশ্যের বিরাট্‌ভাব এবং প্রবল প্রতিপক্ষের কথা মনে করিয়া সময়ে সময়ে এইরূপ ভয় হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু হনুমানের উন্নত কর্ত্তব্যবুদ্ধি তাঁহাকে শীঘ্রই উদ্বোধিত করিয়া তুলিল। তাঁহার লঙ্কাপরিদর্শনব্যাপারে তিনি কত চিন্তা ও ধৈর্য্যের সহিত অগ্রসর হইয়াছেন, বাল্মীকি তাহার ইতিহাস দিয়া গিয়াছেন।

প্রকাশ্যভাবে, তাঁহার বিপদের সম্ভাবনা আছে এবং বৈদেহীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার তাঁহার পক্ষে দুর্ঘট হইতে পারে—

"ঘাতয়ন্তীহ কার্য্যাণি দূতাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।"

পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে অনেক সময়ে দূতগণ কার্য্য নষ্ট করিয়া থাকে—সুতরাং স্পর্দ্ধা পরিত্যাগপূর্ব্বক ছদ্মবেশে তিনি রাত্রিকালে লঙ্কা অনুসন্ধান করিবেন, ইহাই স্থির করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

শনৈঃশনৈঃ নিশীথিনী আসিয়া লঙ্কার প্রতি বিলাসপ্রকোষ্ঠে প্রমোদ-দীপাবলী জ্বালিয়া দিল; হনুমান্ রাবণের বিশাল পুরীতে রমণীবৃন্দের বিচিত্র আমোদপ্রমোদ প্রত্যক্ষ করিলেন। পানশালায় শর্করাসব, ফলাসব, পুষ্পাসব প্রভৃতি বিবিধপ্রকার সুরা বৃহৎ স্বর্ণভাজনে সজ্জিত ছিল; রাবণ এবং তাহার স্ত্রীগণ কুক্কুটের মাংস, দধিসিক্ত বরাহমাংস কতক আহার করিয়া কতক ফেলিয়া রাখিয়াছে; অম্ল ও লবণপাত্র এবং নানাপ্রকার অর্দ্ধভক্ষিত ফল চতুর্দ্দিকে প্রক্ষিপ্ত রহিয়াছে; নৃত্যগীতক্লান্তা অঙ্গনাগণের অলসলুলিত দেহ হইতে বসন স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে; নানস্থান হইতে আহৃত রমণীবৃন্দ পরস্পরের ভুজসূত্রে গ্রথিত হইয়া বিচিত্রকুসুমখচিত মাল্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে; একটু দূরে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা লঙ্কাপুরীশ্বরী প্রসুপ্তা মন্দোদরীর স্বর্ণপ্রতিমার ন্যায় কান্তি দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, এই সীতা। তাঁহার চেষ্টা কৃতার্থ হইল ভাবিয়া তিনি আহ্লাদে সাশ্রুনেত্র হইলেন।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, রামবিরহিতা সীতা এভাবে সুপ্তা থাকিতে পারেন না,—এরূপ ভূষণ ও পরিচ্ছদ, এরূপ সৌম্য শান্তির ভাব পতিপরায়ণা সীতার পক্ষে অসম্ভব। আবার হনুমান্ বিমর্ষ হইয়া খুঁজিতে লাগিলেন। কোনস্থানেই তিনি নাই।

হায়, সীতা কি রাবণকর্ত্তৃক হৃতা হইবার সময় স্বর্গের একটি স্খলিত মুক্তাহারের ন্যায় সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছেন, অথবা পিঞ্জরাবদ্ধ শারিকার ন্যায় অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন? রাবণের উৎপীড়নে হয় ত বা তিনি আত্মহত্যা করিয়া থাকিবেন। যে রামচন্দ্র তাঁহার শোকে উন্মত্ত হইয়া অশোকপুষ্পগুচ্ছকে আলিঙ্গন দিতে ধাবিত হন, রাত্রিদিন যাঁহার চক্ষে নিদ্রা নাই, স্বপ্নেও যাঁহার মুখ হইতে 'সীতা' এই মধুরবাক্য নিঃসৃত হয়, সেই বিরহবিধুর প্রভুর নিকট হনুমান্ কি বলিয়া উপস্থিত হইবেন? উর্ম্মিময় ক্রীড়োন্মত্ত মহাবারিধির বেলাভূমিতে যে বিশাল বানরবাহিনী তাঁহার মুখ হইতে সীতার সংবাদ পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আকাশপানে তাকাইয়া আছে,—তাহাদের নিকট তিনি যাইয়া কি বলিবেন? অনুসন্ধানশ্রান্ত হনুমানের মনের উপর নৈরাশ্যের একটা প্রবল আবর্ত্ত আসিয়া পড়িল, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে আশা আসিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া উঠাইল; কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া এরূপ নৈরাশ্য অবলম্বন কাপুরুষের লক্ষণ, আমি আবার অনুসন্ধান করিব, হয়ত আমার দেখা ভাল হয় নাই। হনুমান্ লঙ্কার বিচিত্র হর্ম্ম্যসমূহ ও বিচিত্র কাননরাজি পুনরায় পর্য্যটন করিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, আশার মৃতমন্ত্রে যেন তিনি পুনরায় উজ্জীবিত হইয়া উঠিলেন। রক্ষঃপ্রাসাদের সমস্ত স্থান তিনি তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিলেন, কিন্তু সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। রক্ষঃপুরীর বিশালতা তাঁহার নিকট শূন্যময় বলিয়া বোধ হইল। কোথায়ও সীতা নাই—সীতা জীবিত নাই,—হনুমান গভীর-নৈরাশ্য-মগ্ন হইয়া ক্লান্ত-পাদক্ষেপে

কোথায় যাইবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। "রাজপুত্রদ্বয় এবং বানরবাহিনী আমার প্রতীক্ষায় আছে, আমি তাহাদের উদ্যত আশামঞ্জরী ছিন্ন করিতে পারিব না। রামচন্দ্র নিরাশ হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন, লক্ষ্মণ স্বীয় অগ্নিতুল্য শরদ্বারা নিজে ভস্মীভূত হইবেন—সুগ্রীবের মৈত্রী বিফল হইবে;—আমার প্রত্যাগমনে এই সকল বিভ্রাট অবশ্যম্ভাবী।" এই ভাবিয়া হনুমান্ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন; কখনও বা রাবণকে বধ করিবার জন্য ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন,—কখনও বা স্থির করিলেন—

"চিতাং কৃত্বা প্রবেক্ষ্যামি।"

'প্রজ্বলিত চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিব'; "কিংবা সাগরোপকূলে অনশনে দেহত্যাগ করিব,—

"শরীরং ভক্ষয়িষ্যন্তি বায়সাঃ শ্বাপদানি চ।"

'আমার শরীর কাক ও শ্বাপদগণ ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে।' কখনও বা ভাবিলেন, "আমি বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক বনে বনে জীবন কাটাইব।"

প্রভুর কার্য্য অথবা কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের যে ব্যগ্রতা হনুমানের চরিত্রে দৃষ্ট হয়, অন্য কোথায়ও তাহা দেখা যায় না। রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন—

"যাহি ভৃত্য নিযুক্তঃ সন ভর্ত্তৃকর্ম্মণি দুষ্করে।
কুর্য্যাৎ তদনুরাগেণ তমাহুঃ পুরুষোত্তমম্॥"

'যিনি প্রভুকর্ত্তৃক দুষ্কর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অনুরাগের সঙ্গে তাহা সম্পূর্ণ করেন,—তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ। হনুমান্ প্রাণপণে এবং অনু-

রাগের সহিত রামের কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রভুসেবার এই উন্নত আদর্শ ধর্ম্মভাবে পরিণত হইয়া থাকে। হনুমান্ বিপুল শারীরিক শ্রম পণ্ড হইল দেখিয়া অধ্যাত্মশক্তির উদ্বোধনে চেষ্টিত হইলেন।

"আমি নৈরাশ্যমগ্ন হইলে বহু ব্যক্তির আশা বিফল হইবে। বহু ব্যক্তির শান্তিসুখ আমার সফলতার উপর নির্ভর করিতেছে, সুতরাং চিতাপ্রবেশ বা বানপ্রস্থ-অবলম্বন আমার পক্ষে উচিত হয় না। আমার উপর যে সুমহান্ ন্যাস অর্পিত, তাহার সাধনে যেন আমার কোন ত্রুটি না হয়।" "সুতরাং,—

"ইহৈব নিয়তাহারো বৎস্যামি নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।"

'এই স্থানেই আমি ইন্দ্রিয়নিরোধপূর্ব্বক সংযতাহারী হইয়া প্রতীক্ষা করিব।' তখন করজোড়ে হনুমান্ ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন, তাঁহার মুখ মৃদু বিকম্পিত হইয়া এই শ্লোক উচ্চারণ করিল—

"নমোঽস্তু রামায় সলক্ষ্মণায়
দেব্যৈ চ তস্যৈ জনকাত্মজায়।
নমোঽস্তু রুদ্রেন্দ্রযমানিলেভ্যো
নমোঽস্তু চন্দ্রাগ্নিমরুদ্গণেভ্যঃ॥"

রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রুদ্র, যম, ইন্দ্র প্রভৃতিকে নমস্কার করিলেন এবং—"নমস্কৃত্য সুগ্রীবায় চ"—সুগ্রীবকে নমস্কার করিয়া ধ্যানিবৎ স্থির হইয়া রহিলেন। যখন তাঁহার নির্ম্মল কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে ও কষ্টসহিষ্ণু প্রকৃতিতে এইরূপ ধর্ম্মের প্রতি নির্ভরের ভাব সম্পূর্ণ জাগিয়া উঠিল, তখন সহসা অশোক বনের তরুশ্রেণীর শ্যামায়মান দৃশ্যাবলীর প্রতি তাঁহার চক্ষু নিপতিত হইল।

এস্থানে হনুমান্ সাধারণ ভৃত্য নহেন—সাধারণ সচিব নহেন, এস্থানে তিনি প্রভুভক্তির সিদ্ধতপস্বী, তপঃপ্রভাব তাঁহার পূর্ণমাত্রায় ছিল। রাবণের অন্তঃপুরে তিনি যখন দেখিতে পাইলেন, স্খলিতহারা কোন রমণী অর্দ্ধনগ্নদেহে অপর একটি সুন্দরীকে আলিঙ্গন করিয়া আছে, কোন সুলক্ষণা রমণীর দেহযষ্টি হইতে চেলাঞ্চল উড়িয়া গিয়াছে—নিদ্রিতাবস্থায় শ্বাসবেগে কাহারও চারুবৃত্ত পয়োধরের উপর মুক্তাহার ঈষৎ দুলিত হইতেছে, সেই ঈষৎ কম্পিত দেহলতা মন্দানিল-চালিত একখানি চিত্রের ন্যায় দেখা যাইতেছে, আবার কোন রমণী ভুজান্তরসংলগ্ন বীণাকে গাঢ়রূপে পরিরম্ভণ করিয়া অসংবৃত কেশপাশে প্রসুপ্তা হইয়া আছে—তখন,—

"জগাম মহতীং শঙ্কাং ধর্ম্মসাধ্বসশঙ্কিতঃ।
পরদারাবরোধস্য প্রসুপ্তস্য নিরীক্ষণম্॥"

অন্তঃপুরের প্রসুপ্তপরস্ত্রী দর্শনে ধর্ম্ম লুপ্ত হইল, এই চিন্তায় হনুমান্ অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

"ইদং খলু মমাত্যর্থং ধর্ম্মলোপং করিষ্যতি।"

আজ নিশ্চয়ই আমার ধর্ম্ম লুপ্ত হইল—এই আশঙ্কায় হনুমান্ বিকল হইলেন ; কিন্তু তিনি তন্নতন্ন করিয়া স্বহৃদয় অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন—তথায় কোন কলঙ্কের রেখা পড়ে নাই।

"ন তু মে মনসা কিঞ্চিৎ বৈকৃত্যমুপপদ্যতে।"

"মনো হি হেতুঃ সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং প্রবর্ত্তনে।
শুভাশুভাস্ববস্থাসু তচ্চ মে সুব্যবস্থিতম্॥"

'আমার চিত্তে বিকারের লেশ নাই ; মনই ইন্দ্রিয়গণের পাপ-পুণ্যের প্রবর্ত্তক,—কিন্তু আমার মন শুভসঙ্কল্পে দৃঢ়।'—"আর বৈদেহীকে অনুসন্ধান করিতে হইলে, রমণীবৃন্দের মধ্যেই করিতে হইবে—তাহার উপায়ান্তর নাই।"

এই তাপসচরিত্র রামকার্য্যে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির ইহাই প্রাক্‌-সূচনা। হনুমান্‌ অশোকবনে সীতার ম্লান, উপবাসশীর্ণ, ক্লিন্নকাষায়বসিনী মূর্ত্তি দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন,—রাবণ সহস্ররূপে শক্তিসম্পন্ন হউক—তাহার রক্ষা নাই ; ইনি লঙ্কার পক্ষে কালরজনীস্বরূপিণী। রামের অমোঘ বাণ যদি প্রভাবশূন্য হয়, এই সাধ্বীর তপঃপ্রভাব তাহাতে তীক্ষ্ণতা প্রদান করিবে। সীতা আপনিই আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থা—অপর সহায় উপলক্ষ মাত্র, সীতা—"রক্ষিতা স্বেন শীলেন।" ধর্ম্মনিষ্ঠ হনুমান্‌ ধর্ম্মবল কি, তাহা জানিতেন ; এইজন্যই সীতাকে দেখিয়া তাঁহার সমস্ত আশঙ্কা দূরীভূত হইল,—আত্মপক্ষের বলের উপর প্রবল আস্থা জন্মিল।

এই নৈতিক পবিত্রতা আমরা কিষ্কিন্ধা হইতে প্রত্যাশা করি নাই। যেখানে বালির ন্যায় মহিমান্বিত রাজা স্বীয় কনিষ্ঠের বধূকে হরণ এবং স্ত্রীঘটিত কলহে লিপ্ত হইয়া মায়াবীকে হত্যা করেন, যেখানে রামসখা মহাপ্রাজ্ঞ সুগ্রীব জ্যেষ্ঠের জীবিতকালেই সেই জ্যেষ্ঠের পত্নীকে স্বীয় প্রমোদশয্যায় আকর্ষণ করিয়াছিলেন, যেখানে পাতিব্রত্যের অপূর্ব্ব অভিনয় করিয়া অতিরিক্ত পানে মুক্তলজ্জা তারা সুগ্রীবের অঙ্কশায়িনী হইতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ

করেন নাই—সেই কিষ্কিন্ধাপুরীতে উগ্রতপা, তীক্ষ্ণনৈতিকবুদ্ধি-সম্পন্ন, কর্ত্তব্যকার্য্যে সতত জাগ্রতচক্ষু, কলুষহীন, বিলাসলেশ-বর্জ্জিত ও বিপদে অকুণ্ঠিত দাস্যভক্তির অবতার হনুমান্‌কে আমরা প্রত্যাশা করি নাই।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, নানাপ্রকারে সীতার অনুসন্ধান করিয়াও যখন হনুমান্ বিফল হইলেন, তখন তিনি অধ্যাত্মশক্তির বিকাশ করিতে চেষ্টা করিলেন। দৈহিক শ্রম পণ্ড হইয়াছিল। তখন উন্নত-কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া তিনি তাপস-বৃত্তি অবলম্বন করিলেন, এই বৃত্তির উন্মেষ করিবার উপযোগী সাধনা ও পবিত্র জীবন তাঁহার ছিল।

তিনি এবার প্রফুল্ল, তাঁহার শ্রম এবার সার্থক হইবে,—সাফল্যের পূর্ব্বভরসা তিনি মনে পাইলেন। অশোকবনে যাইয়া তিনি শিংশপাবৃক্ষ হইতে সীতাকে প্রথম দেখিতে পাইলেন,—সীতা সুখার্হা অথচ দুঃখসন্তপ্তা, মণ্ডনার্হা—অমণ্ডিতা, তিনি উপবাসকৃশা, পঙ্কদিগ্ধা পদ্মিনীর ন্যায়—"বিভাতি ন বিভাতি চ"—প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ পাইতেছেন না;—তাঁহার দুটি চক্ষু অশ্রুপূর্ণ, পরিধান ছিন্ন কৌষেয়বাস,—তাঁহার চতুর্দ্দিকে উৎকট স্বপ্নের ন্যায় একাক্ষী, শঙ্কুকর্ণা, লম্বিতস্তনী, ধ্বস্তকেশী, বিকট রাক্ষসীমূর্ত্তি,—নারকীয় পরিবার যেন একটি স্বর্গীয় সুষমাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে—কিন্তু সেই দীনা তাপসীমূর্ত্তিতে অপূর্ব্ব ধৈর্য্য সূচিত—

"নাত্যর্থং ক্ষুভ্যতে দেবী গঙ্গেব জলদাগমে।"

'জলদাগমে গঙ্গার ন্যায় ইনি ক্ষোভরহিত।' যখন রাক্ষসীরা আসিয়া কেহ শূল দ্বারা তাঁহার প্লীহা উৎপাটন করিতে চাহিল,—হরিজটা, বিকটা, বিনতা প্রভৃতি বিরূপা চেড়ীবৃন্দের মধ্যে কেহ বা তাঁহাকে "মুষ্টিমুদ্যম্য তর্জ্জতি", কেহ বা "ভ্রাময়তি মহৎ শূলং"—কেহ কেহ বা মাংসলোলুপ শ্যেনপক্ষীর ন্যায় তাঁহার প্রতি উন্মুখ হইয়া তাণ্ডবলীলা প্রকট করিতে লাগিল, তখন একবার সীতার সেই সুগম্ভীর ধৈর্য্যের বাঁধ টুটিয়া গিয়াছিল,—তিনি "ধৈর্য্যামুৎসৃজ্য রোদিতি,"—ধৈর্য্যত্যাগ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আবার যখন রাবণ নানাপ্রকার লোভপ্রদর্শনেও তাঁহাকে বশীভূত করিতে অসমর্থ হইয়া মুষ্টিপ্রহার করিতে অগ্রসর হইল,—ধান্যমালিনী আসিয়া রাবণকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল—তখনও সীতার ধৈর্য্য অপগত হইল, রক্ষোহস্তে অপমানিতা সীতা ধূলি-লুণ্ঠিতা হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু এই উৎকট বিপদ্‌রাশির মধ্যেও তিনি পবিত্র যজ্ঞাগ্নির ন্যায় স্বীয় পুণ্য-প্রভায় দীপ্ত ছিলেন, তাঁহার অশ্রুসিক্ত মুখে স্বর্গের তেজ স্ফুরিত হইতেছিল। হনুমান্‌ এই বিপন্না সাধ্বীর প্রতি পূজকের ন্যায় ভক্তির চক্ষে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, তাঁহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

হনুমান্‌ শিংশপাবৃক্ষারূঢ় ছিলেন, কি উপায়ে সীতার সহিত কথাবার্ত্তা কহিবেন, প্রথমতঃ তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। হঠাৎ উপস্থিত হইলে সীতা তাঁহাকে দেখিয়া ভীত হইবেন, রাক্ষসগণ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিবে—তাঁহার সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ-কারের পূর্ব্বেই সমূহ গোলযোগ উৎপন্ন হইবে। চেড়ীগণ যখন

ত্রিজটার স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিবার জন্য সীতাকে ছাড়িয়া একটু দূরে গিয়াছে, শেষ রজনীতে বিনিদ্র সীতা অশোকতরুর শাখা অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, সুকেশীর বক্র কেশগুচ্ছ তাঁহার কর্ণান্তভাগে বিলম্বিত হইয়া পড়িয়াছে, তখন হনুমান্ শিংশপাবৃক্ষ হইতে মৃদুস্বরে রামের ইতিহাস কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন; সহসা অনির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে আশাতীতরূপে প্রিয় রামকথা শুনিয়া সীতার গণ্ড বাহিয়া অবিরলধারে জল পড়িতে লাগিল,—তিনি স্বীয় সুন্দর মুখমণ্ডল ঈষৎ উন্নমিত করিয়া অশ্রুপূর্ণচক্ষে শিংশপাবৃক্ষের ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলেন—তাঁহার কৃষ্ণ ও বক্র কেশান্তগুচ্ছ নিবিড়ভাবে তাঁহার মুখপদ্ম ঘিরিয়া পড়িল। তখন কে এই উষর, মরুভূতুল্য স্থানে শীতল গন্ধবহের আবির্ভাবের ন্যায় রামের সংবাদ লইয়া তাঁহার নিকট দাঁড়াইল? কে ওই নতজানু, কৃতাঞ্জলি ও অভিবাদনশীল হইয়া তাঁহাকে অমৃততুল্য বাক্যে বলিল—

"কা নু পদ্মপলাশাক্ষি ক্লিন্নকৌশেয়বাসিনি।
দ্রুমস্য শাখামালম্ব্য তিষ্ঠসি ত্বমনিন্দিতে॥
কিমর্থং তব নেত্রাভ্যাং বারি স্রবতি শোকজম্।
পুণ্ডরীকপলাশাভ্যাং বিপ্রকীর্ণমিবোদকম্॥"

হে পদ্মপলাশাক্ষি, ক্লিন্নকৌশেয়বাসিনি অনিন্দিতে, আপনি কে, অশোকের শাখা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন? পদ্মপলাশদল হইতে নীরবিন্দু পতনের ন্যায় আপনার দুইটি সুন্দর চক্ষু হইতে অশ্রু পড়িতেছে কেন?"

হনুমানের আগমনে সীতার নিবিড় বিপদরাশির অন্ত হইবে—

এই আশার সূচনা হইল,—আঁধার অশোকবনের চিত্রখানিতে যেন একটি কিরণ-রেখা প্রবেশ করিয়া তাহা উজ্জ্বল করিয়া দিল। কিন্তু হনুমান্‌কে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া প্রথমতঃ রাবণভ্রমে সীতা আতঙ্কিত হইয়াছিলেন; সেই আশঙ্কায় তাঁহার কুন্দশুভ্র অঙ্গুলি-গুলি অশোকের শাখা ছাড়িয়া দিল; তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন, ভয়ে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন; সেই ভয়ের মধ্যেও তিনি একটু আনন্দ পাইয়াছিলেন; এক এক বার মনে করিতেছিলেন, ইঁহাকে দেখিয়া আমার চিত্ত হৃষ্ট হইতেছে কেন?

হনুমান্ তখন তাঁহার প্রতীতির জন্য রামের সমস্ত ইতিহাস তাঁহাকে শুনাইলেন—শ্যামবর্ণ রাম এবং "সুবর্ণচ্ছবি" লক্ষ্মণের দেহ-সৌষ্ঠব সমস্ত বর্ণন করিলেন—তখন সীতার বিশ্বাস হইল, হনুমান্ রামের দূত। বিপৎ-সমুদ্রে পতিতা সীতা সেই শেষরাত্রে যেন কূল পাইলেন,—আশার নক্ষত্র কালরজনী ভেদ করিয়া কিরণদান করিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সীতা হনুমান্‌কে শতশত প্রশ্ন করি-লেন,—রামের কার্য্যকলাপ, তাঁহার অভিপ্রায়—সমস্ত জানিয়া সীতা পুলকাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হনুমানের নিকট রামের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক ছিল—তাহা তিনি অভিজ্ঞানস্বরূপ আনিয়াছিলেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তিনি তাহা দেন নাই, সাধারণ দূত সেই অঙ্গুরীয়ক দ্বারাই কথোপকথনের মুখবন্ধ করিত, কিন্তু হনুমান্ সেই বাহ্যচিহ্নের উপর ততটা মূল্য আরোপ করেন নাই। তাঁহার পরিচয়ে সীতার সম্পূর্ণ প্রতীতি উৎপাদন করিয়া শেষে অঙ্গুরীয়কটি দিয়াছিলেন।

সীতার নিকট হইতে অভিজ্ঞানস্বরূপ চূড়ামণি লইয়া তিনি বিদায় হইলেন, কিন্তু রাবণের সৈন্যবল, সভা ও মন্ত্রণাদি সম্বন্ধে বিশেষরূপে সমস্ত তথ্য অবগত না হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করা তিনি উচিত মনে করিলেন না। এ সম্বন্ধে সুগ্রীব কি রাম তাঁহাকে কোন উপদেশই দেন নাই—তথাপি তাঁহার দৌত্য সম্পূর্ণরূপে সফল করিবার জন্য রাবণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আবশ্যক মনে করিলেন। তিনি যদি তস্করের মত ফিরিয়া যান, তবে তাঁহার জগজ্জয়ী মহাপ্রতাপশালী প্রভু রামচন্দ্রের ভৃত্যের যোগ্য কার্য্য করা হয় না, এই চিন্তা করিয়া তিনি অশোকবনের তরুলতা উৎপাটন করিয়া লঙ্কাবাসীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহারা যাইয়া রাবণকে সংবাদ দিল, "কে একটা মহাশক্তিধর বীর অশোকবন ভগ্ন করিয়া রাক্ষসগণকে ভয় দেখাইতেছে—সে বহুক্ষণ সীতার সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছে।" রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ধৃত করিবার আদেশ প্রচার করিল, বহু রাক্ষসসৈন্য নষ্ট করিয়া হনুমান ধরা দিলেন। রাবণের সভায় আনীত হইলে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল—তিনি বিষ্ণু, ইন্দ্র,কিংবা কুবের, ইঁহাদের মধ্যে কাহার দূত?

হনুমান্ বলিলেন—

"ধনদেন ন মে সখ্যং বিষ্ণুনা নাস্মি চোদিতঃ।
কেনচিদ্রামকার্য্যেণ আগতোঽস্মি তবান্তিকম্॥"

"আমার কুবেরের সঙ্গে সখ্য নাই, বিষ্ণুও আমাকে পাঠান নাই, আমি রামের কোন কার্য্যের জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি।"

এই সভায় রাবণের অতুল ঐশ্বর্য্য ও বিপুল প্রতাপ দেখিয়া হনুমান্ বিস্মিত হইয়াছিলেন, কিন্তু যেরূপ নির্ভীকভাবে তিনি রাবণকে ধর্ম্মসঙ্গত উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই উপদেশ অবহেলা করিলে লঙ্কার ভাবী বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, ইহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়া রাবণপ্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডের জন্য যেরূপ অবিচলিত সাহসে তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন—তাহাতে আমরা তাঁহার কর্ত্তব্য-কঠোর অটল-সঙ্কল্পারূঢ় মূর্ত্তির আভাস পাইয়া চমৎকৃত হই। তিনি ত্রিলোক-বিজয়ী সম্রাটের সম্মুখে ধর্ম্মের কথা ধর্ম্মযাজকের মত কহিয়া-ছিলেন,—পরিণামদর্শী বিজ্ঞের ন্যায় ভবিষ্যতের চিত্র আঁকিয়া দেখাইয়াছিলেন এবং ফলাফল তুচ্ছ করিয়া কর্ত্তব্যনিষ্ঠার দৃঢ়-ভিত্তিতে বীরের ন্যায় দাঁড়াইয়াছিলেন,—ক্রুদ্ধ রাবণ যখন তাঁহার উপর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রদান করিল, তখনও তাঁহার উজ্জ্বল উদগ্ররূপ অবিচলিত ছিল,—তাঁহার প্রশস্ত ললাট একটুও ভয়-কুঞ্চিত হয় নাই। বিভীষণের উপদেশে তাঁহার অপর প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা হইল।

হনুমান্ যখন সাগর অতিক্রম করিয়া তাঁহার পথপ্রেক্ষী বানর-মণ্ডলীর নিকট সীতার সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সেই নিরাশা-বিশীর্ণ মৃতকল্প কপিকুল এক বিশাল আনন্দকলরবে জাগিয়া উঠিল, তাহারা নাচিয়া গাহিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল।

হনুমান্ বহুকষ্ট সহ্য করিয়া কর্ত্তব্য সমাধা করিয়াছিলেন। আজ একদিনের জন্য বন্ধুগণের সঙ্গে আনন্দ-উৎসবে যোগদান করিলেন,—সেই আনন্দোচ্ছ্বাস সমুদ্রের উপকূল টল্‌মল্ করিতে

লাগিল। সুগ্রীবের আদেশ-রক্ষিত মধুবনে যাইয়া তাহারা একটি প্লাবন বা ঘূর্ণাবর্ত্তের ন্যায় পতিত হইল, মধুবনপ্রহরী দধিমুখ বানর তাহাদিগকে বাধা দিতে যাইয়া প্রহার-জর্জ্জরিত দেহে পলায়ন করিল।

তখন হনুমান্ একদিনের জন্য বন্ধুজনের সঙ্গে মধুবনে মধুফলাস্বাদনে প্রমত্ত হইলেন। সকলে মিলিয়া তাহারা উৎসবের দিন কি ভাবে বঞ্চন করিয়াছিল, বাল্মীকি তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন—

"গায়ন্তি কেচিৎ প্রহসন্তি কেচিৎ।
নৃত্যন্তি কেচিৎ প্রণমন্তি কেচিৎ॥"

কেহ গান করিতে লাগিল, কেহ হাসিতে লাগিল, কেহ নাচিতে লাগিল, কেহ বা প্রণাম করিতে লাগিল।

কর্ত্তব্যের কঠোর শ্রান্তির পর এই প্রমোদচিত্র কি সুন্দর!

হনুমান্ লঙ্কায় শুধু সীতাকে দেখিয়া আইসেন নাই; তিনি লঙ্কাসম্বন্ধে রামকে যে সকল অবস্থা জানাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি সূচিত হইয়াছে। হনুমান্ জিজ্ঞাসিত হইয়া রামকে লঙ্কাসম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

"লঙ্কাপুরী হস্তী, অশ্ব ও রথে পূর্ণ, উহার কপাট দৃঢ়বদ্ধ ও অর্গলযুক্ত, উহার চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড চারিটি দ্বার আছে। ঐ দ্বারে বৃহৎ প্রস্তর, শর ও যন্ত্রসকল সংগৃহীত রহিয়াছে। প্রতিপক্ষসৈন্য উপস্থিত হইবামাত্র তদ্দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে। ঐ দ্বারে যন্ত্রসজ্জিত লোহময় শত শত শতঘ্নী আছে। লঙ্কার চতুর্দ্দিকে

স্বর্ণপ্রাচীর, উহা মণিরত্নখচিত ও দুর্লঙ্ঘ্য। উহার পরই একটি ভয়ঙ্কর পরিখা আছে। উহা অগাধ ও নক্রকুম্ভীরপূর্ণ। প্রত্যেক দ্বারে এক একটি বিস্তীর্ণ সেতু দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহা যন্ত্রলম্বিত, প্রতিপক্ষীয়সৈন্য উপস্থিত হইলে ঐ যন্ত্রদ্বারা সেতু রক্ষিত হয় এবং শত্রুসৈন্য ঐ যন্ত্রবলেই পরিখায় নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। লঙ্কায় নদীদুর্গ, পর্ব্বতদুর্গ ও চতুর্ব্বিধ কৃত্রিম দুর্গ আছে। ঐ পুরী দূর-প্রসারিত সমুদ্রের পারে। সমুদ্রে নৌকার পথ নাই, উহার চতুর্দ্দিক্ নিরুদ্দেশ।"

হনুমান্ গুণীর সম্মান জানিতেন। রাবণকে দেখিয়া হনুমানের মনে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার উদ্রেক হইয়াছিল; তাহার ধর্ম্মশূন্যতা-দর্শনে তিনি দুঃখিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সচল হিমাদ্রির ন্যায় সমুন্নতদেহ রাক্ষসরাজের প্রতাপ দেখিয়া হনুমান্ বলিয়া উঠিয়াছিলেন—

"অহো রূপমহো ধৈর্য্যমহো সত্ত্বমহো দ্যুতিঃ।
অহো রাক্ষসরাজস্য সর্ব্বলক্ষণযুক্ততা॥
যদ্যধর্ম্মো ন বলবান্ স্যাদয়ং রাক্ষসেশ্বরঃ।
স্যাদয়ং সুরলোকস্য সশক্রস্যাপি রক্ষিতা॥"

'ইঁহার কি অপূর্ব্ব রূপ, কি ধৈর্য্য, কি শক্তি, কি কান্তি, সর্ব্বাঙ্গে কি সুলক্ষণ! যদি ইনি অধর্ম্মশীল না হইতেন, তবে সমস্ত দেবতারা, এমন কি ইন্দ্রও ইঁহার আশ্রয়ভিক্ষা করিতে পারিতেন।' রামচন্দ্রকে হনুমান্ বলিয়াছিলেন—

"রাবণ যুদ্ধার্থী, কিন্তু ধীরস্বভাব ও সাবধান, তিনি স্বয়ংই সতত সৈন্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন।"

রামায়ণের সর্ব্বত্র হনুমান্ আশা ও শান্তির কথা বহন করিয়া আনিয়াছেন। অশোকবনে সীতা যখন চেড়ীগণপীড়িতা হইয়া দুঃখের চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন,—যখন লঙ্কাপুরী কাল-রজনীর মত তাঁহাকে গ্রাস করিয়া অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, তখন শুভ অঙ্গুরীয়কের অভিজ্ঞান লইয়া হনুমান্ তাঁহাকে নৈরাশ্য-সমুদ্র হইতে আশার তরণীতে উত্তোলন করিয়াছিলেন। রাম যখন বিরহখিন্ন হইয়া মরুভূর উত্তপ্ত-বায়ু-পীড়িত পান্থের ন্যায় সীতার সংবাদের জন্য উন্মুখ হইয়াছিলেন,—বানরসৈন্যগণ যখন সুগ্রীব-কৃত প্রাণদণ্ডের ভয়ে শুষ্কমুখে সকাতর নৈরাশ্যে সমুদ্রের ঊর্দ্ধচর দাত্যূহ ও টিট্টিভপক্ষীর গতিতে কোন সুসংবাদের প্রত্যাশা করিয়া আশঙ্কাপীড়িত হইয়াছিল—তখন হনুমান্ অমৃতৌষধির ন্যায় সুবার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়া নৈরাশ্যের রাজ্য আশার কল-কোলাহলে মুখরিত করিয়াছিলেন। আর যেদিন চতুর্দ্দশবৎসরান্তে ফলমূলাহারী ও অনশনকৃশ রাজর্ষি ভরত নন্দীগ্রামের আশ্রমে ভ্রাতৃপাদুকা-বিভূষিত মস্তকে রামের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় আকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন, চতুর্দ্দশবৎসরান্তে রাম ফিরিয়া না আসিলে—"প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনং" অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে যিনি কৃতসঙ্কল্প ছিলেন—সেই আদর্শ ভ্রাতা—রাজর্ষির ঘোর আশা ও আশঙ্কার দিনে তাঁহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশী হনুমান্ বলিয়াছিলেন—

"বসন্তং দণ্ডকারণ্যে যং ত্বং চীরজটাধরম্।
অনুশোচসি কাকুৎস্থং স ত্বাং কুশলমব্রবীৎ।"

"রাজন্, আপনি দণ্ডকারণ্যবাসী চীরজটাধর যে জ্যেষ্ঠভ্রাতার জন্য অনুশোচনা করিতেছেন, তিনি আপনাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।" সুতরাং যখনই আমরা হনুমানকে দেখি, তখনই তিনি আমাদের প্রিয়দর্শন। অত্যন্ত বিপদের মধ্যে তিনি আশার সংবাদে উৎসাহিত করিয়াছেন—তিনি বিপদ ভঞ্জনের পূর্ব্বাভাসের মত উদয় হইয়াছেন, কিন্তু পরের বিপদ দূর করিতে যাইয়া তিনি নিজকে কত বিপদাপন্ন করিয়াছেন, ভাবিলে ত্যাগের মহিমায় তাহার চিত্র সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে।

রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া সুগ্রীব ও অঙ্গদকে মণিময়হার এবং অন্যান্য আভরণ প্রদান করিলেন। সীতাদেবী তখন স্বীয়কণ্ঠলম্বিত উজ্জ্বল মুক্তাহার খুলিয়া রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে রাম বলিলেন, "তুমি এই হার যাহাকে দিয়া সুখী হও, তাহাকেই উহা দান কর।" সেই বহুমূল্য হার উপহার পাইয়া হনুমান্ আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

হনুমানের এই কয়েকটী গুণের কথা বাল্মীকি লিখিয়াছেন—ধৈর্য্যমিশ্র তেজ, নীতির সহিত সরলতা, সামর্থ্য ও বিনয়, যশ, পৌরুষ ও বুদ্ধি; পরস্পরবিরোধী গুণরাশি তাঁহার চরিত্রে সম্মিলিত হইয়াছিল এবং তিনি তাহাদের সকল গুলিকেই কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন।

ভরত, লক্ষ্মণ, কৌশল্যা, দশরথ প্রভৃতি সকলেরই রামের প্রতি অনুরাগ সহজে কল্পনা করা যায়,—ইহারা রামের স্বগণ; কিন্তু কোথাকার এক বর্ব্বরদেশের অনুর্ব্বর মৃত্তিকায় এই ভক্তিকুসুম

অসাধনে উৎপন্ন হইল—তাহা আমরা আশাতীতরূপে পাইয়া সবিস্ময়ে দর্শন করি। বিভীষণ ও সুগ্রীবের মৈত্রী হনুমানের প্রভুভক্তির তুল্য গভীর নহে এবং তাঁহাদের সৌহার্দ্দে আদান প্রদানের ও স্বার্থের ভাব আছে, কিন্তু হনুমানের ভক্তি সম্পূর্ণ অহেতুকী। পরবর্ত্তী হিন্দুগণ তাঁহার এই ভক্তিভাবের প্রতিই বিশেষরূপে লক্ষ্যস্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু আমার বোধ হয়, ভক্তি অপেক্ষাও উন্নত কর্ত্তব্যের প্রেরণাই তাঁহাকে অধিকতররূপে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে।

যে কাজের ভার তিনি লইতেন, প্রাণপণে তিনি তাহা সমাধা করিতেন,—কিরূপে সেই কার্য্য উৎকৃষ্ট ভাবে সম্পন্ন করিতে পারিবেন, মনে মনে সর্ব্বদা তাহাই আলোচনা করিতেন—এইজন্যই আমরা প্রতি পাদক্ষেপে তাঁহাকে বিতর্ক করিয়া অগ্রসর হইতে দেখিতে পাই—কোথায়ও কর্ত্তব্য-সাধনে কোন ছিদ্র রহিয়া গেল কি না—তাঁহার কোন্ পন্থা অবলম্বনীয়, ইহা তিনি দার্শনিকের ন্যায় মনে মনে বিচার করিয়া স্থির করিয়াছেন এবং শেষে সংকল্পারূঢ় হইয়া বীরের ন্যায় দাঁড়াইয়াছেন। আর একটি বিশেষ কথা এই যে কর্ত্তব্য সম্পাদনের সময় স্বীয় সুখভোগ বা কার্য্যের ফলাফল তাঁহার আদৌ বিচার্য্য ছিল না, গীতায় যে নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শ সংস্থাপিত হইয়াছে হনুমান্ তাহারই জীবন্ত উদাহরণ—এই নিষ্কাম কর্ত্তব্য-বুদ্ধিই প্রকৃতরূপে ভগবদ্দাস্যভাব, এই জন্যই বৈষ্ণবেরা তাঁহাকে আপনার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার সেবা সম্পূর্ণ অহেতুকী—সেই সেবা বৃত্তির মধ্যে—অনুরাগের বাহ্য

উচ্ছ্বাস বা ভক্তির আড়ম্বর দৃষ্ট হয় না। যাঁহারা প্রেম বা ভক্তির উচ্ছ্বাসে কার্য্য করেন—তাঁহাদের কার্য্য প্রাণপণে নির্ব্বাহিত হয় কিন্তু, সেই উচ্ছ্বসিত অনুষ্ঠানগুলি মধ্যে মধ্যে ভ্রমাত্মক হইয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকে; হনুমানের কার্য্যগুলির মধ্যে সেরূপ উৎসাহ নাই—তাহা সূক্ষ্ম আত্মানুসন্ধান ও কঠোর বিচার-প্রসূত। তিনি আত্মান্বেষী সন্ন্যাসীর মত নিজে নির্লিপ্ত থাকিয়া অতিশয় কঠোর কর্ত্তব্যের পথে বিচরণ করিয়াছেন। সে কর্ত্তব্য সম্পাদনে তিনি সুগ্রীবের সম্বন্ধে যেরূপ দৃঢ়হস্ত, রামের আদেশ পালনেও তাহাই। বাল্মীকি-অঙ্কিত হনুমান্ চিত্রের উজ্জ্বল কপালে প্রজ্ঞার জ্যোতি নিঃসৃত হইতেছে ও তাঁহার হস্ত সবলে কর্ত্তব্যের হা'ল ধরিয়া আছে—তাঁহার চিত্ত কামনাশূন্য, তাঁহার দৃষ্টি বিলাসহীন এবং তীক্ষ্ণভাবে ভবিষ্যৎদর্শী, তিনি ঋষির ন্যায় স্বীয় চরিত্রের কঠোর বিচারক, ত্যাগী এবং স্থিরলক্ষ্য। এই সকল গুণের পূজার জন্য কিষ্কিন্ধার অনার্য্য বীরবরের উদ্দেশ্যে আর্য্যাবর্ত্তে শত শত মন্দির উত্থিত হইয়াছে এবং এই জন্য ভবভূতি লক্ষ্মণের মুখে হনুমানকে "আর্য্য হনুমান্" বলিয়া সম্বোধন করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

book list.